প্রকাশক :
শ্রীমতী জ্যোৎস্না দত্ত,
১১, ধনদেবী খান্না রোড,
কলিকাতা—৭০০০৫৪

প্রকাশকাল—নভেম্বর, ১৯৫৪

প্রাপ্তিস্থান : দাসগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড,
৫৪/৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০ ০৭৩
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা—৭০০ ০০৬
সংস্কৃত বুক ডিপো (প্রাইভেট) লিমিটেড,
২৮/১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ :
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মুদ্রক :
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মিত্র এম. কম.,
এলম্ প্রেস,
৬৩, বিডন স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০ ০০৬

॥ স্বস্তিবাচন ॥

卐 ওঁ স্বস্তি 卐

রামায়ণ রমণীয় ও মহনীয় মহাকাব্য। ইহা ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের রত্নগর্ভ এক সদর্থক ইতিহাস। মহাসাগরের মতই ইহা গভীর ও শ্রুতি-মনোহর।

কামার্থগুণসংযুক্তং ধর্মার্থগুণবিস্তরম্।
সমুদ্রমিব রত্নাঢ্যং সর্বশ্রুতিমনোহরম্ ॥

বাস্তবিক ভারতবর্ষের যাহা কিছু উচ্চাদর্শ, উদাত্ত ভাবসম্পদ্, যাহার মধ্যে আছে শ্রেয়োধর্মের ধ্রুবত্ব, জ্ঞানের বিভূতি ও প্রেমভক্তির স্নিগ্ধতা, সেই সব আদর্শের সুসংহত এক জীবন্ত চিত্রকল্প রামায়ণ-মহাকাব্যে অঙ্কিত হইয়াছে অপূর্ব সুষমায়। ঋষিকবি বাল্মীকি রামায়ণের সুমহৎ চরিত্রগুলির মধ্যে তাঁহার দিব্য কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সমগ্রতায় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন।

রামায়ণের অনন্তসৌন্দর্যশালিনী কাব্যশ্রী ইহাকে দিয়াছে আদিকাব্যের অনন্য গৌরব এবং ইহার অপূর্ব মাধুরী উত্তরকালের কবিমানসে দিয়াছে অনন্ত প্রেরণার অভিব্যক্তি।

রামায়ণ মহাকাব্য সম্বন্ধে দেশে ও বিদেশে চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ নানা দৃষ্টিকোণ হইতে বহু মূল্যবান্ সমালোচনা করিয়াছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ কয়েকজনকে বাদ দিলে বেশির ভাগ মনীষীর গবেষণা রামায়ণের বহিঃপ্রকৃতি, উপাদান, উপকরণ, ভাষা, ছন্দঃ ও নানা আঙ্গিকের রীতিনীতি লইয়াই বিচারবিশ্লেষণে সমৃদ্ধ। সেই সব গবেষণারও বিশেষ প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেগুলিতে বোধদৃষ্টির আধিক্যই প্রকাশ পায়, ফলে অনেক সময় যথার্থ রসদৃষ্টি ক্ষীণ ও স্তিমিত হয়।

কল্যাণীয়া শ্রীমতী স্বস্তিকা দত্ত সে পথে না গিয়া পরমশ্রদ্ধায় তাঁহার স্বচ্ছ সুকুমার অনুভূতি ও নিরলস চিন্তাশ্রম নিয়োগ করিয়া রামায়ণের জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে এক উপভোগ্য মৌল ভাবরূপের অংশ-বিশেষ উপহার দিয়াছেন। তাঁহার বিচারবিশ্লেষণে নৈপুণ্যের ছাপ আছে।

উপনিষদ্ ও দর্শনের ভাবধারা আবিষ্কারে মৌল চিন্তার স্পষ্ট পরিচয় পরিস্ফুট। শ্রীমতী স্বস্তিকার এই প্রয়াস প্রথম হইলেও সার্থক হইয়াছে সন্দেহ নাই এবং বিশ্বাস করি ইহা বিদগ্ধ ও সাধারণ পাঠকসমাজে স্বীকৃতি-ধন্য হইবে। আমিও 'ওঁ স্বস্তি' বলিয়া শ্রীমতী স্বস্তিকাকে আন্তরিক আশীর্বাদে অভিনন্দিত করি।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী

প্রস্তাবনা

ইক্ষ্বাকুবংশোদ্‌ভব নরশ্রেষ্ঠ নয়নাভিরাম রামের জীবনচরিতকে আশ্রয় করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি যে বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিলেন তাহাই রামায়ণ। চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকে[১] রচিত এই কাব্য যে পরিমাণের দিক্ হইতে মহৎ তাহা অনস্বীকার্য। ভাষায়, ভাবে, গাম্ভীর্যে, অর্থগৌরবে ও রসপুষ্টিতে এই কাব্যের মহত্ত্ব ততোধিক। এই জন্যই রামায়ণ মহাকাব্যও বটে। এই রামায়ণ ও মহাভারতের অনুকরণেই পরবর্তী কালের কবিগণ নানা মহাকাব্য রচনা করিলেন। নামসাম্য থাকিলেও এই দুই শ্রেণীর মহাকাব্য প্রকৃতিতে ভিন্ন, ইহা অনায়াসেই ধরা পড়ে। রামায়ণ শুধু মহাকাব্যই নহে, ইহা ভারতীয় দৃষ্টিতে ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত। বর্তমান সময়ে আমরা ইতিহাস বলিতে সাধারণতঃ রাজা ও রাজবংশের বা বিশিষ্ট শাসন-ব্যবস্থার উত্থান-পতনের ঘটনাপঞ্জীকেই বুঝিয়া থাকি এবং সন-তারিখ সমন্বিত দীর্ঘ বৃত্তান্তসূচীর আলোকে দেশের ও জাতির ঐহিক অগ্রগতি তথা ক্রমবিকাশের পর্যালোচনা করিয়া ঐতিহাসিকের কর্তব্য সম্পন্ন করি। 'ইতিহাস' একটি সংস্কৃত শব্দ এবং বৈদিক সাহিত্যেও তাহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইতি হ আস—এইরূপ (ইতি) আস (ছিল) বলিয়া যে প্রসিদ্ধি (হ) তাহাই ইতিহাস।[২] কিন্তু বুদ্ধিমান্ মানুষ কেবল প্রাচীন ঘটনা (পুরাবৃত্ত) জানিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না, তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও শিক্ষা গ্রহণ করিতে না পারিলে ঘটনামাত্র জানিয়া কী লাভ হইবে? ভারতীয় ধর্মে তথা সভ্যতায় ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ সাধনের মর্যাদা থাকায় ভারতীয় ইতিহাসেও চতুর্বর্গের উপদেশ রহিয়াছে। এইজন্য ইতিহাস শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে—

> ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্ ।
> পুরাবৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে ।।

প্রাচীন রামকথার মাধ্যমে রামায়ণে ধর্মার্থকামমোক্ষের উপদেশ থাকায় তাহা ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাস বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

১। চতুর্বিংশৎ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান্ ঋষিঃ। ১।৪।২

২। "তত্রেতিহাসমাচক্ষতে" (নিরুক্ত, ২।১০) এর ব্যাখ্যায় টীকাকার দুর্গাচার্য বলিয়াছেন—"ইতি হৈবমাসীদিতি যঃ কথ্যতে স ইতিহাসঃ।"

রামায়ণে সাতটি কাণ্ডের সর্বশেষটি উত্তরকাণ্ড নামে অভিহিত হওয়ায় ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার একটি প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ তো উত্তরকাণ্ডকে প্রক্ষিপ্ত বলেনই, এমন কি ভারতীয় সমাজে উত্তরকাণ্ড সম্বন্ধে একটু পৃথক্ চিন্তা দেখিতে পাওয়া যায়। ছয়টি কাণ্ডের পাঠের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বিনিয়োগপদ্ধতি দৃষ্টিগোচর হইলেও সপ্তমকাণ্ডের স্থলে তাহা পাওয়া যায় না। নয়দিনে সমগ্র রামায়ণ পাঠের দুইটি বিধান আছে। প্রথম বিধানে উত্তরকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত, দ্বিতীয় বিধানে উত্তরকাণ্ড পরিত্যক্ত। প্রথম বিধানে উত্তরকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও উত্তরকাণ্ড সমাপ্তির পরে পুনরায় যুদ্ধকাণ্ডের অন্তিম সর্গটি পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

উত্তরকাণ্ড সম্পর্কে এই পৃথক্ চিন্তার হেতু কি তাহা সমীক্ষার যোগ্য। বাল্মীকি যখন নারদকে প্রশ্ন করেন যে, বর্তমানকালে পৃথিবীতে গুণবান্, বীর্যবান্, ধর্মজ্ঞ, চরিত্রসম্পন্ন ও নানাবিধগুণভূষিত নর কে আছেন তখন নারদ রামের উল্লেখ করেন। রামের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত কীর্তিত করিয়া নারদ যেখানে থামিলেন তাহা হইল—"রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাপ্তবান্" (১।১।৮৯) অর্থাৎ রাম সীতাকে পাইয়া পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। এইখানেই নারদকর্তৃক রামের অতীত বৃত্তান্তকথন সমাপ্ত হইল। ইহার পরেও নারদ আটটি শ্লোকে (৯০-৯৭) রামকথাই বলিয়াছেন, কিন্তু ভবিষ্যৎ বৃত্তান্তরূপে। ৮৯ শ্লোকে 'অবাপ্তবান্' ক্রিয়াপদটি অতীতকালে ব্যবহৃত হইয়াছে, ৯০ শ্লোকে কোনও ক্রিয়াপদ নাই, ৯১ শ্লোকের ক্রিয়াপদ 'দ্রক্ষ্যন্তি' ভবিষ্যৎকালে প্রযুক্ত। এই বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, রামের পুনরায় রাজত্বলাভ পর্যন্ত অংশে আছে পুরাবৃত্তকথন ও তাহা হইল বস্তুনিষ্ঠ। রাজত্বলাভের পরে রাম এগারো হাজার বছর রাজত্ব করিবেন[১] এবং তখন যে-ঘটনা ঘটিবে তাহা পুরাবৃত্ত না হওয়ায় ইতিহাসের পর্যায়ে আসিতে পারে না। আরও, তাহা বস্তুনিষ্ঠ নয় কিন্তু কবির কল্পনাপ্রসূত। প্রথম সর্গের পরবর্তী আটটি শ্লোকে (৯০-৯৭) অবশ্য নারদ বেশী কথা বলেন নাই, তিনি রামরাজত্ব কিরূপ হইবে তাহার বর্ণনা দিয়াছেন এবং রামের রাজত্বকাল নিরূপণ করিয়াছেন (মাত্র এগারো হাজার বৎসর!)। লক্ষ্য করা যায় যে, যুদ্ধকাণ্ডের সমাপ্তি হইয়াছে রামের রাজত্বলাভের সহিত। সুতরাং

১। দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি ॥ ১।১।৯৭

যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত ছয়টি কাণ্ড পুরাবৃত্ত হওয়ায় তাহা বাল্মীকির নিকটেও ইতিহাসপদবাচ্য হইতে পারে কিন্তু পরবর্তী উত্তরকাণ্ডটি বাল্মীকির কল্পনা তথা প্রতিভার অবদান হওয়ায় তাহা আজ পুরাতন হইলেও পূর্বে সংঘটিত বা পুরাবৃত্ত নয় এবং এইজন্য তাহা ইতিহাস বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। বাল্মীকি ব্রহ্মার বর লাভ করিয়া যখন আত্মবিশ্বাস অর্জন করিলেন তখন পুনঃ পুনঃ মনন করিয়া রামকথাকে স্বীয় তপস্যা ও কবি-প্রতিভার দ্বারা কাব্যে পরিণত করিলেন।[১] রামায়ণের তৃতীয় সর্গে আমরা বাল্মীকির মানসনেত্রপ্রতিভাত যে সংক্ষিপ্ত রাম-আলেখ্য দেখিতে পাই তাহা নারদপ্রোক্ত রামকথাকে অনেকাংশে অতিক্রম করিয়াছে। রামের জন্ম, বিশ্বামিত্রের সহিত গমন, পরশুরামের সহিত বিবাদ ইত্যাদি নারদ না বলিলেও বাল্মীকির নিকট এখন এইগুলি জ্বলন্ত প্রত্যক্ষ রূপে প্রতিভাত। বাল্মীকি যাহা প্রতিভার দ্বারা জানিতে পারিবেন তাহা কখনও মিথ্যা হইবে না, এইরূপই ব্রহ্মা বাল্মীকিকে বলিয়াছিলেন।[২] দেখা যায় যে, যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত অংশের রামায়ণ একদিকে যেমন পুরাবৃত্ত হওয়ায় ইতিহাসের পর্যায়ে উন্নীত অপরদিকে কবি-প্রতিভায় সমুজ্জ্বল থাকায় তাহা কাব্যও বটে। কিন্তু উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির কবি-প্রতিভাসঞ্জাত হওয়ায় তাহা কাব্য, ইতিহাস নহে। এইজন্যই সম্ভবতঃ ভারতীয় ঐতিহ্যে উত্তরকাণ্ডের মর্যাদা কিছু মন্দীভূত। উত্তরকাণ্ডেও পুরাবৃত্ত আছে কিন্তু তাহা মূল রামকথার সহিত আনুষঙ্গিকভাবেই সম্বদ্ধ সুতরাং তাহা রামকথার ইতিহাস না হইলেও ভারতীয় ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত, ইহা স্বীকার করিতে কোনও দ্বিধা থাকিবার কথা নয়। তিলকটীকাকার রামও উত্তরকাণ্ডকে মূল রামায়ণের অন্তর্গত বলিয়াই মনে করেন এবং এইজন্য উত্তরকাণ্ডের "শৃণ্বন্ রামায়ণং ভক্ত্যা" (৭।১১১।২৪) ইত্যাদি শ্লোকটিকে মূল রামায়ণের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন[৩] এবং সমগ্র উত্তরকাণ্ডের টীকাও রচনা করিয়াছেন।

১। উপস্পৃশ্যোদকং সম্যঙ্ মুনিঃ স্থিত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।....
ততঃ পশ্যতি ধর্মাত্মা তৎ সর্বং যোগমাস্থিতঃ।
পুরা যৎ তত্র নির্বৃত্তং পাণাবামলকং যথা।। ১।৩।২, ৬

২। ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি। ১।২।৩৫

৩। "'শৃণ্বন্ রামায়ণং ভক্ত্যা যঃ পাদং পদমেব বা। স যাতি ব্রহ্মণঃ স্থানং ব্রহ্মণা পূজ্যতে সদা'।। ৭।১১১।২৪ ইতি মূলরামায়ণবচনেন ব্রহ্মলোকাবাপ্তেঃ ফলস্য স্পষ্টমুক্তত্বাচ্চ।" ১।১।১, তিলকটীকা

রামায়ণ ইতিহাস হওয়ায় তাহা ধর্মার্থকামমোক্ষের উপদেশ দিয়া থাকে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বাঁধনহারা অর্থলালসা ও কামমোহ যে অনিষ্টের জনক তাহা রামায়ণের বহুস্থলেই প্রতিফলিত, বিশেষতঃ স্বর্ণলঙ্কায় তো বটেই। তাই অর্থকামকে ধর্মের শাসনে আবদ্ধ করাই রামায়ণের একটি সুমহতী শিক্ষা। ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত এবং মোক্ষ তো আরও দুর্গম, এই অভিযোগ বহু সময়ে উত্থাপিত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ধর্মমার্গের ও মোক্ষশাস্ত্রের বহুশাখার মধ্যে একটি বিষয়ে ঐকমত্য আছে যে, সংযতচিত্ত ও নিরাসক্ত ব্যক্তিই ধার্মিক এবং মোক্ষপথগামী। চিত্তের সংযম অত্যাবশ্যক, ইহা সকলেই স্বীকার করেন কিন্তু সাংসারিক ব্যক্তির পক্ষে আসক্তিত্যাগ কিরূপে সম্ভব, ইহা বহুসময়েই জিজ্ঞাস্য হইয়া থাকে। যদি আসক্তিত্যাগ সম্পূর্ণরূপে সম্ভব নয় বলিয়া কেহ মনে করেন তবে প্রথম স্তরে বুদ্ধিমান্ মানুষ অত্যাসক্তি বা অতিপ্রসঙ্গ বর্জন করিতে অভ্যাস করিবেন। পুত্রে, ভার্যায়, মিত্রে ও ধনে আসক্তি থাকুক্ কিন্তু তাহাতে অতিরিক্ত আসক্তি থাকিলে দুঃখ পাইতেই হইবে কারণ এই সকল হইতে বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী।[১] বুদ্ধিমান্ মানুষ এমন একটি বিষয়ের প্রতিই আসক্ত থাকিবেন যাহা চিরন্তন। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল সঞ্চয়ের ক্ষয় আছে, সকল উত্থানের পতন আছে, সকল সংযোগের বিয়োগ আছে এবং জীবনের অন্ত মরণে।[২] সুতরাং চিরন্তন বস্তুর প্রতিই মানুষের ধাবিত্ হওয়া সঙ্গত। আত্মার বিনাশ নাই, তাহা জল-অগ্নি-বায়ুর দ্বারা বিকারগ্রস্ত হয় না, তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। সুতরাং আত্মানুসন্ধান সকল মানুষের কর্তব্য। এই কর্তব্যবোধ জন্মাইলেও তাহা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না একটি কারণে যে, আমরা আমাদের মনকে আত্মাভিমুখ করিতে সমর্থ হই না। ইন্দ্রিয়ের স্বভাবসিদ্ধ বহির্মুখতার জন্য তাহা সর্বদাই বাহিরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। স্বভাবচঞ্চল মনও নানাদিকে ছুটিবার সুযোগ পাইয়া মহানন্দে ইন্দ্রিয়ের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এখানেই প্রয়োজন বুদ্ধির। একমাত্র বুদ্ধি বা বিবেকশক্তি দুর্দান্ত ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করিয়া অভীষ্ট পথে তাহার গতি ফিরাইয়া দিতে পারে। বুদ্ধিতেই চৈতন্যের বা আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটে, তাই বুদ্ধি আত্মার আলোকে আলোকিত থাকিয়া মনকে সংযত করিয়া মনের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়কে সংযত করে।

১। তস্মাৎ পুত্রেষু দারেষু মিত্রেষু চ ধনেষু চ।
নাতিপ্রসঙ্গঃ কর্তব্যো বিপ্রয়োগো হি তৈধ্র্ুবম্ ॥ ৭।৫২।১২

২। সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্ ॥ ৭।৫২।১১

এখন বুদ্ধিরূপ সারথি মনরূপ লাগামের সাহায্যে দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়াশ্বকে প্রতিকূল পথে টানিয়া আনিয়া আত্মাভিমুখ করে। সুতরাং যে-কোন আধ্যাত্মিক সাধনার প্রথম সোপান হইল এই সংযতচিত্ত ও স্থিরবুদ্ধি। যাহার বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে তাহার আর উদ্ধারের আশা নাই। আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য সংসার ছাড়িয়া বনে গমন করিতে হয় না কারণ সাংসারিক জীবন আধ্যাত্মিক সাধনা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। সাংসারিক গৃহজীবনে অসংযতচিত্তের বা অস্থিরবুদ্ধির চরম দুর্গতি। সদাজাগ্রত বুদ্ধিই মানুষকে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারে। যেখানে বুদ্ধিভ্রংশ হইবে সেখানে স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনা না করিয়া সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া চলে যে, বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী। এই হতবুদ্ধি ব্যক্তি গৃহীই হউন আর সন্ন্যাসীই হউন এই বিপদ্ হইতে কোনও পরিত্রাণ নাই। রাজা দশরথের সাড়ে তিনশত পত্নী[১] থাকা সত্ত্বেও তিনি অসংযতচিত্ত হওয়ায় কৌশল্যা-সুমিত্রার বিবাহের পরেও তরুণী কৈকেয়ীকে[২] বিবাহ করিতে উন্মত্ত হইলেন এই শর্তে যে, কৈকেয়ীর পুত্র যুবরাজ হইবে। রামায়ণের ঘটনাচক্রে এই অসংযমের যে কী কু-পরিণাম তাহা যে-কেহ চিন্তা করিতে পারেন। তরুণী ভার্যার অত্যধিক আদর, বরদান, রামের বনবাস ইত্যাদি ঘটিয়া গেল, পরিশেষে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ অবশ্যম্ভাবী নিয়তির মত চলিয়া আসিল। স্বভাবতঃ রামের প্রতি স্নেহসম্পন্না কৈকেয়ী চিত্তের ক্ষণিক অসংযম হেতু মন্থরার কু-পরামর্শে কী অদ্ভুত বর প্রার্থনা করিয়া বসিলেন এবং ফলস্বরূপ সমগ্র ভারত-বাসীর চিরকালের অভিশাপ আজও বহন করিয়া চলিতেছেন। অশেষগুণ-শালিনী সীতা অনলপরীক্ষিতা পাপলেশবিরহিতা হইয়াও ক্ষণেকের অসংযম ও অত্যাসক্তির জন্য রামকে সোনার হরিণ ধরিবার জন্য বনে পাঠাইলেন, দেবতুল্য দেবর লক্ষ্মণকে কুৎসিত ভাষায় ভর্ৎসনা করিলেন এবং তাহার ফলও মিলিল। তিনি সর্বতোভাবে ক্লিষ্টা হইলেন, প্রাণপ্রিয় স্বামীর সন্দেহভাজন হইয়া অগ্নিপরীক্ষা দিয়া সাময়িক পতিপরিগৃহীতা হইলেও

১। অর্ধসপ্তশতাস্তত্র প্রমদাস্তাম্রলোচনাঃ।
কৌসল্যাং পরিবার্য্যাথ শনৈর্জগ্মুর্ধৃতব্রতাঃ॥ ২।৩৪।১৩

২। কৈকেয়ী যে কনিষ্ঠা মহিষী তাহার প্রমাণ স্বরূপে রামায়ণ হইতে কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—"কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ সুমধ্যমা।" (১।৭৭।১০), "কচ্চিৎ সুমিত্রা ধর্মজ্ঞা জননী লক্ষ্মণস্য যা। শত্রুঘ্নস্য চ বীরস্য অরোগা চাপি মধ্যমা।" (২।৭০।৯)। তিলকটীকাকারও দশরথকর্তৃক মহিষীদিগকে পায়স বিভাগের প্রসঙ্গে ১।১৬।২৯ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই কথাই স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন।

এক মিথ্যা কলঙ্কে পতিপরিত্যক্তা হইয়া বিজনে আশ্রমবাস করিয়া গেলেন, পরিশেষে একমাত্র মাতক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করিলেন। লক্ষ্মণও সাময়িক-ভাবে চিত্তের সংযম হারাইয়া নারীবাক্যের অসারতা হৃদয়ে স্পষ্টভাবে জানিয়াও ক্ষোভে দুঃখে সীতাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তিনিও তো রামের অন্বেষণে না গিয়া সীতার অলক্ষ্যে থাকিয়া সীতাকে বিপদের সময়ে রক্ষা করিতে পারিতেন। ইহাও তো বুদ্ধিরই দোষ। যে-রামচন্দ্র সর্বগুণাকর, যিনি নারদকর্তৃক বহুগুণভূষিত বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন তাঁহার নারদপ্রোক্ত প্রথম গুণটি হইল "নিয়তাত্মা"[১] অর্থাৎ "নিগৃহীতান্তঃকরণঃ" (তিলক) অর্থাৎ যিনি অন্তঃকরণকে বা মনকে নিগৃহীত বা সংযত করিতে পারিয়াছেন। দুর্ভাগা যে, রামও মারীচের মায়াকে ধরিতে পারেন নাই। সীতাও মায়া ধরিতে পারেন নাই, প্রলোভিতাও হইয়াছিলেন। রাম প্রলোভিত হইয়াও ইহা মায়া কিনা সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ দোলায়িতচিত্ত ছিলেন। রামের প্রলোভন তাঁহার মনুষ্যত্বেরই পরিচায়ক। সর্বথা বহুবিধগুণসম্পন্ন হইয়াও এই একটি স্থলে যে, তিনি মায়ার বশীভূত হইয়া অসঙ্গতভাবে প্রলোভিত হইয়াছিলেন তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, রামায়ণের রাম মানুষই বটে। বাল্মীকি বা নারদ যদি রামকে বিষ্ণুর অবতাররূপে দেখিতেন তবে রাম হইতেন মায়াবী বা মায়ার অধীশ্বর[২]; অর্থাৎ মায়ার বশবর্তী তিনি না হইয়া তাঁহার বশবর্তী হইত মায়া।

রাবণের কথা আর কি বলিব? রাবণ তো অসংযমের প্রতিমূর্তি। তবে তিনি চিরদিনই অসংযত ছিলেন না। একক্ষণের অসংযম যেমন বিপদ্ ডাকিয়া আনে তেমন একসময়ের তীব্র সংযম অনেক শুভ পরিণামের কারণ হইয়া থাকে। তাই রাবণ তপস্যার সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি অমিত বিক্রমের অধিকারী হইয়াছেন এবং সেই বিক্রমের ফলেই ত্রিভুবনের আধিপত্য অর্জন করিয়াছিলেন। রাবণের মৃত্যুর পরে মন্দোদরী বিলাপকালে একটি শ্লোক বলিয়াছিলেন—

১। ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।
নিয়তাত্মা মহাবীর্যো দ্যুতিমান্ ধৃতিমান্ বশী॥ ১।১।৮

২। মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৪।১০)

ইন্দ্রিয়াণি পুরা জিত্বা জিতং ত্রিভুবনং ত্বয়া ॥
স্মরদ্ভিরিব তদ্‌বৈরমিন্দ্রিয়ৈরেব নির্জিতঃ। ৬।১১১।১৫-১৬

রাবণ ইন্দ্রিয়গণকে পরাস্ত করিয়া যখন ত্রিভুবন জয় করেন তখন সেই পরাজিত ইন্দ্রিয়গুলি মনের মধ্যে অপমানকে পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল। পরাজিত শত্রু প্রতিপক্ষের দোষ বা রন্ধ্র পাইলে সেই পথেই প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিয়া প্রতিশোধ লইয়া থাকে। সেইরূপ যখন পরাজিত ইন্দ্রিয়গুলি রাবণের বুদ্ধিভ্রংশরূপ দোষ দেখিতে পাইয়াছে তখন রাবণের চিত্তের অসংযমের সুযোগ লইয়া রাবণকে পরাস্ত করিয়াছে। মন্দোদরীর মতে রাবণের পরাজয়ের কারণ রামের পরাক্রম নয় কিন্তু রাবণের অসংযম। মন্দোদরীর কথায় আপত্তি করা বোধ হয় সম্ভব নয়।

ইন্দ্রিয়গুলি মনকে বিক্ষুব্ধ ও ব্যাকুল করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিরও চিত্তকে বলপূর্বক হরণ করিয়া থাকে। সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার জন্য সতত প্রয়াসশীল হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখা যায় না, যদি কোন উৎকৃষ্ট স্থির বস্তুতে তাহাকে প্রণিহিত করা না যায়। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতি মনকে নিবিষ্ট করিতে হইবে। এইভাবে যাহার ইন্দ্রিয় বশীভূত হইবে তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।[১] অধ্যাত্মশাস্ত্র গীতার ইহাই সারাৎসার, গৃহাশ্রমীরও এই পথই অবলম্বনীয়, অন্য কোনও পথ নাই।

রামায়ণের চরিত্র বিশ্লেষণের দ্বারা যেরূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেইরূপ রামায়ণের শ্লোকাক্ষর হইতেও ইহা সূচিত হয়। রামায়ণের প্রথম সর্গ সমগ্র রামায়ণের সংক্ষিপ্তসার। ইহা আদ্যন্ত পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রামায়ণে গায়ত্রীমন্ত্রই সংকেতে বিধৃত আছে। প্রথম সর্গের প্রথম শ্লোকের প্রারম্ভ—'তপঃস্বাধ্যায়নিরতম্' এবং এই সর্গের শেষ শ্লোকের (১।১।১০০) সমাপ্তি—'মহত্ত্বমীয়াৎ'। গায়ত্রীমন্ত্রের প্রারম্ভেও আছে 'ত' এবং শেষেও আছে 'যাৎ'। সুতরাং রামায়ণ গায়ত্র্যর্থ-প্রতিপাদক।[২] সমগ্র বেদের সার বেদমাতা গায়ত্রী, তাই রামায়ণে বেদের

১। যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥
তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ (গীতা, ২।৬০, ৬১)

২। "অস্য গায়ত্র্যর্থপ্রতিপাদকত্বধ্বননায় গায়ত্র্যাদিমাক্ষরেণোপক্রম্য যাদিতি গায়ত্র্যন্তিমাক্ষরেণ সমাপিতবান্। (তিলকটীকা, ১।১।১০০)

সার নিহিত। এইজন্য রামায়ণকে বেদতুল্যও বলা হয়।[১] গায়ত্রীমন্ত্রের আক্ষরিক অর্থ—সেই প্রকাশশীল সবিতার বরণীয় তেজ ধ্যান করি, তিনি যেন আমাদিগের বুদ্ধিকে [শুভকার্যে] প্রেরিত করেন। নিত্য স্বপ্রকাশ সূর্যের বা জগৎপ্রসবিতা পরমাত্মার অনবরত অনুচিন্তনের ফলে আমরা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হই, ইহাই প্রার্থনা। বিষয়রাগাকৃষ্ট উন্মত্ত ইন্দ্রিয়ের আকুল-করা অমোঘ আকর্ষণ হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করার উপযুক্ত শুভবুদ্ধি যেন পাই এবং স্থিরবস্তু স্বপ্রকাশ চৈতন্যের বা পরমেশ্বরের প্রতি চিত্তকে প্রণিহিত করিয়া ভবিষ্যতের অশুভসম্ভাবনা হইতে মুক্ত হইতে পারি। রামায়ণের মনুষ্যচরিত্রের ত্রুটিগুলি স্মরণ করাইয়া দেয় যে, সংযতচিত্তও অসংযত হইতে পারে এবং যে-কোন অসতর্ক মুহূর্তে চরম বিপদ্‌কে ডাকিয়া আনিতে পারে। গোটা রামায়ণ যেন বারবার শিখাইয়া দিতেছে যে, সাবধান, বিপদ্ আছে, পদস্খলন হইলে অনন্ত দুঃখপরম্পরা। কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করা অসঙ্গত, অসংযতচিত্তের পরিচয়; তাহাতে যে-ফল ফলিল সে তো চিরন্তন অপ্রতিষ্ঠা, যুগযুগান্তরের শত সহস্র মানুষের অভিশাপ বাল্মীকির মুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধিক্কার দিতে থাকিল। এই করুণ পরিবেশে প্রারব্ধ রামায়ণ প্রতি স্তরে কারুণ্যকেই ক্রোড়ীকৃত করিয়াছে। অন্ধমুনি-পুত্রবধ, রামের বনবাস, সুশীলা সমদর্শিনী কৈকেয়ীর অপমান ও গ্লানি, দশরথের পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ, সীতাহরণ, সীতার অগ্নি-পরীক্ষা, সীতা-নির্বাসন, সীতার পাতাল-প্রবেশ ইত্যাদি কতই ঘটনা আমাদের মনে কারুণ্যের ছবিই প্রকটিত করে। সর্বত্রই যেন ঐ 'মা নিষাদ' ধ্বনি কর্ণগোচর হইতেছে। ভরতের দিকে তাকাইয়া শান্তি পাই না, মনে হয়—এ কী তপস্যা, কত অবিশ্বাস তাঁহার উপরে। কৌশল্যা তো চিরদুঃখিনী। সুমিত্রা যেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি, নীরব সাহিষ্ণুতা। লক্ষ্মণ তো সন্ন্যাসী, অথচ তাঁহার সব কিছুই আছে, থাকিয়াও নাই। নিদারুণ শোক যেন সর্বত্র বিছাইয়া রহিয়াছে। রাম তো বুকে পাষাণ বাঁধিয়া সীতাকে নির্বাসিত করিয়া কর্তব্যের কঠোর শাসন অঙ্গীকার করিয়া প্রজারঞ্জক রাজা বলিয়া প্রশংসিত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ছবি কে দেখিবে? দেখিলে চোখের জল রোখা যায় না। তবু রাম (কত সহজেই) চিত্তের স্থৈর্য আনয়ন করিয়াছেন এবং পুনরায় তাঁহাকে দেখিতে পাই যে, তিনি অবিচলিতচিত্ত, প্রশান্তগম্ভীর। এও কি সম্ভব? এর উত্তরে রামায়ণের ভরত বলেন—সংসারে ইহাই শিক্ষণীয়।

১। ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্। ১।১।৯৮

যথা মৃতস্তথা জীবন্ যথাসতি তথা সতি।
যস্যৈষ বুদ্ধিলাভঃ স্যাৎ পরিতপ্যেত কেন সঃ।। ২।১০৬।৪

ভরত দশরথের মৃত্যুসংবাদ লইয়া আসিলে রাম বিন্দুমাত্র বিচলিত না হওয়ায় ভরত হতবাক্ হইয়া বলিয়াছেন—এইরূপ হর্ষবিষাদে সমভাবাপন্ন ব্যক্তি তো আপনাকেই দেখিতে পাই। মৃত ব্যক্তির আর নিজের শরীরের সহিত কোনও সম্বন্ধ থাকে না, জীবিত ব্যক্তিরও সেইরূপই নিজেকে শরীরের সহিত অসম্বদ্ধ বলিয়া চিন্তা করা উচিত। বিষয় অনুপস্থিত থাকিলে তাহাব প্রতি রাগদ্বেষ উৎপন্ন হয় না, বিদ্বান্ ব্যক্তির উচিত যে, বিষয় উপস্থিত থাকিলেও রাগদ্বেষ উৎপন্ন হইতে না দেওয়া এইরূপ বুদ্ধি যিনি অর্জন করিতে পারিয়াছেন তিনি আর কিসে ব্যথিত বা পরিতাপিত হইবেন? এইজন্যই রাম অপরিতপ্ত এবং এইজন্যই তিনি নরশ্রেষ্ঠ ও সর্বকালের সকল মানুষের আদর্শস্বরূপ, মর্যাদাপুরুষোত্তম।

রামায়ণের এই শিক্ষাকে স্মরণে রাখিয়া এবং হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিতে পারার মহান্ সম্পদ্ সহসা অর্জন করিতে না পারিলেও তাহা মনুষ্যের প্রয়াসসাধ্য।

"রামায়ণ-সমীক্ষা—জীবন ও দর্শন" শীর্ষক বর্তমান গ্রন্থের রচয়িত্রী ডঃ শ্রীমতী স্বস্তিকা দত্ত বুদ্ধিমতী, শ্রমশীলা ও নিষ্ঠাবতী। অনবরত রামায়ণ-পাঠে তিনি রামায়ণের চরিত্রগুলির সঙ্গে কিছুটা আত্মীয়তা গড়িয়া তুলিয়াছেন। তৃতীয়াধ্যায়ে চরিত্রগুলির বিশ্লেষণে তাঁহার নিপুণতা তথা নিরপেক্ষ সমালোচনা এই সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করে। আদিকাব্য পুনঃ পুনঃ পাঠে তাঁহার ভাষার স্বাচ্ছন্দ্যও আসিয়াছে।

প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন ভাষায় রামায়ণের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা এবং পরিশিষ্টে বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর বিরাট্ সূচী বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান্ সংযোজন বলিয়া গণ্য হইবে। এযাবৎ এইভাবে কেহ চর্চা করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রামায়ণের দার্শনিক পৃষ্ঠভূমি আলোচনা করিয়া পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃতিপূর্বক উপনিষদের মন্ত্রের সহিত সাদৃশ্য প্রদর্শনও এই গ্রন্থের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীমতী স্বস্তিকা রাম, সীতা ও কৈকেয়ীর চরিত্রের তথাকথিত দোষগুলির অপনোদনের জন্য যে সূক্ষ্ম প্রয়াস করিয়াছেন তাহাতে পূর্বকথিত উক্তিটিরই সমর্থন মিলে যে, রামায়ণগত চরিত্রগুলির

সহিত তাঁহার আত্মীয়তা জন্মিয়া গিয়াছে। আত্মীয়ের নিন্দা তো নিজেরই নিন্দা, তাই এই বহুবিতর্কিত নিগূঢ় সূক্ষ্ম বিচারকে এড়াইয়া যাওয়ার প্রবণতা তাঁহার মধ্যে দেখা যায় নাই। এই চরিত্রগুলিতে ঐ দোষগুলি যদি থাকিয়াই যায় তবুও ইঁহাদের কেহই ছোট হইতেন না, প্রত্যেকেই স্বমহিমায় ভাস্বর। তবুও তিনি কৈকেয়ীকেও বাঁচাইবার জন্য কী নিদারুণ প্রয়াস করিয়াছেন, ইহা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টিগোচর হইবে এবং সম্ভবতঃ প্রশংসাও অর্জন করিবে।

এই গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার হইলে দেশের ও সমাজের উপকার হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। এই গ্রন্থের প্রচয়গমন ও গ্রন্থকর্ত্রীর নিরাময় সুখী দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া শ্রীরামের চরণপ্রান্তে নিজেকে নিবেদন করিয়া এই প্রস্তাবনা সমাপ্ত করিতেছি।

শ্রীসীতানাথ গোস্বামী

ভূমিকা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ্. ডি পরীক্ষায় যোগ্যরূপে বিবেচিত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত রূপ হইতেছে বর্তমান গ্রন্থটি।

রামায়ণ মহাকাব্য রচিত হইবার পর সম্ভবতঃ এমন কোনও যুগ অতিক্রান্ত হয় নাই যে-যুগের বিদগ্ধ ও সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ আদিকাব্য রামায়ণ সম্বন্ধে তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা ও ঔৎসুক্য প্রকাশ না করিয়া অবিচলিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছেন। রামায়ণের সেই অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ এই আধুনিক যুগেও সমভাবেই বিদ্যমান তাহার নিদর্শন হইতেছে এই কিছুদিন পূর্বেও রামায়ণকাহিনী লইয়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পণ্ডিতগণের তুমুল বাদানুবাদ। অবশ্য ১৯৭৫ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক রামায়ণ সেমিনারে স্বর্গত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রামায়ণ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্যই ইহার উৎস। এই সেমিনারে দেশী বিদেশী সুধীবর্গের অংশ গ্রহণ ইহার অপরিসীম জনপ্রিয়তারই সূচক। ১৯৭২ সালে ইন্দোনেশিয়াতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসব প্রমাণ করে বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগেও আদিকাব্য রামায়ণ দেশে বিদেশে কি পরিমাণ জীবন্তরূপে সুপ্রকট।

রামায়ণ একটি মহাকাব্য, ইহার রচয়িতা আদিকবি বাল্মীকি। রামায়ণ কেবলমাত্র কাব্যই নহে, ইহা একটি ইতিহাস গ্রন্থ বলিয়াও পরিগণিত। আখ্যায়িকার মাধ্যমে ইহাতে দার্শনিক তত্ত্বেরও সমাবেশ ঘটিয়াছে। ভারতীয় সমাজ, সভ্যতা, জীবন ও দর্শনের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি এই গ্রন্থের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে ইতিহাস স্বচ্ছ, যেখানে ইতিহাসের গ্রথনে কোন প্রকার সংকোচ নাই, অসত্যভাষণ ও অতিভাষণের দোষ নাই সেখানে ইতিহাস কেবলমাত্র ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ থাকে না তাহা অতি সুন্দর জীবন্ত কাব্যরূপে সকলের নিকট সমাদৃত হয়। কবি শব্দের অর্থ নির্দেশ করিতে গিয়া প্রাচীনগণ বলিয়াছেন—কবি ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ যিনি অতীত বা অতিক্রান্ত বিষয় দর্শন করিতে পারেন তিনিই কবি। যাঁহার অতিক্রান্তদর্শনের সামর্থ্য আছে তিনি ভবিষ্যদর্শনেও সমর্থ। বাল্মীকির কবিত্ব সুপরিস্ফুট হইয়াছে তাঁহার ভবিষ্যদর্শনের অসাধারণ মেধার প্রত্যক্ষ পরিচয়ে।

ভারতীয় শাস্ত্রে আবার এই মহাকাব্য স্মৃতিগ্রন্থরূপে পরিচিত। যদিও ইহা স্মৃতিগ্রন্থ তথাপি ব্রহ্মজ্ঞানী নারদ রামকথার মূল দ্রষ্টা ও প্রবক্তা

হওয়ায় রামায়ণ বেদতুল্য ও বেদার্থ প্রতিপাদক। রামায়ণ শ্রুতিতুল্য হইলে ইহার মূলকেন্দ্র রাম পরম দেবতার পর্যায়ে উপনীত হন ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। রামকে যেরূপ বিষ্ণুদৃষ্টিতে চিন্তা করিয়া সমগ্র রামায়ণ অধ্যয়ন করা চলে সেরূপ মনুষ্যমাত্র বিবেচনা করিয়া আদ্যোপান্ত গ্রন্থটিকে পড়িতে কোন অসুবিধা হয় না। (এ সম্বন্ধে ৮৫ পৃষ্ঠার পাদটীকার বক্তব্য দ্রষ্টব্য)।

চারিটি অধ্যায়সমন্বিত এই প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে উপোদ্‌ঘাতস্বরূপে রামায়ণের উদ্ভব ও করুণরস আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় ও সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। পরিশিষ্টে এই সকল ভাষায় লিখিত রাম ও রামকাহিনী অবলম্বনে যে সকল সাহিত্যকৃতি রহিয়াছে তাহারও একটি নাতিবিস্তৃত নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া রামায়ণের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। 'রামায়ণে উপনিষদের আদর্শের ক্রমবিকাশ' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে রামায়ণে উপনিষদর্থই যে ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত তাহার উপপাদন করা হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে রামায়ণের অধিকাংশ চরিত্রই যে প্রেয়ঃ অপেক্ষা শ্রেয়ঃকেই প্রাধান্য দিয়াছেন তাহাও উদাহরণসহযোগে উপস্থাপিত। তৃতীয় অধ্যায়ে রামায়ণের জীবনাদর্শ আলোচিত হইয়াছে। আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্য কতকগুলি চরিত্রের সুবিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্যসমূহ যাহাতে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে সেজন্য সেগুলি বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত। চরিত্রবিশ্লেষণে অপরিহার্য-ভাবেই পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বনবাসের প্রথম রাত্রিতে রামের বিলাপ, সীতা নির্বাসন, বালিবধ, সীতার স্বর্ণমৃগের প্রতি লোভ ও লক্ষ্মণের প্রতি কঠোর বাক্যপ্রয়োগ, কৈকেয়ীকর্তৃক রামের নির্বাসন-প্রার্থনা প্রভৃতি রামায়ণের বহু-বিতর্কিত কয়েকটি প্রসঙ্গ আলোচিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ও আশুতোষ অধ্যাপক পরম পূজনীয় ডক্টর শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী, এম. এ, পি. আর. এস্, পি, এইচ্ ডি, এফ্ আর. এ. এস্. (লণ্ডন) স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ মহাশয় আমার এই সামান্য গবেষণার দীন আয়োজনে 'স্বস্তিবাচনে'র ভার লইয়া আমাকে তাঁহার পণ্য আশীর্বাদে ধন্য করিয়াছেন। তাঁহাকে জানাই আমার বিনীত প্রণাম।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ সীতানাথ গোস্বামী, এম. এ, ডি. ফিল, বেদ-বেদান্ত-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের

অধীনে এই গ্রন্থের গবেষণাকার্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহারই ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুপ্রেরণায় এই গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হইল। তাঁহার অপরিশোধ্য ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিয়া আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মিবৃন্দের নিকট বিশেষ করিয়া ভাষাবিভাগগুলির কর্মিসকলের নিকট আমার অপরিসীম ঋণ রহিয়া গেল। 'ইণ্টার ন্যাশনাল একাডেমি অব ইণ্ডিয়ান কালচার' ও 'সাহিত্য একাডেমি'র সহায়তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ এস. বি. বার্ণেকরের সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ডঃ মথুরা দত্ত পাণ্ডেকে ধন্যবাদ জানাই তাঁহার অকৃপণ সহযোগিতার জন্য। শ্রদ্ধেয় কামিল বুল্কের 'রামকথা' (উৎপত্তি ঔর বিকাস) গ্রন্থটি হইতে আমি প্রচুর অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছি। তাঁহাকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। শ্রীহিল্লা ভকিল সম্পাদিত 'রামায়ণ ইনফ্লুয়েন্স' গ্রন্থ হইতেও আমি প্রচুর সহায়তা লাভ করিয়াছি। তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম। 'দেবযান' ও 'আর্যশাস্ত্র' পত্রিকাদ্বয়ের নিকট আমার ঋণের সীমা নাই। শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন রচিত 'রামায়ণী কথা' ও শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য রচিত 'রামায়ণের চরিতাবলী' নামক গ্রন্থদ্বয় রামায়ণ গবেষণার পক্ষে অপরিহার্য তাহা বলাই বাহুল্য। সুবিখ্যাত শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ অঙ্কন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহাকে আমার শ্রদ্ধা জানাই।

সর্বশেষে এল্‌ম্‌ প্রেসের শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মিত্রের অকৃত্রিম ও আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম। পণ্ডিতগণের নিকটে আমার বিনীত নিবেদন যে, গ্রন্থ প্রণয়নকার্যে প্রথমপ্রবিষ্টা আমার ভুলগুলি প্রদর্শন করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিবেন। আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ রহিয়াই গেল। সেজন্য আমি দুঃখিত।

ইতি—

শ্রীস্বস্তিকা দত্ত

উৎসর্গ

৺বাবাকে

সূচীপত্র

রামায়ণের উদ্ভব ও করুণরস

আদিকাব্যের স্রষ্টা সরস্বতীর বরপুত্র বাল্মীকির কণ্ঠে প্রথম শ্লোক উচ্চারিত হইল ক্রৌঞ্চের শোকে ক্রৌঞ্চীর করুণ আর্তনাদ হইতে।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ।। ১।২।১৫

এই চারিপাদে নিবদ্ধ আদি শ্লোক হইতেই ব্রহ্মার আদেশে সৃষ্ট হইল আদিকবির আদিকাব্য রামায়ণ। যে-রামায়ণ সম্বন্ধে ব্রহ্মার আশীর্বাদ উচ্চারিত হইল—

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।। ১।২।৩৬
তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি। ১।২।৩৭

পিতামহ ব্রহ্মার সেই আশীর্বাদ ব্যর্থ হয় নাই। আজও ভারতের কোটি কোটি লোকের অন্তরে রামায়ণ চিরভাস্বর। এই সর্বজনচিত্তাপহারক রামায়ণ গ্রন্থের স্থান কাব্যহিসাবে অতি উচ্চে। সুতরাং এই শাশ্বত গ্রন্থ রামায়ণের কাব্য-বিষয়ক সমীক্ষা কম আকর্ষণযোগ্য নয়। রামায়ণের অঙ্গী রস করুণরস সমগ্র কাব্যেই অনুস্যূত। আদিকবির অন্তরস্থিত করুণ-রসেরই বাহ্য অভিব্যক্তি হইতেছে রামায়ণ। করুণরসের প্রাধান্য বা অঙ্গিত্ব স্বীকার করিলেও এই মহাগ্রন্থে সকল রসই স্থানে স্থানে অভিব্যক্ত। এই অঙ্গরসগুলি অঙ্গিরসের পরিপোষণে সাহায্য করিয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতেছে যে, বাল্মীকির মুখ হইতে সহসা যে-শ্লোকের উৎপত্তি তাহা কি কেবলমাত্র শোক হইতেই উত্থিত, না ইহাতে আদিরস শৃঙ্গারের স্থায়িভাব রতিও কারণরূপে বিরাজিত। এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের পূর্বে বাল্মীকির সম্মুখে যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল তাহার পর্যালোচনা করা যাউক।

তমসানদীর তীরস্থ শোভা নিরীক্ষণে ব্যাপৃত বাল্মীকি তাঁহার অতি নিকটে একটি ক্রৌঞ্চমিথুনকে মধুরস্বরে নিজ নিজ ভাব প্রকাশে ব্যস্ত দেখিলেন। এমন সময় প্রাণিমাত্রের সহজশত্রু ব্যাধকর্তৃক ক্রৌঞ্চদ্বয়ের মধ্যে পুরুষ ক্রৌঞ্চটি হইল নিহত। তাম্রশীর্ষ ও মিলন-আকাঙ্ক্ষায় মত্ত ক্রৌঞ্চটির শোকে ক্রৌঞ্চীর করুণ আর্তনাদ শুনিবামাত্র আদিকবির কণ্ঠ

হইতে উৎসারিত হইল আদি শ্লোকটি। পার্শ্বস্থ শিষ্যের নিকট তাঁহার প্রথম বাণী শ্লোক নামে পরিচিতি লাভ করুক এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন বাল্মীকি। পতিশূন্য ক্রৌঞ্চীর শোকে শোকাহত আশ্রমে প্রত্যাগত বাল্মীকি পিতামহ ব্রহ্মার নিকট দ্বিতীয়বার শ্লোকটি উচ্চারণ করিলে ব্রহ্মা মহামুনি নারদ হইতে শ্রুত রামচরিত নিয়া রামায়ণ রচনার আদেশ দিলেন।

ঘটনাটির বিশেষ অনুধ্যান করিলে দেখা যায়, বাল্মীকি দুই স্থলেই উল্লেখ করিয়াছেন শোক হইতে শ্লোকের উৎপত্তি। শোক হইতেছে করুণরসের স্থায়িভাব। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন ইষ্টনাশ ও অনিষ্টপ্রাপ্তি হেতুই করুণরসের উৎপত্তি। কবির মনে সহসা করুণরসের আবির্ভাব হইল কোন্ ঘটনা হইতে তাহার বিশ্লেষণ করা যাউক। প্রণয় প্রকাশে মত্ত ক্রৌঞ্চের প্রাণবধ দেখিয়াই যে অভিশাপ বাণী উচ্চারিত তাহাই প্রথম কবির প্রথম কাব্যের উৎস। প্রশ্ন করা যাইতে পারে, নিষাদের জীবিকাই হইতেছে প্রাণিহত্যা, তাহার পক্ষে পক্ষিহনন দোষার্হ নহে, অন্যায়ও নহে অথবা হিংস্রতার প্রকাশও নহে। তবে কেন বাল্মীকি ঋষি হইয়াও ঋষিধর্মের বিপরীত আচরণ করিলেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, ক্রৌঞ্চটি যে মুহূর্তে ক্রৌঞ্চীর সহিত মিলন-আকাঙ্ক্ষায় মত্ত সেই মুহূর্তেই আসিল সেই নিষ্ঠুর শরাঘাত। মিলনের পূর্ব মুহূর্তেই ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্বের একজনের প্রাণনাশই কবির চিত্তকে করিয়াছে শোকে উদ্বেলিত। সেই শোকেরই রূপান্তর শ্লোকটি। কিন্তু ক্রৌঞ্চমিথুনটি যদি একসঙ্গে না থাকিত অথবা তাহাদের মিলনের মুহূর্তে যদি চিরবিচ্ছেদ না ঘটিত তবে হয়তো কবি এরূপ শোকাহত হইতেন না বা নিষাদকে অভিশাপও দিতেন না—ক্রৌঞ্চবধকে তিনি ব্যাধের জীবিকার অঙ্গরূপেই দেখিতেন। ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চীর সম্ভোগবাসনার অপূর্ণতাই কবিচিত্তকে করিয়াছে আলোড়িত। এই আলোড়নই ঘটাইয়াছে তাঁহার অন্তর্নিহিত সারস্বত প্রতিভার বিস্ফোরণ। মহাভারতেও পাণ্ডুর প্রতি মুনির উক্তিতে এই মনোভাবেরই পরিচয় পাই—

> অস্বর্গ্যমযশস্যং ত্বমনুতিষ্ঠসি ভারত।
> কো হি বিদ্বন্মৃগং হন্যাচ্চরন্তং মৈথুনং বনে।।

মহাভারত, আদিপর্ব ১১৭।২৭

টীকাকার গোবিন্দরাজও সহমত প্রকাশ করিয়াছেন, মৃগ পক্ষী প্রভৃতি বধ করা ব্যাধের ধর্ম। সুতরাং অনপরাধ ব্যাধকে মুনির শাপপ্রদান

করা উচিত হয় নাই। কিন্তু রতিপরবশ দশাতে বধই দোষের কারণ হইয়াছে। দেখা যাইতেছে করুণরস আদিকবির কবিপ্রতিভার উৎস হইলেও সেই উৎসের মূল রহিয়াছে শৃঙ্গাররসে। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ দ্বিবিধ শৃঙ্গারের মধ্যে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের লক্ষণ—

যত্র তু রতিঃ প্রকৃষ্টা নাভীষ্টমুপৈতি বিপ্রলম্ভোঽসৌ ॥

সাহিত্যদর্পণ ৩।১৮৬

বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের নায়ক নায়িকার অনুরাগ অতিবৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও বিঘ্নবশতঃ নায়ক নায়িকাকে অথবা নায়িকা নায়ককে প্রাপ্ত হয় না। এখানে আমরা দেখি ক্রৌঞ্চের প্রতি ক্রৌঞ্চীর অনুরাগ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ক্রৌঞ্চকে পাইল না বিঘ্নবশতঃ। এই বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার দ্বারা রামায়ণগ্রন্থ পরিব্যাপ্ত তাহা একটু গভীরতার সঙ্গে উপলব্ধি করিলেই প্রতিভাত হয়। নিষাদের প্রতীক রাবণকে ও ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রতীকরূপে রামসীতাকে দেখিলেই তাহা স্পষ্টতর হয়।

প্রখ্যাত টীকাকারদের ভাষ্যেও আমাদের এই ধারণার সমর্থন মিলে। কতকের মতে—দেবতা, ঋষি ও ত্রিলোকের পীড়নকারী রাবণ হইতেছে নিষাদ। মুনি অভিশাপ দিতেছেন—হে নিষাদ অর্থাৎ হে রাবণ! রাজ্যক্ষয় ও বনবাসাদি দুঃখের দ্বারা কৃশতা প্রাপ্ত রামসীতারূপ মিথুন হইতে সীতাকে অপহরণ করিয়া মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা প্রদান করায় তুমি ব্রহ্মার বরে লঙ্কাপুরে পুত্রপৌত্রাদিভৃত্যগণের সঙ্গে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছ তাহা হইতে বঞ্চিত হও।

তিলকটীকাকার শ্রীরামের মতে ভগবান্ রাম বাল্মীকির রামচরিত বর্ণনা করিবার ইচ্ছার কথা জানিয়া নিজ চরিত্রে করুণরসের প্রাধান্য থাকায় করুণার্দ্রচিত্তসম্পন্ন জনই কাব্যসৃষ্টির অধিকারী হওয়ায় বাল্মীকির করুণাঘনচিত্তবৃত্তির সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মানসে ও ভৃগুদত্ত শাপের ফলে নিজের মর্ত্যভূমিতে আগমনের জন্য নিজেই নিষাদরূপে মুনির অলক্ষ্যে থাকিয়া ক্রৌঞ্চ অর্থাৎ রাক্ষসকে বধ করিলেন। তখন মুনি অভিশাপ দিলেন—যেহেতু কামমোহিত ক্রৌঞ্চদ্বয় হইতে একটিকে বিযুক্ত করিলে সেহেতু তুমিও বহু বৎসর ধরিয়া নিজের স্ত্রীর সান্নিধ্য হইতে ইহলোকে বঞ্চিত থাকিবে। 'একমবধীঃ' কথার অর্থ হইল যেরূপ ক্রৌঞ্চীকে ক্রৌঞ্চবিহীন করিয়াছ সেরূপ তুমিও প্রিয়ভার্যা হইতে বিযুক্ত

হইবে, তোমার স্ত্রীও তোমাবিহীন হইবে। অর্থাৎ রাম ও সীতা পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত থাকিবে ঋষির অভিশাপে।

গোবিন্দরাজের ভূষণটীকা অনুযায়ী রামসীতারূপ ক্রৌঞ্চযুগল হইতে পাপাত্মা নিষাদরূপ লোকহিংসক রাবণ সীতাকে অপহরণ করেন ও সীতারূপ ক্রৌঞ্চী তখন ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে থাকেন।

সমগ্র রামায়ণে যে করুণরস বিধৃত হইয়াছে তাহা সীতা ও রামের বিচ্ছেদকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই করুণরসের মূল রহিয়াছে প্রবাস বিপ্রলম্ভে। রামসীতাকে ক্রৌঞ্চযুগলের প্রতীকরূপে দেখিলে এই প্রতীতিই জন্মে যে রামায়ণে রহিয়াছে করুণরসেরই প্রাধান্য তবুও সেই করুণরসের মূলে রহিয়াছে শৃঙ্গার রস।

ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় এবং সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

বহু যুগ ধরিয়া বাল্মীকি রামায়ণ ভারতীয় সাহিত্যিকগণের অনুপ্রেরণার উৎস। রামায়ণ অবলম্বনে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় বহু গীতি-কাব্য, মহাকাব্য ও নাটক রচিত হইয়াছে। চিত্রশিল্পী ও ভাস্করগণেরও অনুপ্রেরণার খোরাক যোগাইয়াছে এই মহাগ্রন্থের নানা কাহিনী। ভারতীয় প্রতিটি ভাষায় ও বহির্ভারতের বহু ভাষায় রামায়ণ অনূদিত হইয়াছে। জনসাধারণও প্রগাঢ়ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে ইহার কাব্যকাহিনীর চুম্বকের দ্বারা। এই কাব্যকাহিনীর প্রভাব কত যে সুদূরব্যাপী তাহার আভাস পাওয়া যাইবে রামায়ণগ্রন্থ অবলম্বনে রচিত সাহিত্যকৃতির আলোচনার মাধ্যমে। অধ্যায়ের শেষে সংযোজিত বিভিন্ন আলোচনাচক্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ভারতে তথা বিদেশে ইহার প্রভাব যে কি অপরিমেয় তাহারই সূচক।

অসমীয়া সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

অসমীয়া সাহিত্যের উপর রামায়ণের গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব রহিয়াছে। রামায়ণের উচ্চ আদর্শ আসামের সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে। অসমীয়া বিবাহগীতি ও গ্রাম্যগীতিতে রামায়ণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে কাছাড়রাজ মহামাণিক্যের রাজত্বকালে মাধব কন্দলীই প্রথম বাল্মীকি রামায়ণ অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেন। প্রধানতঃ রাজার মনোরঞ্জনের জন্য ইহা লিখিত হইলেও রাজ্যের সকল শ্রেণীর জনগণের নিকট ইহা প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ

করে। মন্দিরের ওঝা পালি গায়কেরাও রামায়ণ হইতে গান করিয়া শুনাইত। মাধব কন্দলীর পর কামাখ্যার দুর্গাবর 'গীতি রামায়ণ' রচনা করেন। তাঁহার আবির্ভাব কাল কোচ রাজা বিশ্বসিংহের সময় (১৫১৫-১৫৪০)। ষোড়শ শতাব্দীতে শংকরদেবের সমসাময়িক অনন্ত কন্দলী তাঁহার পূর্বসূরি মাধব কন্দলীর প্রকাশভঙ্গী অনুসরণ করিয়া রামায়ণের কাহিনী লইয়া কতকগুলি কাব্য রচনা করেন। মাধব কন্দলী তাঁহার রামায়ণ পদ্যে লিখিলেও পরিবর্তিগণ তাহা গীতে পরিণত করিয়াছিলেন। এই সঙ্গীতকলা যে উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল তাহার প্রমাণ হইতেছে যে এই রামায়ণের সঙ্গীতায়নে বিভিন্ন রাগের প্রয়োগ। সর্ব সমেত ১৭টি রাগে এই রামায়ণ গীত হয়। বারবী, গুজ্জরা, রামগিরি, আছিয় ও ভাটিয়ালী ইত্যাদি ইহাদের মধ্যে অন্যতম।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে রামানন্দ, বল্লভাচার্য, নামদেব ও শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সময় আসামে শংকরদেবের আবির্ভাব হয়। তিনি 'এক শরণ নাম ধর্ম'[১] শিক্ষা দেন। তাঁহার ধর্ম ভাগবত পুরাণ ও গীতার উপর প্রতিষ্ঠিত। শংকরদেবের নিকট রামচন্দ্র কৃষ্ণ ব্যতীত কেহ নহেন। জনপ্রিয় রামায়ণকে তিনি কৃষ্ণভক্তি প্রচারের মাধ্যমরূপে ব্যবহার করেন। শংকরদেব ও তাঁহার শিষ্য মাধবদেব উভয়েই মাধব কন্দলীর পাঁচ কাণ্ডে লিখিত রামায়ণে আদি ও উত্তর কাণ্ড সংযোজিত করেন। শ্রীশংকরদেব 'সীতা স্বয়ংবর' নামে এক ক্ষুদ্র একাঙ্ক নাটিকা রচনা করেন। শংকরদেব রামায়ণের দুইটি কাণ্ডে ও গীতিকায় রামকে কৃষ্ণে রূপান্তরিত করিয়াছেন।

অনন্ত ঠাকুর আতা অথবা কায়স্থ হৃদয়ানন্দ শংকরদেবের কীর্তনশৈলীতে রাম সম্বন্ধে কীর্তন রচনা করেন। অনন্ত আতা ঠাকুর নিজেও ধর্মগুরু ও শংকরদেবের পঞ্চম বংশধর। তাঁহার কীর্তন বৈষ্ণবগণ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

রঘুনাথ মহান্ত গদ্যে রামায়ণ রচনা করেন। অনন্ত কন্দলী 'সীতার পাতাল প্রবেশ' ও মাধবদেব 'রাম ভাবন' নামক নাটক রচনা করেন।

দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রঘুনাথ দাস 'শত্রুঞ্জয়' নামক কাব্য

১। এই ধর্মের মূল কথা 'এক দেব এক সেব'। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' গীতার এই মর্মবাণীই 'এক শরণ নাম ধর্ম'র প্রধান বক্তব্য। এই ধর্মকে মহাপুরুষীয়া ধর্মও বলে।

রচনা করেন। তিনি বালীর শক্তি ও জয়লাভ বর্ণনা করেন। কামরূপের নরকাসুরও বালীর এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন ও যোগবলে বানররাজ মলয়জের নিকট সৈন্যসহ উপস্থিত হন।

অসমীয়া অদ্ভুতরামায়ণ সংস্কৃত অদ্ভুতরামায়ণ হইতে ভিন্ন। এখানে হনুমানের শক্তি ও ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রভারতী তাঁহার 'মহীরাবণ বধ' কাব্যে ইন্দ্রজালের শক্তি ও হনুমানের শক্তি বর্ণনা করিয়াছেন। এই কাব্যে কিভাবে হনুমান্ দেবী চণ্ডী ও মহীরাবণকে বধ করেন ও পাতাল হইতে রাম লক্ষ্মণকে উদ্ধার করেন তাহা বর্ণিত হইয়াছে। 'গণক চরিত' নামক কাব্যে দেখিতে পাই যে হনুমান দৈবজ্ঞের ছদ্মবেশে সীতাকে লাভ করিবার জন্য রাবণের সকল কৌশল ব্যর্থ করিয়া দেন। অধ্যাত্ম ও যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণের প্রভাব অসমীয়া সাহিত্যে বিশেষ পাওয়া যায় না।

ওড়িয়া সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

ভারতীয় অন্যান্য ভাষার ন্যায় ওড়িয়া সাহিত্যেও রামায়ণের প্রভূত প্রভাব রহিয়াছে। ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথম কবি হইতেছেন সরলদাস। তিনি হইতেছেন পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। ১৪১৫ সালে তিনি 'বিলঙ্কা রামায়ণ' রচনা করেন। এই রামায়ণে সীতা চিরন্তন শক্তির অবতাররূপে বর্ণিত। এই কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে, রাবণের মৃত্যুর পর অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিবার পর প্রকৃতপক্ষে রাবণবধ কে করিয়াছেন তাহা নিয়া রাম ও সীতার মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত হয়। অনেক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত করা হয় যে, যিনি বিলঙ্কার সহস্র মুণ্ড দানবরাজকে হত্যা করিতে পারিবেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে রাবণকে বধ করিয়াছেন। রামচন্দ্র বিলঙ্কার দানবকে বধ করিতে অসমর্থ হইলেন। তখন সীতা লক্ষ্মণকে নিয়া সেখানে গেলেন ও সহস্র মুণ্ড দানবরাজকে বধ করিলেন। এই রামায়ণের বিষয়বস্তু বাল্মীকি-রামায়ণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সরলদাসের এই রচনার উদ্দেশ্য ছিল নারীর চিরন্তন শক্তির প্রকাশ প্রদর্শন করা। মনে হয় শক্তিপূজাই তাঁহাকে এই নারীশক্তির বর্ণনা করিতে অনুপ্রেরণা প্রদান করিয়াছে।

তারপর ১৫১০ সালে অর্জুনদাস 'রাম বিভা' রচনা করেন। ইহা একটি জনপ্রিয় গীতি কবিতা। দ্বাদশ অধ্যায়ে লিখিত এই কাব্যে আছে—রামের জীবনী, বিশ্বামিত্র কর্তৃক দুই রাজপুত্রের নিমন্ত্রণ,

তাড়কাবধ, অহল্যার মুক্তিলাভ, বালী, সুগ্রীব ও হনুমানের জন্মকাহিনী, সীতার স্বয়ংবর ও পরশুরামের পরাজয়। এখানে কবি রামচন্দ্রকে জগন্নাথের প্রতিরূপ হিসাবে দেখাইয়াছেন। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে ঘুমুসুরের রাজা ধনঞ্জয় ভঞ্জ 'রঘুনাথ বিলাস' রচনা করেন।

চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ বলরাম দাস (১৪৭৩) রামায়ণ রচনা করেন। তাঁহার রামায়ণ জগমোহন রামায়ণ, দাণ্ডি রামায়ণ, বলরাম দাসের রামায়ণ—এই তিন নামে পরিচিত। তিনি 'দণ্ডী ব্রুট' ছন্দে তাঁহার রামায়ণ রচনা করেন। কিন্তু এই রামায়ণের ঘটনার সহিত বাল্মীকি রামায়ণের ঘটনার সাদৃশ্য খুব কমই আছে। মূল রামায়ণের বিষয়বস্তু সামান্যরূপে গ্রহণ করিয়া সৃজনশীল কল্পনা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দ্বারা তিনি তাঁহার রামায়ণকে মনোজ্ঞ কাব্যে পরিণত করেন। তিনি রামচন্দ্রকে সপ্তম অবতার রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিটি উড়িষ্যাবাসীর গৃহে এই জগমোহন রামায়ণ রহিয়াছে।

ইহার পরই শংকরদাস করুণরসে পূর্ণ 'বারমাসী কহলী' রচনা করেন। এখানে রামের বিরহে কৌশল্যা কিভাবে প্রতিটি মাস অতিবাহিত করিয়াছেন তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে। এই সময়ই হলধরদাস অধ্যাত্মরামায়ণ (১৬৮১) রচনা করেন।

ধনঞ্জয় ভঞ্জের পৌত্র কবিসম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জ (১৬৯৫) 'বৈদেহীশ বিলাস' রচনা করেন। প্রতিটি পঙ্‌ক্তির পূর্বে তিনি 'ব' অক্ষরটি ব্যবহার করেন। তাঁহার বর্ণনা, প্রকাশভঙ্গী, একটি শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগ, রচনার মাধুর্য তাঁহার সাহিত্যপ্রতিভাকে প্রকাশিত করে।

চিকিতি-এর রাজা পীতাম্বর রাজেন্দ্র (১৭৪৯) 'রামলীলা' নামক নাটক রচনা করেন। তাঁহার রচনাভঙ্গী পরবর্তী বহু সাহিত্যিক অনুসরণ করিয়াছেন। সুরবামণি পট্টনায়ক (১৭৭৩) ও কৃষ্ণচরণ পট্টনায়ক (১৮১৫) ওড়িয়াতে বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ করেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বিশ্বনাথ খুণ্টিয়া (১৭৮০) 'বিচিত্র রামায়ণ' রচনা করেন। ভক্ত কবি মধুসূদন (১৮৫৩) উত্তররামচরিতের অনুবাদ করেন। ইনি ছোটদের বালরামায়ণ রচনা করেন। তাঁহার রচিত 'রাম বনবাস', 'অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন' ও 'সীতা বনবাস' সত্যই অপূর্ব। এই গ্রন্থগুলি ওড়িয়া সাহিত্যে চিরন্তন স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। গঙ্গাধর মেহার (১৮৬২) নামে একজন কবি রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া 'তপস্বিনী' নামক কাব্য রচনা করেন। ইহা খুব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। রামের

অযোধ্যা প্রত্যবর্তন লইয়াও তিনি কাব্য রচনা করেন। ওড়িয়া বৈয়াকরণ চন্দ্রমোহন মহারাণা অশোকবনে হনুমান্ দর্শনে সীতার বিলাপ ও রামচন্দ্র দর্শনে সীতার উদ্বেগপূর্ণ জিজ্ঞাসা অবলম্বনে তাঁহার কাব্য রচনা করেন। কবিবর চিন্তামণি মোহান্তি (১৮৬৭) বিখ্যাত ওড়িয়া উপন্যাস 'রামচন্দ্র' রচনা করেন। কামপাল মিশ্রের 'সীতা বিভা' নাটকটি ওড়িয়া সাহিত্যে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য দাবী করে। ইহা ছাড়া ওড়িয়া ভাষায় উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রহিয়াছে জানকী, স্বর্ণসীতা, রাবণ, পঞ্চবটী, লক্ষ্মণ-বর্জন, তরণীসেন প্রভৃতি।

শ্রীজগবন্ধু মহাপাত্র পদ্যে তুলসীদাসের রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছেন। কপলিপদের রাজাও পদ্যে রামচরিতমানসের অনুবাদ করিয়াছেন ও প্রত্যেকটি চরিত্র সম্বন্ধে ভূমিকাস্বরূপ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়াছেন। 'দৈনিক সমাজে'র সম্পাদক ও প্রাক্তন মন্ত্রী পণ্ডিত লিঙ্গরাজ মিশ্র বাল্মীকি রামায়ণের সহজ ওড়িয়া অনুবাদ করেন। 'সীতা 'তরঙ্গিণী'র রচয়িতা নীলকণ্ঠ রথ তাঁহার কাব্যটির জন্য 'কলহণ্ডি' সাহিত্য পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

কানাড়া সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

রামায়ণ ভারতের প্রতিটি প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছে। কানাড়া সাহিত্যও ইহার ব্যতিক্রম নহে। কানাড়া সাহিত্যে রামায়ণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় নৃপতুঙ্গের (৮৫০) 'কবিরাজমার্গ' নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতাতে তিনি রামকাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। দশম শতাব্দীতে জৈন কবি পন্না শান্তিপুরাণে তাঁহারই রচিত রামকথা উল্লেখ করিয়াছেন। কেশিরাজের (১২৬০) 'শব্দমণি দর্পণে'ও এই রামকাহিনী হইতে কবিতা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সেই বিশেষ কবিতাটি নাগবর্মার (১১৫০) 'কাব্যালোকনে'ও উদ্ধৃত হইয়াছে। যদিও 'ভুবনাইক রামাভ্যুদয়' অপ্রাপ্য, তথাপি ইহাই কানাড়া সাহিত্যে রামায়ণের উপর প্রথম সাহিত্য কর্ম। কানাড়া সাহিত্যে রামায়ণের দুইটি ঐতিহ্য রহিয়াছে। একটি হইতেছে জৈন ঐতিহ্য, অপরটি বাল্মীকি ঐতিহ্য। গদ্যে লিখিত 'চাবুণ্ডারায় পুরাণে' (৯৭৮) আমরা প্রথম জৈন রামকাহিনীর কথা জানিতে পারি। এই জৈন রামকাহিনীর আবার দুই রকম ঐতিহ্য দেখা যায়। একটি হইতেছে বিমলসূরির 'পউমচরিয়' ও অপরটি হইতেছে গুণভদ্রের 'উত্তরপুরাণ'। চাবুণ্ডারায় পুরাণ উত্তরপুরাণকেই

অনুসরণ করিয়াছে। জৈন রামায়ণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকৃতি হইতেছে নাগচন্দ্রের (১১৫০) 'রামচন্দ্রচরিত পুরাণ'। ইনি বিমলসূরিকেই অনুসরণ করিয়াছেন। এই কাব্যটির বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, ইহাতে রাবণ বিয়োগান্ত নায়কে উন্নীত হইয়াছে। কুমুদেন্দুর 'কুমুদেন্দু-রামায়ণ', দেবাপ্পা কবির 'রামবিজয়-কাব্য', দেবচন্দ্রের 'রামকথাবতার', চন্দ্রসাগর বর্ণীর 'জৈন রামায়ণ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রামসাহিত্য। কুমুদেন্দু নাগ-চন্দ্রকেই অনুসরণ করিয়াছেন এবং ইঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হইতেছে ষট্‌পদী ছন্দের ব্যবহার। দেবাপ্পা কবি সাংগল্য ছন্দে তাঁহার কাব্য রচনা করেন। দেবচন্দ্রের সাহিত্যকৃতি 'রামকথাবতার' চাবুণ্ডারায় রামায়ণ, পম্পা রামায়ণ ও কুমুদেন্দু রামায়ণের উপর মিশ্র সাহিত্য কর্ম। চন্দ্রসাগর বর্ণীর জৈন রামায়ণ বস্তুতঃ বাল্মীকি রামায়ণ এবং জৈন রামায়ণ উভয়কেই অবলম্বন করিয়া লিখিত।

বাল্মীকি রামায়ণের উপর নির্ভরশীল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-কৃতি হইতেছে বীজপুরের তোরবেবাসী নরহরি (১৫৮০) রচিত তোরবেয় রামায়ণ। নরহরি নিজেকে বাল্মীকি কুমার বলিয়া পরিচয় দিতেন। তিনি ১০৯টি অধ্যায়ে এই কাব্য রচনা করেন ও তাঁহার মধ্যে ৫৫টি অধ্যায় যুদ্ধকাণ্ড অবলম্বন করিয়া লিখিত। তোরবে রামায়ণের রাবণ অংশতঃ বিয়োগান্ত নায়কে পর্যবসিত হইয়াছেন। মহীশূরের চামররাজ ওয়াদেয়রের (১৬১৭-১৬৩৭) রাজসভায় গদ্যে 'চামরাজোক্তিবিলাস' নামে বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ করা হয়। অপর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকৃতির মধ্যে রহিয়াছে ভামিনি ষট্‌পদীতে লিখিত শঙ্কর নারায়ণের (১৭২৫) অধ্যাত্মরামায়ণ, হরিদাসের (১৭৫০) মূল বালরামায়ণ, ভদ্রক ষট্‌পদীতে লিখিত বেঙ্কামাত্যের (১৭৭০) রামাভ্যুদয়, ভামিনি ষট্‌পদীতে লিখিত বট্টলেশের বট্টলেশ্বররামায়ণ ও কবি নারায়ণের উত্তররামায়ণ, রামপট্টাভি-ষেকম্, অদ্ভুত রামায়ণ, মুদ্দানার রামাশ্বমেধ।

মুদ্দানা (১৮৬৯-১৯০১) রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের নূতন রূপ দিয়াছেন। তিনি তাঁহার কাব্যে নবদম্পতী মুদ্দানা ও মনোরমার মধ্যে সুন্দর কথোপকথন উপস্থাপন করিয়া কাব্যে একটি বিশেষ সৌন্দর্য ও হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। তাহাতে কাব্যটিতে নাটকীয়তার স্পর্শ পাওয়া যায়। তিনি রামাশ্বমেধ ও অদ্ভুতরামায়ণ গদ্যে রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রামপট্টাভি-ষেকম্ পদ্যে রচিত। মুদ্দানার সাহিত্যিক নাম হইতেছে নন্দলিকে লক্ষ্মী-নারায়ণাপ্পা।

অদ্ভুতরামায়ণ, আনন্দরামায়ণ ও অধ্যাত্মরামায়ণ কানাড়া ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ডোড্ডবেলে নারায়ণ শাস্ত্রী, ডি অলসিংগ্রচর পট্টাভিরাম শাস্ত্রী, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেকেই রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছেন। লক্ষ্মীশ তাঁহার 'জৈমিনি ভারতে' বনে পরিত্যক্তা সীতার দুঃখ মর্মস্পর্শী ভাষায় অঙ্কন করিয়াছেন।

আর্যশাস্ত্রীর 'শেষরামায়ণ', এস. রামচন্দ্র রাওয়ের 'শ্রীরামচরিতম্', এম কৃষ্ণাপ্পার 'রামচরিত' ছাড়াও অনেক পদ্যে রচিত রামায়ণ কানাড়া ভাষায় রহিয়াছে।

এস, রামস্বামীয়েঙ্গার-এর 'ভারতভক্তিকাব্যম্', পি. টি. নরসিংহচরের 'অহল্যা' ও ডি. ডি. গুণ্ডাপ্পার 'রামপরীক্ষণম্' রামকাহিনী উপজীব্য করিয়া রচিত। 'অহল্যা' কল্পনা ও সঙ্গীত সমৃদ্ধ অপূর্ব কাব্য। এখানে অহল্যা চরিত্র নূতন আলোকে আলোকিত। 'রামপরীক্ষণম্' কাব্যে ডি. ডি. গুণ্ডাপ্পা অহল্যা, তারা, মন্দোদরী, সীতা ও হনুমানের দৃষ্টিভঙ্গীতে রামের ধর্ম পরীক্ষা করিয়াছেন।

বাল্মীকি-রামায়ণ অবলম্বন করিয়া রচিত ডঃ মস্তি বেঙ্কটেশ আইয়েঙ্গারের 'আদিকবি বাল্মীকি' একটি সমালোচনামূলক সাহিত্যকৃতি। এখানে নানা মানবিক সমস্যা আলোচিত হইয়াছে। ইহা কানাড়া ভাষায় বাল্মীকি রামায়ণের সমালোচনামূলক মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। 'মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় একস্টেনশন্ বক্তৃতা' বাল্মীকি-রামায়ণের উপর আরও একটি মূল্যায়ন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

কর্ণাটকের প্রথিতযশা কবি পদ্মভূষণ ডঃ কে. পি. পুট্টাপ্পার বাল্মীকি-রামায়ণের উপর দুইটি সাহিত্যকৃতি রহিয়াছে—'জনপ্রিয় বাল্মীকি-রামায়ণ' ও শ্রীরামায়ণদর্শনম্'। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীরামায়ণদর্শনম্' সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার লাভ করে। জনপ্রিয় রামায়ণ সরল গদ্যে লিখিত। পুট্টাপ্পা কুবেম্পু নামে খ্যাত। কুবেম্পু দীর্ঘ নয় বৎসর ধরিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'শ্রীরামায়ণদর্শনম্' রচনা করেন। তিনি মন্থরা, ঊর্মিলা, শবরী ও রাবণের চরিত্রে নবজীবন যোজনা করেন। প্রত্যেকটি চরিত্রই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা অঙ্কিত। কানাড়া সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকৃতি হইতেছে এই গ্রন্থটি। বর্তমানে মহীশূর সরকার কুবেম্পুকে রাষ্ট্রীয় কবিরূপে সম্মানিত করিয়াছেন।

টি. এস. শর্মা রাও-এর 'বচন রামায়ণ' সরল গদ্যে লিখিত। যাভো-টোরের সুর্বা রাও শর্মার 'শ্রীমদ্‌রামায়ণ অন্তরাথ' একটি দর্শনমূলক গ্রন্থ।

আর্যশাস্ত্রীর রামায়ণ নাটক সম্পূর্ণরামায়ণের উপর লিখিত নাটক। মহীশূরের গ্রামে গ্রামে রামকাহিনী মঞ্চস্থ করা হয়। গ্রামে রামায়ণ গানও গীত হইয়া থাকে।

গুজরাটী সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

গুজরাটী সাহিত্যে রামায়ণের অপরিসীম প্রভাব রহিয়াছে। রাজারামের পুত্র আসাইতই (১৩৭১) প্রথম গুজরাটী সাহিত্যকার যিনি রামায়ণ অবলম্বন করিয়া কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি 'রামলীলা' নামক সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেন। রামায়ণকে উপজীব্য করিয়া অন্যান্য যে সকল কবি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ভালন (১৪২৬-১৫০০), ভীম (১৪২৮), মন্ত্রী কর্মন্ (১৪৭০) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

গুজরাটী প্রাচীন ও অর্বাচীন উভয়পন্থী কবিই রামায়ণকে উপজীব্য করিয়া তাঁহাদের কাব্য রচনা করেন। গুজরাটী সাহিত্যে রামায়ণের আংশিক ও সম্পূর্ণ দুইরকম অনুবাদই দেখিতে পাওয়া যায়। বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে অক্ষরক্রমানুসারে প্রাচীন কবি ও তাঁহাদের সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে 'প্রাচীন কবিও আনে তেমনি কীর্তিও' নামক গ্রন্থ বাহির করেন। তাহাতে দেখা যায় ১৩৭০-১৮৫২ পর্যন্ত কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছেন আসাইত ও নবীনতম দয়াবান্ ও গিরধর। ইঁহার মধ্যে ৫২ জন কবি রামায়ণ অবলম্বন করিয়া সাহিত্য রচনা করেন।

'বরোদা পুস্তকালয় অফিস' ৮০০০ সাহিত্য কর্মের এক তালিকা প্রকাশিত করেন ও তাহাতে দেখিতে পাই রামায়ণ অবলম্বন করিয়া কাব্যরচয়িতাদের সংখ্যা হইতেছে ৫৫। সুতরাং দেখা যাইতেছে ১৩৭০ হইতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১০৫ হইতে ১১০ জন কবির সাহিত্যকর্ম রামায়ণের সহিত কোন না কোন ভাবে জড়িত।

বাল্মীকি-রামায়ণকে কেন্দ্র করিয়া সবশুদ্ধ ১৩৯টি সাহিত্যকর্ম রচিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ৪২টি হইতেছে বাল্মীকি রামায়ণের সম্পূর্ণ অনুবাদ। রামায়ণ কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া সর্বতোভাবে স্বাধীন রচনাও হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৭টি হইতেছে কাণ্ডগুলির উপর সংক্ষিপ্ত রচনা। আবার বালকাণ্ডই গুজরাটী কবিদের বেশী অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। রামচরিতমানসের ৫টি অনুবাদ রহিয়াছে। অধ্যাত্মরামায়ণের অনুবাদ রহিয়াছে একটি। যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণের ৪টি অনুবাদ রহিয়াছে। জৈন রামায়ণ পউমচরিতের একটি অনুবাদ রহিয়াছে। বাকী ৭৯টির মধ্যে

৫৪টি রাম সীতার জীবনের কাহিনী অবলম্বন করিয়া লিখিত। হনুমান্, অঙ্গদ, মন্দোদরী, বিভীষণ, লব ও কুশের চরিত্রমাহাত্ম্য বা স্তুতিও রচিত হইয়াছে।

একজন আধুনিক কবি ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণের যুদ্ধ অবলম্বন করিয়াও কাব্য রচনা করিয়াছেন। অপর একজন কবির কাব্যের প্রধান চরিত্র হইতেছে ঊর্মিলা।

ইহা ছাড়া পাদ, ডালা, ডোলা, ডুলা প্রভৃতি সঙ্গীত রচনা হইয়াছে রামকাহিনী অবলম্বন করিয়া।

তামিল সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

বহু যুগ ধরিয়া রামায়ণ তামিলবাসীকে প্রভাবিত করিয়াছে। অবশ্য প্রাচীন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যে রামায়ণ সম্বন্ধীয় তেমন উল্লেখযোগ্য কাব্য-গ্রন্থ রচিত হয় নাই। ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দী পর্যন্ত তামিল-সাহিত্যে সঙ্গম যুগ। এই যুগে কৃষ্ণের জীবন অবলম্বন করিয়া বহু দার্শনিক কবিতা রচিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রামকে উপজীব্য করিয়াও বহু কবিতা রচিত হইয়াছে। তামিল সাহিত্যে প্রথম রামায়ণনির্ভর সাহিত্যকৃতি হইল কম্বন-রামায়ণ। কম্বন রচিত রামায়ণ-বাল্মীকি রামায়ণ অনুসারী নহে। ইহাতে কম্বনের সৃজনশীলতার প্রকাশ অতি পরিস্ফুট। রামচরিত-মানসের মত ইহাও একটি মহৎ কাব্যগ্রন্থ।

কম্বন রামসীতাকে দেবতারূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। কম্বনের সরযূ-নদী, কোশল বা অযোধ্যা নগরীর বর্ণনায় স্থানীয় চরিত্রের ছাপই বেশী। তুলসীরামায়ণের ন্যায় কম্বনও রামসীতার পূর্বরাগের বর্ণনা করিয়াছেন। বিষয়বর্ণনাতে কম্বনের রচনার বৈচিত্র্য দেখা যায়। তিনি তাঁহার সীতাকে রাবণদ্বারা স্পৃষ্ট হইতে দেন নাই। রাবণ সীতাকে তাঁহার বাসস্থান শুদ্ধ হরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কারণ তিনি উর্বশীদ্বারা শাপগ্রস্ত ছিলেন যে কোন নারীকে স্পর্শ করিলে তাঁহার মস্তক খণ্ডিত হইয়া যাইবে।

তামিল সাহিত্যের অন্যান্য সাহিত্যকৃতির মধ্যে 'রামায়ণ বেনব', রামস্বামী আইয়ারের 'রামস্বামীয়ম্', অরুণাচল কবির 'রামনাটম্', মুথুসামি কবির 'রামনাটকম্', তরঙ্গসামি রেড্ডিয়ায়ের 'তিরপুগজ', রামর থোথিরাম', রামায়ণ বিরুথম্, বিষ্ণুপদের 'রামায়ণ-চূড়ামণি,' সেকরার 'রামদন্তম', রামায়ণ করুপ্পোরল, বিভীষিণাউবর কীথাইগল, রামায়ণ কুম্মি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে অরুণাচল কবির 'রামায়ণনাটকম্'

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহা সঙ্গীতবহুল, নাটকীয়তাপূর্ণ এবং খুবই জনপ্রিয়।

বর্তমান যুগে পণ্ডিত নাতেস শাস্ত্রী ও কীর্তনাচার্য সি. আর. শ্রীনিবাস আইয়েঙ্গার বাল্মীকি রামায়ণ গদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। পণ্ডিত কনকরাজ আইয়ার ইল্লানকাইপরনি, রামায়ণ ত্রিবেণী, কম্বন তামিল বাল্মীকীয়ম্, কাম্বরুম্ প্রভৃতি লিখিয়াছেন। ভি. এস. বেঙ্কটরাঘবরিয়ার তামিল ভাষায় রঘুবংশের পূর্ণ অনুবাদ করিয়াছেন।

নবাব রাজমাণিকম্ 'সম্পূর্ণরামায়ণ' নাটক মঞ্চস্থ করিয়াছেন। তাহা খুবই জনপ্রিয়। তামিলনাদের হরিকথা সম্প্রদায়ও নানাভাবে সঙ্গীত, নাটক, হাস্যরস, দর্শন ও ধর্মের মাধ্যমে গৃহে গৃহে রামায়ণ কাহিনী পরিবেশন করিয়া থাকেন।

তেলুগু সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

তেলুগু সাহিত্যের উপর রামায়ণের অসামান্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতেই তেলুগু ভাষায় প্রথম বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ হয় এবং ইহার পরবর্তী শতাব্দীগুলির সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। রামভক্তিই তেলুগু কবিগণকে বাল্মীকি-রামাযণের অনুবাদ করিতে প্রেরণা দান করিয়াছে। রামায়ণের অসংখ্য অনুবাদই প্রমাণ করে যে অন্ধ্রকবিদের নিকট বাল্মীকি প্রেরণা ও বিস্ময়ের উৎস। প্রাচীনকালে ছায়ানাটক অন্ধ্রপ্রদেশে খুব জনপ্রিয় ছিল। এই নাটকে মঞ্চের অন্তরাল হইতে রামায়ণ হইতে গীত গাওয়া হইত।

বুদ্ধ রেড্ডি (১১২০—১১৪০) দ্বিপদ ছন্দে 'রঘুনাথ রামায়ণ' রচনা করেন। তিনি প্রথম ছয়টি কাণ্ড অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র কাচ ও বিট্‌ঠল উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহার পরই টিক্কানা তাঁহার 'নির্বচনোত্তর রামায়ণ' রচনা করেন। তিনি কেবলমাত্র উত্তর-কাণ্ডেব অনুবাদ করিয়াছেন। হুলিক্কি ভাস্কর, আইয়ালার্য, মল্লিকার্জুন ভট্ট এবং কুমার রুদ্রদেব এই চারিজন মিলিয়া 'ভাস্কর রামায়ণ' রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে হুলিক্কি ভাস্করের নিজস্ব রচনা হইতেছে অরণ্যকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ডের কতকাংশ, কিস্কিন্ধ্যা ও সুন্দর কাণ্ডের রচয়িতা হইতেছেন তাঁহার পুত্র মল্লিকার্জুন ভট্ট, ভাস্করের শিষ্য কুমার রুদ্রদেব অযোধ্যাকাণ্ডের কতকাংশ রচনা করেন ও তাঁহার শিষ্য আইয়ালার্য বাকী অংশ সমাপ্ত করেন।

১৩৩০ খৃষ্টাব্দে এরাপ্রেগ্গেড়া তাঁহার রামায়ণ রচনা করেন। এরাপ্রেগ্গেড়া রামায়ণ বাল্মীকি-রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ।

তিরুপতির বিখ্যাত গায়ক অন্নামাচার্য (১৪০৮-১৫০৩) দ্বিপদ ছন্দে তেলুগু রামায়ণ রচনা করেন। তাঁহার পৌত্র তালাক চিন্নান্না রচিত জীবনী 'অন্নামাচার্যচরিতমু' নামক গ্রন্থে এই রামায়ণের কথা জানিতে পারি। এই রামায়ণের অধিকাংশ হারাইয়া গিয়াছে। কিছুটা অংশ রামকথা নামে তাঞ্জোরের সরস্বতী পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের আটজন সভাকবির অন্যতম আইয়ালরাজু রামভদ্রকবি প্রবন্ধরীতিতে 'রামাভ্যুদয়মু' রচনা করেন। তাঁহার প্রথমদিকের রচনা 'সকলকথাসারসংগ্রহ' গ্রন্থেও সুন্দরভাবে রামকাহিনী লিখিয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মহিলাকবি মোল্লা সুন্দরও সাবলীল রীতিতে তাঁহার রামায়ণ রচনা করেন। তিনি কুম্ভকারের কন্যা ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র তিনটি অধ্যায়ে যুদ্ধকাণ্ড রচনা করেন ও অন্যান্য কাণ্ডগুলি একটি করিয়া আশ্বাসে লেখেন। করবী সত্যনারায়ণ অথবা ভিমান্না রচিত রামায়ণ ও চিত্রকবি অনন্তকবি লিখিত দুইটি রামায়ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঞ্জোরের অধিপতি রঘুনাথ নায়ক (১৬১৪-১৬৩৩) 'রঘুনাথচরিতমু' রচনা করেন। তাঁহার রচিত সম্পূর্ণ রামায়ণটি পাওয়া যায় না। তিনটি কাণ্ড ও বালকাণ্ডের কিছু অংশ পাওয়া যায়। তাঁহার এই রচনাটি তাঁহারই সভাকবি মধুরবাণী সংস্কৃতে অনুবাদ করেন।

রাজকবি কট্ট বরদারাজু (১৬৫০) দ্বিপদ ছন্দে 'কট্ট বরদারাজু' রামায়ণ রচনা করেন। তিনি তেলুগু সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত কবি। তাঁহার রচনাটি বাল্মীকি-রামায়ণের বিশ্বস্ত অনুবাদ বলা যাইতে পারে। কূচিমাঞ্চী তিম্মকবি (১৮০০ শেষার্ধ) বিশুদ্ধ তেলুগু ভাষায় 'অচ্চতেনুনু রামায়ণমু' রচনা করেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত শব্দ পরিহার করেন। এমন কি দশরথ ও সুগ্রীবের মত বিশেষ্যপদও তেলুগু শব্দে পরিণত করেন।

কণকন্তি পাপরাজু উত্তরকাণ্ড অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধরীতিতে 'উত্তর রামায়ণমু' রচনা করেন। এই রচনাটিতে করুণরসের আধিক্য দেখা যায়। বিশেষ করিয়া সীতানির্বাসনের বর্ণনায় করুণরস খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। এই রামায়ণটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। ইহা পুরাণ নামেই খ্যাতি-লাভ করিয়াছে। তাঞ্জোরের অধিপতি ভোগলএকোজি (১৭৩৫-১৭৩৬) ও তেলেঙ্গা কবি ছেড রাজহর রেড্ডি (১৭৮০) দুইজনেই দ্বিপদ ছন্দে রামায়ণ রচনা করেন।

ইহা ছাড়া রাঘবপাণ্ডবীয়মু ও রাঘবযাদবপাণ্ডবীয়মু-তে মহাভারতের সহিত রামায়ণের গল্পও পরিবেশিত হইয়াছে।

খুব কম তেলুগু কবিই সম্পূর্ণরামায়ণ অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছেন। বেশী সংখ্যক কবির রচনার বিষয়বস্তু হইতেছে যুদ্ধকাণ্ড অথবা উত্তরকাণ্ড।

গোপীনাথ রামায়ণ, আন্ধ্র বাল্মীকি-রামায়ণ, ইয়াথা বাল্মীকি মণিকোড়া রামায়ণ ও সরস্বতী রামায়ণ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক তেলুগু কবি বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ 'রামায়ণ কল্পবৃক্ষমু' রচনা করেন।

নেপালী সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

নেপাল ভারতবর্ষের অন্তর্গত না হইলেও নেপালের সহিত ভারতের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। দার্জিলিং প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে নেপালী ভাষাভাষী লোক প্রচুর পরিমাণে থাকায় নেপালী ভাষাও অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত ভাষাগুলির অন্যতম ভাষা হইতে চলিয়াছে। সুতরাং নেপালীও ভারতীয় ভাষাগুলির অন্যতম ভাষা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। নিকটবর্তী এই হিন্দু প্রতিবেশী রাজ্যটির ধর্মীয় রীতিনীতির সহিত ভারতের ধর্মীয় রীতিনীতির বহু সাদৃশ্য বর্তমান। হিন্দুধর্মাবলম্বী হওয়ায় স্বভাবতই হিন্দুসভ্যতার মূল ভূখণ্ড ভারতের ধর্মের প্রভাব নেপাল-বাসীদের প্রভাবিত করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নেপালী সাহিত্যেও ইহার অপরিসীম প্রভাব পড়িয়াছে।

অধ্যাত্মরামায়ণের অনুবাদ নেপালী ভাষায় বহুপূর্বেই ছিল। তুলসী-দাসের রামচরিতমানস নেপালী জনসাধারণের নিকট অতি প্রিয়। নেপালী ভাষার আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি হইতেছেন কবি ভানুভক্ত। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে ভানুভক্তের ১৬১ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। ভানুভক্তের (১৮১২-১৮) রামায়ণ নেপালী ভাষায় অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অধ্যাত্মরামায়ণ অবলম্বন করিয়া তিনি তাঁহার রামায়ণ রচনা করেন। তুলসী রামায়ণের প্রভাবও নেপালে যথেষ্ট রহিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে রঘুনাথ পোখর‍্যালও অধ্যাত্মরামায়ণের অনুবাদ করিয়াছেন। উত্তর কাণ্ডে তিনি কিছু মৌলিকতার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। বাণীবিলাস পাণ্ডে (বিংশ শতাব্দী) রচিত চিত্রকূটোপাখ্যানের উপর রামচরিতমানসের সুস্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। নেপালী কবি লেখনাথ রচিত 'মেরো রামে' কবির ভক্তির ভাবনা ও ব্যক্তিত্ব

নবরূপে প্রকাশিত। তুলসীপ্রসাদ দুংগ্যালের 'সংগীত রামায়ণ' আধুনিক রচনা। সুব্বা খড়্গপ্রসাদ শ্রেষ্ঠ ও গণেশমান 'রাধেশ্যাম রামায়ণ' অবলম্বন করিয়া 'রাধেশ্যাম রামায়ণ' রচনা করেন। খড়্গপ্রসাদের রামায়ণ যথার্থ নেপালী অনুবাদ। গণেশমানের রামায়ণে ভানুভক্তের প্রভাব রহিয়াছে। ইহা ছাড়া পদ্মপ্রসাদ দুংগ্যালের রামায়ণ সপ্তরত্ন ও তুলসীদাসের রামচরিত-মানস ও সোমনাথ শর্মার আদর্শ রাঘব, উদ্দীপ সিংহ থাপার কৈকেয়ীর বরপ্রাপ্তি, সুব্বা ঋষিভক্তোপাধ্যায়ের রামকীর্তি নেপালীভাষায় রামায়ণের উপর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম।

পাঞ্জাবী সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

রামায়ণ ও রামসীতার জীবনে পাঞ্জাব এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির হইতে পশ্চিমে ৬ মাইল দূরেই ছিল মহাকবি বাল্মীকির আশ্রম, যাহা বর্তমানে রামতীর্থ নামে পরিচিত। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন শিখগুরু রামদাস (১৫৩৪-১৫৮১)। এখানেই লবকুশের জন্ম হইয়াছিল ও রামায়ণ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এখানেই সেই পিতাপুত্রের বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

পাঞ্জাবে এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহাদের বাল্মীকি বলা হয়। তাঁহারা নিজেদের বাল্মীকির বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। গুরু গোবিন্দ সিং-এর মতে গুরু রামদাস সোধী হইতেছেন রামপুত্র কুশেরই বংশধর। গুরু গোবিন্দ সিং তাঁহার বিচিত্রা নাটকে বলিয়াছেন যে কুশ কশুর নামে নগরের প্রতিষ্ঠাতা ও লব লবপুর নামক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লবপুরই বর্তমানে লাহোর নামে পরিচিত হইয়াছে। লবপুর বাল্মীকির আশ্রম হইতে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। গুরু নানক রাই ছিলেন জাতিতে ক্ষত্রী, তিনি লবের বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে শিখদের দুই গুরুর মধ্যেই রামসীতার রক্ত প্রবাহিত। সেজন্য হয়তো ১৫৩৮ সালে নানকের মৃত্যুর পর তাঁহাকে রাজর্ষি জনকের অবতার বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল।

গুরু গোবিন্দ সিং ৮৬৪টি শ্লোকে সম্পূর্ণ রামায়ণ-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ৩০টি বিভিন্ন ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

রামায়ণে উল্লিখিত কেকয় প্রদেশও পাঞ্জাবেই অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এখনও রাওয়ালপিণ্ডির নিকট রামকুণ্ড, সীতাকুণ্ড ও লক্ষ্মণকুণ্ড নামে তিনটি অনিরাম প্রস্রবণ আছে।

পাঞ্জাবী সাহিত্যে রামকথার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় গুরু নানক (১৪৬৮-১৫৩৮) রচিত কাব্যে। এখানে তিনি রামকে তিনটি বিভিন্ন-রূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রথমে তিনি রামকে ভগবানের অবতাররূপে স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি রামকে জরামৃত্যুহীন বিরাটরূপী ভগবানের ইচ্ছার মন্ত্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ তিনি সীতাকে সচ্চ (সত্য) খণ্ডের নীচে অবস্থিত কর্মখণ্ডরূপ স্বর্গের অধিবাসীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। নানকের সমসাময়িক লাহোরের শাহ্ হুসেন, জলন্ধরের বাজিদ ও ভাওয়ালপুরের গোলাম ফরিদ প্রভৃতি মুসলমান কবিগণও রামকাহিনী অবলম্বনে কাব্যরচনায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন।

ভাই গুরুদাস (১৫৫১-১৬২৯) রামকাহিনীর উপর কতকগুলি পদ্য রচনা করেন। তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন হিন্দাই রাম। তিনি 'হনুমান্ নাটক' রচনা করেন। তাঁহাদেরই সমসাময়িক দিল্লীবাসী কাপুরচাঁদ তাঁহার রামায়ণের নাম রাখেন 'লেহন্দ্র নাটক'। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে গুলাব সিং পাঞ্জাবী হিন্দাবীতে বাল্মীকি-রামায়ণের সমতুল বিশাল ও মহৎ কাব্য অধ্যাত্মরামায়ণ রচনা করেন। গুলাব সিং-এর শিষ্য সন্তোষ সিং (১৭৮৮-১৮৪৩) ব্রজ ও পাঞ্জাবী মিশ্রবুলিতে গদ্যে বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ করেন।

কালিদাসের (১৮৬৫-১৯৪৪) পাঞ্জাবী রামায়ণ জনসাধারণের মধ্যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গুজরানওয়ালার অধিবাসী এই কালিদাসের নাম ছিল মান সিং। কালিদাসের রাম সীতা ঠিক পাঞ্জাবীদের মত কথা বলেন, কাজ করেন ও চিন্তা করেন। কালিদাস তাঁহার রামায়ণগ্রন্থে পূর্বী, ব্রজ ও পাঞ্জাবী এই তিনটি ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে অমর সিং 'অমররামায়ণ' রচনা করেন। তিনি বাল্মীকি-রামায়ণ, তুলসী-রামায়ণ ও অধ্যাত্মরামায়ণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার রামায়ণ রচনা করেন। কবি সাউন্ধ্যা ১২ মাসের বর্ণনাপ্রসঙ্গে রামকাহিনী বর্ণনা করেন। কবি দাস পাঞ্জাবী গীতিকাব্য রচনা করেন। রামভক্ত করম সিং ও বুধ সিং গদ্যে বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ করেন। তুলসীরামায়ণের শত শত অনুবাদ পাঞ্জাবী ভাষায় রহিয়াছে। যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণেরও প্রচুর অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ দয়াল (১৯০৪), কৃষ্ণচাঁদ (১৯১৩) বাতালিয়া রাম, হরনাম সিং, দৌলত রাম, যশোবন্ত সিং, গোপাল সিং, চক্রধারী প্রত্যেকে রামকাহিনী রচনা করেন। ধানীরাম চত্রিক সীতা-বিলাপ উপজীব্য করিয়া গীতিকবিতা রচনা করেন।

বাংলা সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

বহু যুগ ধরিয়া রামায়ণ বাংলার জনজীবনে অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সতী সাধ্বী সীতা ও ভ্রাতৃভক্ত দেবর লক্ষ্মণ বাংলাসমাজের আদর্শরূপে পরিগণিত। বাংলাভাষায় রামায়ণের প্রথম অনুবাদক হইতেছেন পঞ্চদশ শতাব্দীর শ্রীকৃত্তিবাস ওঝা। কৃত্তিবাসের স্বরচিত আত্মবিবরণী হইতে জানা যায় ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৬ই মাঘ রবিবার পঞ্চমী তিথিতে শান্তিপুরের ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১২ বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিবার জন্য বড়গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বিদ্যা-শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া রাজপণ্ডিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি পঞ্চশ্লোক লিখিয়া গৌড়েশ্বর চণ্ডীচরণ-পরায়ণ-দনজমর্দন দেবের (রাজা কংস) নিকট গমন করেন। তাঁহার রচিত শ্লোক শুনিয়া প্রীত গৌড়েশ্বর তাহাকে রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ দিলেন। বাঙ্গালীর জীবনগঠনে যাঁহাদের দিব্য অবদান অবিস্মরণীয় তাঁহাদের মধ্যে কৃত্তিবাস ওঝা অন্যতম। উড়িষ্যা হইতে কামরূপ এবং রাজমহল হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রচারিত হইয়াছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণে স্থানীয় প্রভাব যথেষ্ট এবং কবি ইহাতে বহু নূতন ঘটনা সংযোগ করেন। তরণীসেনের পতন, রাবণের রাজসভায় অঙ্গদের দৌত্যকার্য, অহিরাবণ ও মহীরাবণের কাহিনী কবির অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তিনি বাংলাদেশে বাল্মীকি অপেক্ষা কম শ্রদ্ধালাভ করেন না। পণ্ডিত-গণের মতে কৃত্তিবাসের রামায়ণকে অনুবাদ অপেক্ষা সৃষ্টি বলাই সঙ্গত। পাঁচ শতাধিক বৎসর ধরিয়া বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গরূপে গণ্য হইয়াছে এই কৃত্তিবাসী রামায়ণ। বাংলা দেশের কথক সম্প্রদায় মন্দিরে, উৎসবে, মেলায় এমন কি বাড়ীতে বাড়ীতে রামায়ণ গান করিয়া বেড়ান।

কবিচন্দ্র ও অদ্ভুতাচার্য প্রভৃতি কবিগণ কৃত্তিবাসী রামায়ণকে অনুসরণ করিয়াই তাঁহাদের রামকাহিনী রচনা করিয়াছেন। পাঁচালীকাব্যে রামায়ণ অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে রামায়ণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রহিয়াছে। বনে নির্বাসিত রামের জন্য অযোধ্যাবাসীর শোকের সঙ্গে জনপ্রিয় মাথুরের সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। কাশীরাম দাসের মহাভারতের বনপর্ব রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডেরই নামান্তর। উত্তরবঙ্গের মধ্যযুগীয় মহিলা কবি চন্দ্রাবতী সীতার দুঃখ অবলম্বন করিয়া গীতিকাব্য রচনা করেন।

মঙ্গলকাব্যের দক্ষিণা রায় ও পীর গাজি খানের যুদ্ধ রাম রাবণের

যজ্ঞের অনুকরণ ছাড়া কিছুই নয়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরার অগ্নিপরীক্ষা সীতার অগ্নিপরীক্ষার অনুকরণেই লিখিত। এমন কি কালকেতুর সঙ্গেও রামের সাদৃশ্য বিদ্যমান। দ্বিজ রঘুনাথ দাসের অশ্বমেধ পাঁচালীতে রামের অশ্বমেধের ছায়া রহিয়াছে। দ্বিজ রঘুনাথ দাসের পাঁচালীর অশ্বমেধে বভ্রুবাহন কর্তৃক অর্জুনের পরাজয় আমাদের লবকুশ কর্তৃক রামের পরাভবের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। বাংলার রূপকথার গল্পে, গ্রাম্য গীতিতে, পরীর গল্পে রামায়ণের প্রভাব লক্ষণীয়। রূপকথার গল্পে আমরা সর্বদা লক্ষ্য করি রাজপুত্র রাক্ষসের দেশে গিয়া বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করেন। ইহা রামকর্তৃক সীতা উদ্ধারের অনুকরণে লিখিত। সুতরাং মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্য প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ-ভাবে রামায়ণের নিকট ঋণী। যাত্রাসাহিত্যেও রামায়ণ অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শিশুদের প্রিয় পুতুল নাচেও সর্বদা রামায়ণ হইতে কাহিনী প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকরাও রামায়ণ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভৃতি আরও অনেকে রামায়ণ অবলম্বন করিয়া সাহিত্য রচনা করিয়া যশ লাভ করিয়াছেন।

বিংশ শতাব্দীতে দীনেশচন্দ্র সেন, রাজশেখর বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার নিয়োগী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতি বহু বরেণ্য সাহিত্যিক রামায়ণ উপজীব্য করিয়া সাহিত্য রচনা করিয়াছেন।

মারাঠী সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

মারাঠী সাহিত্যের উপর বাল্মীকি-রামায়ণ অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মারাঠী জীবন ও সাহিত্যের উপর অধ্যাত্ম ও যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণের প্রভাবও অসামান্য। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত সাহিত্যের উপর বাল্মীকি-রামায়ণের প্রভাব প্রভূত অনুভূত হয়। মারাঠী কবিগণ রামায়ণের অতি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অসামান্য কাব্য রচনা করিয়াছেন। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, কৌশল্যার সন্তান কামনা, তাড়কাবধ, হরধনুর্ভঙ্গ প্রভৃতি ছোট ছোট কাহিনী অবলম্বন করিয়া এক একজন কবি তাঁহাদের কাব্য রচনা করিয়াছেন। আবার বালকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড ও যুদ্ধ-কাণ্ড এই তিনটি কাণ্ডই বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। রাম কর্তৃক

সীতাপরিত্যাগ, রাজকর্তব্য সম্বন্ধে রামের অন্তর্দ্বন্দ্ব, স্বামিরূপে রামের কর্তব্য, কুশ ও লবের সঙ্গে যুদ্ধ, দুই পুত্রসহ সীতার সঙ্গে রামের সাক্ষাৎকার প্রভৃতি ঘটনা মারাঠী কবিদের চিত্তভূমিকে বেশী আলোড়িত করিয়াছে।

দর্শনকে ভিত্তি করিয়া একনাথ সম্পূর্ণ-রামায়ণ রচনা করেন, মুক্তেশ্বর সংক্ষিপ্ত-রামায়ণ ও মাধব ও মোরপন্ত পূর্ণ-রামায়ণ রচনা করেন। কানহো ত্রিমল (১৩৬৮-১৪১৮ খৃঃ) কেবলমাত্র পাতালকাণ্ডের উপর তাঁহার রামায়ণ রচনা করেন। কৃষ্ণদাস মুদ্‌গল বাল ও যুদ্ধকাণ্ডের উপর ভিত্তি করিয়াই রামকাহিনী রচনা করিয়াছেন। একনাথ তাঁহার 'ভাবার্থরামায়ণে' দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রামায়ণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একনাথের পৌত্র মাধবস্বামী (১৭০৩) রামায়ণের বর্ণনাত্মক ও দার্শনিক এই দুইটি দিক্‌ অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করেন। বালকাণ্ডের দার্শনিক দিক্‌ নিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন নিরঞ্জন মাধব (১৮০০)। বেনাবাই-এর রচনা কেবলমাত্র রামায়ণের পাঁচটি কাণ্ড লইয়া। শ্রীধর (১৮০০) রামের জীবন হইতে কতকগুলি ঘটনা নির্বাচন করিয়া 'রামবিজয়' রচনা করেন। বিঠ রেণুকাণ্ডন, নাগেশ, বিঠল, বেনাবাই প্রভৃতি নয়জন কবি প্রত্যেকে 'সীতাস্বয়ম্বর' রচনা করেন। মোরোপন্ত ও বামন লবকুশের বীর্যের কাহিনী অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের কাব্য রচনা করেন। রঙ্গনাথ নিগাটিকার কৌশল্যার আকাঙ্ক্ষা ও মহিষী জীবনের গোপন কথাকে উপজীব্য করিয়া তাঁহার সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটাইয়াছেন। অমৃতরাও ওহে পেশোয়া সাম্রাজ্যের শেষদিকে 'শতমুখরাবণবধ' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রখ্যাত নাট্যকার কিরলোসকরের 'রামরাজ্য-বিয়োগ' একটি উল্লেখ্য গ্রন্থ। কিরলোসকরের নাটক রচনার পূর্বে 'রামলীলা', 'দশাবতার' প্রভৃতি নাটক রচিত হয়। ভবভূতির উত্তররামচরিতের কাহিনী অবলম্বন করিয়া সুমন্ত্র তাঁহার কাব্য রচনা করেন। শূর্পণখার কাহিনী নির্ভর করিয়া রামকাব্য রচনা করিয়াছেন গিরীশ নামক কবি। সি. ভি. বৈদ্য রামের জীবনকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। চন্দরকার মহাভারতের ন্যায় রামায়ণকে পুনর্গঠন করিয়াছেন।

প্রাচীন মারাঠী কবি মুকুন্দরায়, ধনেশ্বর প্রভৃতি কবি রামায়ণের কাহিনী লইয়া তাঁহাদের কাব্য রচনা না করিলেও প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণের চরিত্র ও তাহাদের মহৎকর্মের উল্লেখ করিয়াছেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ উপজীব্য করিয়া অন্ততঃ চারিজন কবি তাঁহাদের কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা হইতেছেন রঙ্গনাথ, মোগরেকার, বামন পণ্ডিত ও হরিরায় সিন্ধে।

মোরোপন্ত (১৭২৯-১৭৯৪) ১০৮টি বিভিন্ন রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে ৯০টি পাওয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত মহাপুরুষ রামদাস রামকে একমাত্র গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাঁহার মতে একমাত্র রামের আদর্শ অনুসরণ করিয়া জনগণ তাহাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অজ্ঞান হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। এজন্য রামরাজ্য স্থাপনের নিমিত্ত তিনি রামকথা কীর্তন করিয়াছেন। এজন্যই তিনি সুন্দর ও যুদ্ধকাণ্ডের উপর বেশী জোর দিয়াছেন। রামদাস শিষ্য বেনাবাই রাম ও গুহকের কথোপকথন উপজীব্য করিয়া কাব্য রচনা করেন।

মালয়ালম্ সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

মালয়ালম্ সাহিত্যের প্রতিটি সাহিত্য বিভাগকে রামায়ণ সমভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। রামায়ণ অবলম্বন করিয়া নাটক, টীকা, প্রবন্ধ, লোকসঙ্গীত, গীতিকবিতা সকল কিছুই রচিত হইয়াছে।

তামিল প্রভাবের যুগে 'কম্বনরামায়ণ'[১] কেরলে খুবই জনপ্রিয় ছিল। কম্বন নিজেও কেরল ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কেরল ভ্রমণ রামায়ণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার পর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ত্রিবাঙ্কুরের রাজা চীরাম কবি রচিত 'রামচরিথম্' বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। 'রামচরিথম্' কেবলমাত্র যুদ্ধকাণ্ড লইয়াই রচিত। এখানে উল্লেখ্য যে, অভিনন্দের সংস্কৃত রামায়ণ 'রামচরিত' গ্রন্থের ছন্দগুলি তামিল রামায়ণ অনুসরণ করিয়া লেখা। কবি কিষ্কিন্ধাকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ্যাভিষেকেই তাঁহার কাব্য শেষ করিয়াছেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে ত্রিবাঙ্কুরের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম রাম পাণিক্কর কন্নশরামায়ণ রচনা করেন। রাম পাণিক্করের রামায়ণ পরবর্তী বহু কবিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তাঁহার রামায়ণ সমগ্র উত্তরকাণ্ড অবলম্বন করিয়া রচিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তামিল ও মালয়ালমের মিশ্র ভাষায় আয্যাপ্পিল্লৈ আসান 'রামকথাপাট্টু' রচনা করেন। চম্পূ সাহিত্যে পুনম্ নম্পূতিরির 'চম্পূ রামায়ণ' মালয়ালম্ সাহিত্যে এক

(১) দ্বাদশ শতাব্দীতে তামিল কবি কম্বন রামায়ণকাহিনী অবলম্বন করিয়া রামায়ণ রচনা করেন। তাঁহার রচিত রামায়ণ কম্বনরামায়ণ নামে খ্যাত। ইহা দক্ষিণ ভারতের অতি জনপ্রিয় রামকাহিনী ও অনেক প্রাদেশিক ভাষাতে ইহার অনুবাদ হইয়াছে। ইহা তুলসীদাসের রামচরিতমানসের ন্যায় অতি মহৎ কাব্যগ্রন্থ। কম্বন তাঁহার রচিত রামায়ণে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা রাবণোদ্ভব, বিচ্ছিন্নাভিষেকম্, সুগ্রীবসখ্যম্, অঙ্গুলী ইয়ঙ্কম্, উদ্যানপ্রবেশম্ ইত্যাদি ২০টি ভাগে বিভক্ত। ষোড়শ শতাব্দীতে এজুত্থাস্সন অথবা এলুটাচ্চন রচিত বিখ্যাত রামায়ণ-গ্রন্থ কেরলবাসীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। রচনাশৈলী ও সৌন্দর্যে এই রামায়ণ সত্যই অপূর্ব। এই রামায়ণ মূল রামায়ণ পাঠের আনন্দ দেয়। তিনি উত্তরকাণ্ড বাদ দিয়া অপর ছয় কাণ্ড লইয়া তাঁহার রামায়ণ রচনা করেন। এই রামায়ণের প্রভাব জনজীবনে অপরিসীম। প্রতিদিন গৃহে ও মন্দিরে এই রামায়ণ গীত হইত। বন্দীদের শপথবাক্য পাঠ করান হইত এই রামায়ণের শ্লোক দিয়া। প্রতিটি কেরলবাসীর গৃহে এজুত্থাস্সনের রামায়ণ গ্রন্থ থাকিত। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহে রামায়ণ পাঠ অপরিহার্য ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে আমরা পাই কোট্টায়াক্কারা থামপুরন্ রচিত 'রামনাট্টম্'। ইহা শেষ পর্যন্ত কেরলের বিখ্যাত কথাকলি নৃত্যনাট্যে পরিণত হয়। গল্পাংশ গদ্যে লিখিত। কথোপকথনে গীত ও অভিনয়ের উপর খুব জোর দেওয়া হয়। এই রামায়ণের অন্তর্গত রাবণবিজয়ম্, মেঘনাদবিজয়ম্, রাবণবধম্, শ্রীরামাবতারম্, সীতাস্বয়ম্বর ও তাড়কাবধ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কুঞ্চন নামপিয়ারের সীতাস্বয়ম্বরম্, কার্তবীর্যার্জুনীয়ম্ প্রভৃতি কাহিনী রামায়ণ অবলম্বন করিয়াই লিখিত। কুঞ্চন নামপিয়ার তুল্লল সাহিত্যের জনক। তুল্লল সাহিত্য অভিনয়ের জন্য লিখিত। ইহা একজন মাত্র অভিনেতা কর্তৃক অভিনীত হয়। সামাজিক দোষাবলীর উপর অঙ্গুলীনির্দেশই ইহার লক্ষ্য। উত্তর মালাবারের অন্তর্গত কোট্টায়ামের রাজপুত্র কেরল বার্মা 'কেরলবার্মা রামায়ণ' রচনা করেন।

কেরলের সংস্কৃত পণ্ডিতরা সংস্কৃতে রামকাহিনী রচনা করিয়াছেন। আশ্চর্যচূড়ামণির লেখক শক্তিভদ্র একজন নম্পূতিরি ছিলেন। বাসুদেবের 'রামকথা', রামপাণিবাদের রাঘবীয় (মহাকাব্য), সীতারাঘব (নাটক), ইলয় তামপুরাণের রামচরিত, রামপুবাট্টু করিয়ারের রামপঞ্চশতী, রঘূদয়, সীতাহরণম্ প্রভৃতি সংস্কৃতকাব্য উল্লেখযোগ্য। মেপ্পাট্টুর নারায়ণ ভট্টতিরির (১৬০০) 'অহল্যামোক্ষ' ও নিরনাসিক' প্রভৃতি প্রবন্ধও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

আধুনিক রামসাহিত্যের সাক্ষাৎ পাই আজহকথ পদ্মনাভের (১৮৯৪) 'রামচন্দ্রবিলাস' নামক কাহিনীতে। বিংশ শতাব্দীতে ভল্লাথল ছন্দ পরিবর্তন না করিয়া পদ্যে বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ করেন। কুমারন আসান

রচিত 'চিন্তাবিশিষ্টয়া সীতা' কাব্যসৌন্দর্যে অনুপম। গদ্যে রচিত নাটক 'মন্দোদরী' আধুনিক কালে রচিত।

ইহার পর উল্লেখযোগ্য অনুবাদ সাহিত্য প্রতিমানাটকম্, অনর্ঘরাঘবম্, জানকীপরিণয়ম্, প্রসন্নরাঘব প্রভৃতি সংস্কৃত নাটক মালয়ালমে ভাষান্তরিত করা হইয়াছে। তুলসী ও কম্বনরামায়ণ গদ্যে ও পদ্যে অনূদিত হইয়াছে।

চাক্ইয়ার (কথকতা), কুট্টু (একজন নৃত্যাভিনেতা কর্তৃক প্রদর্শিত অভিনয়) প্রভৃতি রামকাহিনী অবলম্বন করিয়া লিখিত। মালয়ালম্ ছায়ানৃত্য (তোলপ্পাবা কুট্টু) চর্ম নির্মিত পুতুল দ্বারা প্রদর্শিত হয়। এই ছায়ানৃত্যের কাহিনীও রামকথা অবলম্বনে লিখিত।

মৈথিলী সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

সীতার জন্মদ্বারা পবিত্রা তথা জনকের পাদস্পর্শে গর্বিতা মিথিলানগরী চিরকালই তাহার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এমন কি মুসলমান আমলেও মিথিলা তাহার মহিমা ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় নাই। বহুকাল ধরিয়া মিথিলায় নানা দার্শনিক চিন্তাধারার উদ্ভব হইয়াছে ও সমভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে নানা বৈষ্ণব, শাক্ত ও শক্তি মতবাদ।

শক্তিরূপিণী সীতার জন্মস্থান বলিয়া এখানে সীতার প্রভাব মনে হয় কার্যকর হইয়াছে। কিন্তু মিথিলাতে রাধাকৃষ্ণের প্রভাব যথেষ্ট। রাধাকৃষ্ণই মিথিলাবাসীর নিকট একমাত্র আদর্শ দম্পতি। আর রামের প্রতি ভক্তি অপেক্ষা সীতার প্রতি প্রীতিই ইহাদের সমধিক। তবে রামায়ণের প্রভাব মিথিলাবাসীর উপর যে একেবারেই নাই তাহা নহে। বিগত শতাব্দীতে কয়েকজন রামভক্ত সাহিত্যিকের সাক্ষাৎ আমরা পাই। রামনবমী উৎসব সমগ্র মিথিলাতেই অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসর বৈশাখের নবম দিনে জানকী নবমী অতি উৎসাহের সঙ্গে মিথিলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষিত সমাজকর্তৃক প্রতিপালিত হয়। বিশেষ করিয়া জনকপুরী, সীতামাড়ী, অহল্যাস্থান ও বারুয়া প্রভৃতি স্থানে অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত এই উৎসব পালিত হয়। সাহেবরমা, শিবদত্ত এবং আরও অনেক সাধুসন্ত রামোপাখ্যান লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। মিথিলাবাসী শিক্ষিত লোকদের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে রামায়ণের মাধ্যমে, বিশেষতঃ রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের মাধ্যমে কবিপ্রতিভা আয়ত্ত করা সম্ভব। মিথিলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক 'মৈথিল কালিদাস' সম্বন্ধে বলা হয় যে

বাল্মীকি-রামায়ণ কণ্ঠস্থ থাকার জন্য তিনি তাঁহার বিখ্যাত কাব্যরচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে এখনও চৈত্রমাসের প্রথম পক্ষকাল রামায়ণ পাঠ অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

মধ্যযুগের মৈথিলীসাহিত্যে কেবলমাত্র শিবদত্তের 'সীতাহরণম্' ছাড়া কোন সাহিত্যকর্ম অনায়াসলব্ধ নয়।

আধুনিক মৈথিলীসাহিত্যের আরম্ভ হইয়াছে চন্দ্র ঝাঁ রচিত রামায়ণের অনুবাদ দিয়া। মৈথিলী সাহিত্যে ইতিপূর্বে বাল্মীকি-রামায়ণের কোন অনুবাদ ছিল না। মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিং চন্দ্র ঝাঁকে বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ করিবার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই রামায়ণের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে মূল রামায়ণের রাগরাগিণী অবিকৃতভাবে বর্তমান। এই রামায়ণ-গ্রন্থ মিথিলাতে খুবই জনপ্রিয় হয়। লালদাস তাঁহার 'রামেশ্বরচরিত' রচনায় এই চন্দ্র ঝাঁর রামায়ণ হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। আধুনিক যুগের একমাত্র মৈথিলী নাটক আনন্দ ঝাঁ রচিত 'সীতাস্বয়ম্বর'। 'রামায়ণশিক্ষা' নামক গ্রন্থে রামায়ণের আদর্শ সুন্দরভাবে চিত্রিত। 'শ্রীধর্মশিক্ষা' গ্রন্থেও রামায়ণ হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি রহিয়াছে।

সিন্ধী সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

যদিও সিন্ধুপ্রদেশ বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত তবুও এই সিন্ধুনদীর তীরেই আর্যজাতির প্রথম বেদমন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল। বনবাসকালে রামসীতা যে সিন্ধুপ্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহার প্রমাণ পাই তাঁহাদের নামাঙ্কিত বহু স্থানের নাম হইতে। করাচির একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের নাম রামঝরক। এখানে রামসীতা লক্ষ্মণের সহিত কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। খোদ করাচির বক্ষেই আমরা দেখিতে পাই রামবাগ ও রাম-মন্দির—বর্তমানে ইহা শিশু উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। সিন্ধুর প্রখ্যাত কবি শাহ্ আবদুল লতিফ্ একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। তিনি একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর নিকট তিন বৎসর অবস্থান করেন ও তাঁহার সঙ্গে অনেক তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। সেই তীর্থগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বহুবার শ্রীরামের নাম উল্লেখ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে সিন্ধী ভাষীদের জন্য আরবী সিন্ধী বর্ণ প্রচলিত হইল। ইহার পর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আমরা দেখি ডি, জে, সিন্ধী কলেজের ছাত্ররা সংস্কৃত রামনাটক মঞ্চস্থ করিয়াছেন। নাট্যকার হইতেছেন লীলারাম ভাটমল লালওয়ানি।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আর্যসমাজের দেবানন্দ 'রামবনবাস' নামক নাটক রচনা করেন। নাটকটি বিশুদ্ধ সিন্ধীভাষায় লিখিত। অতি সরল ভাষায় রচিত এই নাটকটির চরিত্রগুলিও সুন্দরভাবে চিত্রিত। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জৈরামদাস বাসনমল তুলসীরামায়ণের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই সময়ই মাষ্টার হেমেন দাস নামক একজন কবি পদ্যে রামায়ণ রচনা করেন।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে মহারাজা তেজুরাম রোচিরাম শর্মা সংক্ষিপ্ত আকারে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন যাহা খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। সংক্ষিপ্ততা ও সরলতাই ইহার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল। রোচিরাম গঙ্গারাম সাধানি সংক্ষিপ্ত আকারে পদ্যে ও গদ্যে শিশুদের জন্য বাল্মীকি-রামায়ণ রচনা করেন। বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ভগৎ পহিলাজরাই পদ্যে রামায়ণের এক সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন। তিনি কথকনৃত্যের একজন বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা। ভারতবিভাগের প্রাক্‌কালে রচিত বলিয়া বিখ্যাত হওয়ার সুযোগ হয় নাই। অত্যন্ত পরিতাপের কথা এই যে, রামকথার উপর রচিত গ্রন্থগুলির একটিও আজ পাওয়া যায় না।

হিন্দী সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

হিন্দীভাষীদের উপর রামায়ণের অভূতপূর্ব প্রভাব রহিয়াছে। হিন্দীভাষীদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত, এমন কি দৈনন্দিন শিষ্টাচারেও 'রাম' ওতঃপ্রোতোভাবে জড়িত। তাঁহারা 'রাম রাম' বলিয়া স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। 'রামে রাম' বলিয়া দ্রব্যের পরিমাপ করিয়া থাকেন। সাহিত্য ত জীবনেরই দর্পণ। সুতরাং রামায়ণ যে হিন্দীসাহিত্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? হিন্দীভাষীদের মধ্যে অবশ্য তুলসীদাসের রামচরিতমানসের প্রভাবই বেশী। বোধ হয় এমন কোন গৃহ নাই যেখানে রামচরিতমানসের একটি সংস্করণ অলভ্য। রামচরিতমানস অবলম্বন করিয়া হিন্দীভাষায় সংখ্যাতীত পুস্তক রচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রতিটি ভাষায় তুলসীদাসের এই রামায়ণটির অনুবাদ রহিয়াছে।

রামচরিতমানসের ন্যায় বহুজনপঠিত জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ ভারতবর্ষে আর একখানা আছে কিনা সন্দেহ। প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বে লিখিত গ্রন্থখানিকে চির নূতন গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। ইহা অবশ্য প্রচলিত হিন্দীভাষায় লিখিত নহে। আর্যাবর্তের কয়েকপ্রকার কথ্যভাষা যথা :—

অবধী, রোহিলখণ্ডী, পূর্বাঞ্চলের ভোজপুরী, কাশীর কথ্যভাষা, মথুরার ব্রজভাষা, রাজস্থানীভাষা, তৎকালিক কথ্য বাংলাভাষা, মূল সংস্কৃতভাষা ও বহু অপভ্রংশ শব্দ একত্রে যোজনা করিয়া তুলসীদাস তাঁহার 'রামচরিতমানস' রচনা করেন।

কবি তাঁহার কালজয়ী গ্রন্থ রামচরিতমানসে এক প্রাচীনতম আদর্শ-পুরুষের চরিত্রকে এমন কালোপযোগী বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে সর্বশ্রেণীর জনমানসে ইহার স্বাভাবিক আবেদন গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে। আকবর ও তাঁহার মন্ত্রী তোডরমল্ল রামচরিতমানসের অনুরাগী ছিলেন। অদ্বৈতবাদী মধুসূদন সরস্বতী এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

আনন্দকাননে হ্যস্মিন্ জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ।
কবিতা মঞ্জরী যস্য রামভ্রমরভূষিতা ॥

তুলসীরামায়ণে গল্পাংশ খুবই কম। ইহার তত্ত্বাংশের বীজ প্রধানতঃ অধ্যাত্মরামায়ণ হইতে সংগৃহীত হইলেও ইহার পুষ্টিসাধন বহু গ্রন্থ হইতেই করা হইয়াছে। ভারতের যে-অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রভাবে রামায়ণ ও মহাভারত রচিত সে-অধ্যাত্মজ্ঞানের ভিত্তিতে তুলসীরামায়ণও রচিত। তুলসীদাস ছন্দ, রস ও অলঙ্কারের প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার ছন্দের এমনই মাধুর্য যে ইহা গীত হইলে অর্থ না বুঝিয়াও মানুষ ইহার ভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হইবে। রসসৃষ্টি কাব্যের প্রাণ। তুলসীরামায়ণে সকল রসেরই সমন্বয় রহিয়াছে।

হিন্দী সাহিত্যে লভ্য রামায়ণের বিষয়বস্তুকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

প্রথম শ্রেণীর রামবিষয়ক সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা করিলে একটি বিষয় আমাদের নিকট পরিস্ফুট হয় যে, এই সকল সাহিত্যকৃতিতে চরিত্রগুলি সামাজিক ব্যবহারের আদর্শরূপে চিত্রিত। রাম, সীতা, ভরত ও কৌশল্যা সকলেই সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শরূপে গণ্য হইয়াছেন। আবার ভক্তি হইতেছে এই শ্রেণীর কাব্যের মূল সুর। এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে হয় অমর কবি তুলসীদাস রচিত রামচরিতমানসের। তারপরই কেশবদাসের 'রামচন্দ্রিকা' ও সহজ-রামের 'রঘুবংশ দীপিকা'র নাম উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে এই শ্রেণীর সাহিত্যকর্মে রাম একমাত্র পরম দেবতারূপে উপস্থাপিত। ইহাতেও ভক্তি ফল্গুধারার

ন্যায় প্রবাহিত। মহারাজ পৃথ্বীরাজের 'দশরাউত', সুরসাগরের 'নবম স্কন্দ', চন্দের 'রামায়ণ প্রসঙ্গ', বিশ্বনাথ সিংহের 'আনন্দরঘুনন্দন', 'আনন্দরামায়ণ', সেনাপতির 'রামায়ণরসায়ণ' ও আরও অনেক কাব্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

তৃতীয় শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে পড়ে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সকল সাহিত্যকৃতি। ইহাতে সীতার সহিত রামের রসরূপ বিষয়ক প্রসঙ্গই বেশী। এই শ্রেণীর কাব্য রচনা করিয়াছেন ৭০ জন কবি এবং ২০০ কাব্যের নাম আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। এই লেখকরা সকল রসিক সম্প্রদায়ের। রাম ও সীতার লীলাই এই শ্রেণীর কাব্যের মূল বর্ণিত বিষয়। অনেক কাব্যে কবিদের কাব্যপ্রতিভার চরম উৎকর্ষ ঘটিয়াছে। কিন্তু রামচরিতমানসের সামাজিক তাৎপর্য এখানে অনুপস্থিত। ইহাদের মধ্যে অগ্রদাস নাভা দাস, রামচরণ দাস, রসিকবিহারী, বনদাস প্রভৃতি নাম উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে আধুনিক যুগের সাহিত্যকৃতি। ইহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রামের অবতারত্ব অনুপস্থিত। বর্ণনার বিষয়বস্তুতেও কবিদের মৌলিকতা রহিয়াছে। তাঁহারা রামচরিতমানস ও বাল্মীকি-রামায়ণ উপজীব্য করিয়াই তাঁহাদের কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মৈথিলী শরণ গুপ্তের 'সাকেত' ও কবি নিরালার 'রাম কী শক্তিপূজা'। সাকেতের প্রধান বিষয়বস্তু লক্ষ্মণের স্ত্রী ঊর্মিলার মাহাত্ম্য বর্ণনা। কবির মতে সীতা অপেক্ষা ঊর্মিলার আত্মত্যাগ অনেক বেশী কারণ ঊর্মিলা নিজে অযোধ্যায় থাকিয়া স্বামী লক্ষ্মণকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য রামসীতার সেবার জন্য বনে প্রেরণ করিয়াছেন। ঊর্মিলা ও লক্ষণের বিবাহোত্তর জীবনের আনন্দময় বর্ণনাতে কবি তাঁহার স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় দিয়াছেন। সাকেত ও পঞ্চবটীতে পারিবারিক জীবনের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। ঊর্মিলার বিরহ কবি মর্মস্পর্শী ভাষায়ে ব্যক্ত করিয়াছেন। মৈথিলী শরণ গুপ্ত খুব সুচতুরভাবে ঊর্মিলা ও সাকেতকে কেন্দ্র করিয়া সম্পূর্ণ রামায়ণ বর্ণনা করিয়াছেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

যুগ যুগ ধরিয়া ভারতীয় সাহিত্যিকদের অনুপ্রেরণার উৎস এই রামায়ণ-মহাকাব্য। প্রাকৃত ও প্রাদেশিক ভাষাসমূহের উন্নতির পূর্বে ভারতের প্রধান সাহিত্যভাষা ছিল সংস্কৃত। বাল্মীকিরচিত এই রামায়ণ গ্রন্থ উপজীব্য

করিয়া বহুকাল ধরিয়া বহু সংস্কৃত কবি তাঁহাদের কাব্যপ্রতিভার উন্মেষ ঘটাইয়াছেন। সংস্কৃত কথাসাহিত্যের সূচনা হইয়াছে এই বাল্মীকি-রামায়ণে। তাই রামায়ণ আদিকাব্য, আর বাল্মীকি আদিকবি। রামায়ণ অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াই মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি, ভাস প্রভৃতি কবিগণ অমর হইয়া রহিয়াছেন।

রামায়ণকাহিনী অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত ললিত সাহিত্য

রামকাহিনী উপজীব্য করিয়া রচিত সংস্কৃত মহাকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে চতুর্থ শতাব্দীতে মহাকবি কালিদাস বিরচিত 'রঘুবংশ' নামক মহাকাব্যের নাম। ১৯টি সর্গে বিভক্ত কালিদাসের এই শ্রেষ্ঠ কাব্যে দিলীপ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত ২৯ জন নৃপতির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য রামায়ণে উল্লিখিত নৃপতিগণের সহিত রঘুবংশে উল্লিখিত নৃপতিগণের বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। মহাকবি কালিদাস একটি সম্পূর্ণ সর্গে রামের কৈশোর লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী সর্গে রামায়ণের মূলকাহিনী বিধৃত করিয়াছেন। কাব্যটির প্রথম অংশে রঘু প্রধান চরিত্র, দিলীপ ও অজ পার্শ্বচরিত্ররূপে উপস্থিত। দ্বিতীয় অংশে রামচন্দ্র প্রধান চরিত্র, দশরথ ও কুশ পার্শ্বচরিত্ররূপে উপস্থাপিত। অন্তিম দুইটি সর্গে যে নৃপতিগণের বর্ণনা পাওয়া যায় তাহারা খ্যাতিমান ছিলেন না।

ইহার পরই উল্লেখ করিতে পারা যায় 'রাবণবহ' অথবা 'সেতুবন্ধ' কাব্যের নাম। ইহা ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রবরসেনের দরবারে কবিকর্তৃক মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃতে রচিত। রাবণবহের পঞ্চদশ সর্গ পর্যন্ত বাল্মীকি-রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ড অবলম্বনে লিখিত। রাবণবহের বিশেষত্ব এই যে কামিনীকেলি নামক দশম সর্গে রাক্ষসদের সম্ভোগের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহার মূলস্রোত সম্ভবতঃ 'পউমচরিয়'।

পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত 'ভট্টিকাব্যে'র রচয়িতা কে ছিলেন তাহার সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হয় নাই। ভট্টিকাব্য ২২টি সর্গে রচিত। দশরথের মৃত্যু হইতে রামের অযোধ্যাপ্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বর্ণনা ইহাতে রহিয়াছে। গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে কাব্যের ছলে ব্যাকরণের উদাহরণগুলি প্রদর্শন করা। ইহাতে ব্যাকরণ, ছন্দঃ, শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, রস, গুণ, শব্দচিত্র ও বর্ণচিত্র সকল বিষয়ই প্রদর্শিত হইয়াছে।

'জানকীহরণ' কাব্য সীতাহরণের ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত। ২৫টি সর্গে রচিত এই কাব্যের প্রথম সর্গে রহিয়াছে অযোধ্যাবর্ণনা, তৃতীয় সর্গে রহিয়াছে রাজার জলকেলি, সন্ধ্যা, রজনী ও প্রভাতবর্ণনা ও অষ্টম সর্গে রহিয়াছে নবদম্পতির রহস্যালাপ। অনুপ্রাসসমৃদ্ধ এই কাব্য অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। এই কাব্যের রচয়িতা কবি কুমারদাসকে সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপন করা যাইতে পারে। জনশ্রুতি হিসাবে কুমারদাস সিংহলের রাজা ও কালিদাসের সমসাময়িক। কিন্তু এই মতের কোন সুদৃঢ় ভিত্তি নাই। নবম শতাব্দীতে অভিনব কর্তৃক 'রামচরিত' কাব্য রচিত হইয়াছিল।

একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরদেশীয় ক্ষেমেন্দ্র 'রামায়ণমঞ্জরী' নামে রামায়ণের এক সংক্ষিপ্ত সারগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে তাঁহার মৌলিকতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি 'দশাবতারচরিতম্' গ্রন্থ রচনা করেন ও রামকথার এক নবীনরূপ দান করেন।

চতুর্দশ শতাব্দীতে সাফল্যমল্ল নামে কবি 'উদাররাঘব' রচনা করেন। আখ্যানবস্তু বাল্মীকি-রামায়ণের অনুরূপ। সাফল্যমল্ল মল্লাচার্য, কবিমল্ল ও মল্লয়াচার্য নামেও খ্যাত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বহু রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় যাহার অধিকাংশই অপ্রকাশিত। বামন ভট্টবাণের ৩০ সর্গে রচিত 'রঘুনাথচরিত' এই পঞ্চদশ শতাব্দীতেই রচিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে চক্রকবি 'জানকীপরিণয়' রচনা করেন। ৮টি সর্গে বাল্মীকির বালকাণ্ড অনুসারে দশরথযজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়া পরশুরামের তেজোভঙ্গ পর্যন্ত প্রধান ঘটনা সকল বর্ণিত হইয়াছে। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বারাণসী নিবাসী অদ্বৈতকবি 'রামলিঙ্গামৃত' রচনা করেন। অদ্বৈত নামক সন্ন্যাসী বারাণসীতে 'রাঘবোল্লাস' নামে মহাকাব্য রচনা করেন। এই দুইজন অদ্বৈত অভিন্ন হইতে পারেন। এই মহাকাব্যের হস্তলিপি লণ্ডনে সুরক্ষিত আছে। লিপিকারের নাম মানসাহি কায়স্থ ও লিপিকাল ১৬২৫ খৃষ্টাব্দ। মোহনস্বামী কৃত 'রামরহস্য' অথবা 'রামচরিতে'র হস্তলিপি লণ্ডনে সুরক্ষিত আছে। লিপিকাল ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দ (ইণ্ডিয়া অফিস ক্যাটালগ)।

সংস্কৃত নাটকের উপর রামায়ণের প্রভাব

রামায়ণকে উপজীব্য করিয়া খুব সম্ভবতঃ খৃঃ পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে কবি ভাস 'প্রতিমানাটক' ও 'অভিষেকনাটক' নামে দুইটি নাটক রচনা করেন। প্রতিমানাটকের বিষয়বস্তু হইতেছে রামের বনবাস, দশরথের

মৃত্যু, প্রতিমাগৃহ হইতে ভরতের পিতার মৃত্যু ও রামের নির্বাসনের সংবাদ জ্ঞাত হওয়া, সীতাহরণ, রাম-রাবণের যুদ্ধ ও অযোধ্যাপ্রত্যাবর্তন প্রভৃতি। অভিষেকনাটক রচিত হইয়াছে কিষ্কিন্ধা কাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া।

তাহার পরই উল্লেখ করিতে হয় ভবভূতির দুইটি নাটক 'মহাবীর-নাটক' ও 'উত্তররামচরিত'। এই দুইটি নাটক সপ্তাঙ্ক নাটক। মহাবীর-চরিতে রামের জীবনের পূর্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে সীতা-বিসর্জনের পরবর্তী ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া লব কুশের জন্ম ও শেষে রামসীতার মিলন প্রদর্শিত হইয়াছে। ভবভূতির সময় যথার্থভাবে নির্ণীত করা যায় নাই। তিনি খুব সম্ভবতঃ সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীর লোক।

অনঙ্গহর্ষ মায়ুরাজ সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীতে 'উদাত্তরাঘব' নামক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। 'কুন্দমালা' নাটকের রচনা ভবভূতির উত্তররাম-চরিতের পর ও ভোজদেবকৃত শৃঙ্গারপ্রকাশের (১০৫০ খৃষ্টাব্দে) পূর্বে হইয়াছিল। কবির নানা নাম পাওয়া যায়। দিঙ্নাগ, বীরনাগ অথবা ধীরনাগ। মুরারিকৃত 'অনর্ঘরাঘব' নবম শতাব্দীর নিকটবর্তী সময়েই রচিত। শক্তিভদ্রকৃত 'আশ্চর্যচূড়ামণি' নবম শতাব্দীর রচনা বলিয়া মনে হয়। দশম শতাব্দীতে রাজশেখর 'বালরামায়ণ' রচনা করেন। রামকথা-বিষয়ক সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত নাটক হইতেছে বালরামায়ণ। 'মহানাটক' অথবা 'হনূমন্নাটকের' প্রথম রচনা সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীতে হইয়াছিল। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীতে অনেক প্রক্ষেপযুক্ত হয়।

রামসম্বন্ধী অপ্রাপ্য নাটকসমূহ

'রাঘবানন্দ', 'মায়াপুষ্পক' ও 'স্বপ্নদশানন' প্রভৃতি নাটক দশমশতাব্দীতে রচিত। ইহাদের লেখক অজ্ঞাত। দশমশতাব্দীতে হেমচন্দ্রের শিষ্য ক্ষীরস্বামী 'অভিনবরাঘব' নামক নাটকের কথা উল্লেখ করেন। দ্বাদশ-শতাব্দীতে হেমচন্দ্রের শিষ্য রামচন্দ্র 'রঘুবিলাস' ও 'রাঘবাভ্যুদয়' নামক নাটক রচনা করেন।

ডঃ রাঘবন্ নিম্নলিখিত রামবিষয়ক অপ্রাপ্য নাটকের উল্লেখ করেন। যশোবর্মন্‌কৃত 'রামাভ্যুদয়' (অষ্টম শতাব্দী) 'রামানন্দ', 'ছলিতরাম' (নবম শতাব্দী) ও কৃতরামায়ণ। ইহাদের লেখক অজ্ঞাত। মহাদেবের পুত্র জয়দেব দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'প্রসন্নরাঘব' রচনা করেন। গুজরাটনিবাসী সোমেশ্বর ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে 'উল্লাঘরাঘব'

নামক নাটক রচনা করেন। ইহার অপূর্ণ হস্তলিপি ভাণ্ডারকার ইনস্টিটিউট (পুনা)তে সুরক্ষিত আছে।

রামবিষয়ক গৌণ নাটক

জৈনকবি হস্তমল্ল ১২৯০ খৃষ্টাব্দে সীতার বিবাহ অবলম্বনে 'মৈথিলী-কল্যাণ' রচনা করেন। তিনি 'অঞ্জনাপবনঞ্জয়' নামক নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। ইহা বিমলসূরির রামকথার উপর নির্ভরশীল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুভট্ট 'দূতাঙ্গদ' রচনা করেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে ভাস্করভট্ট বিক্রমোর্বশীয়ের চতুর্থ অঙ্কের অনুকরণে 'উন্মত্তরাঘব' রচনা করেন। বিরূপাক্ষকৃত 'উন্মত্তরাঘব' পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিত। ব্যাসমিশ্র-দেবের 'রামাভ্যুদয়' পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে রচিত।

উত্তরকালীন নাটক

সপ্তদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যবাসী মহাদেব 'অদ্ভুতদর্পণ' নামক নাটক রচনা করেন। এখানে এক ঐন্দ্রজালিক দর্পণ দ্বারা রামকে লঙ্কার ঘটনাসমূহ দেখান হয়। নির্ণয়সাগর হইতে এই নাটকটি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময় রামভদ্র দীক্ষিত হাস্যপ্রধান 'জানকীপরিণয়' নাটক রচনা করেন।

স্ফুটকাব্য / শ্লেষকাব্য

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' রচনা করেন। রামকথার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় রাজা রামপালের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে দিগম্বর জৈন ধনঞ্জয় 'রাঘবপাণ্ডবীয়'তে একই সঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণনা করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে মাধবভট্ট একই ভাবে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে 'রাঘব-পাণ্ডবীয়' রচনা করেন। হরিদত্তসূরি 'রাঘবনৈষধীয়'তে একই সঙ্গে রাম ও নল চরিত্র বর্ণনা করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে চিদাম্বরকৃত 'রাঘবপাণ্ডবযাদবীয়'তে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত পুরাণের কথা একই সঙ্গে বর্ণিত আছে। 'সংকটনাশনস্তোত্রে' অষ্টাদশ শতাব্দীর গদাধর রাম ও কৃষ্ণ চরিত্র একই সঙ্গে বর্ণনা করেন।

নীতিকাব্য

রামকবি কৃত 'সন্নীতি রামায়ণ' পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত। প্রত্যেক শ্লোকের পূর্ব নীতিকাব্য ও উত্তরার্ধ রামকথাবিষয়ক।

বিলোম কাব্য

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে রচিত সূর্যদেবকৃত 'রামকৃষ্ণবিলোম' কাব্য স্বাভাবিক ক্রমে রামের সঙ্গে সম্পর্কিত ও বিপরীতক্রমে কৃষ্ণের সঙ্গে। সপ্তদশ শতাব্দীতে কৃত 'যাদবরাঘবীয়'তে স্বাভাবিক ক্রমে রামকথা ও বিপরীতক্রমে কৃষ্ণকথা বর্ণিত।

চিত্রকাব্য

'রামলীলামৃত' কাব্যের রচয়িতা কৃষ্ণমোহন। বিশ্বামিত্রের অযোধ্যা আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া রাবণবধ পর্যন্ত ইহাতে বর্ণিত। এই কাব্যে সম্বন্ধ, পদবন্ধ, সোপান, গোমূত্র প্রভৃতি চিত্রালঙ্কারে ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। ১২০টি ছন্দের প্রয়োগ এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য। অন্ধ্রদেশীয় বেঙ্কটেশ 'চিত্রবন্ধরামায়ণ' রচনা করেন।

শৃঙ্গারিক খণ্ডকাব্য

মেঘদূতের অনুকরণে বহু খণ্ডকাব্য পাওয়া যায়। 'হংসসন্দেশ' অথবা 'হংসদূত' রচয়িতা নানা নাম পাওয়া যায়। বেঙ্কটদেশিক, বেঙ্কটনাথ, বেদান্তাচার্য অথবা বেদান্তদেশিক প্রভৃতি। হংসদ্বারা সীতার নিকট সন্দেশপ্রেরণই ইহার কথাবস্তু। ভ্রমরদূতের রচয়িতা রুদ্র বাচস্পতি। রামকর্তৃক সীতার নিকট ভ্রমর প্রেরণই ইহার বিষয়বস্তু। 'কপিদূত' খণ্ডবাক্যে হনুমান্‌কে দূতরূপে প্রেরণ করা হইয়াছে (ঢাকা ইউনিভার্সিটি মেনুস্ক্রিপট্)। ইহা ছাড়া রহিয়াছে বেঙ্কটাচার্যকৃত 'কোকিলসন্দেশ' ও কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার রচিত 'চন্দ্রদূত'।

গীতগোবিন্দ অনুকরণে রামসীতাবিষয়ক কাব্য

ইহার মধ্যে রহিয়াছে হরিশঙ্কর ও প্রভাকরকৃত 'গীতরাঘব', শ্রীহর্ষাচার্যকৃত 'জানকীগীতা', অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশ্বনাথ সিংহকৃত 'সঙ্গীতরঘুনন্দন' ও 'রাম গীতগোবিন্দ' (বেঙ্কটেশ্বর প্রেস) প্রভৃতি।

অন্য স্ফুটকাব্য

উল্লিখিত রচনা ব্যতীত সাহিত্যদর্পণরচয়িতা বিশ্বনাথকৃত 'রাঘববিলাস', সোমেশ্বরকৃত 'রামশতক', মদগলভট্ট রচিত 'রামার্যশতক' ও কৃষ্ণচন্দ্রকৃত 'আর্যারামায়ণ' প্রভৃতি কাব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কথাসাহিত্য

কথাসাহিত্যে বিস্তৃত রামবিষয়ক রচনা দৃষ্ট হয় নাই। গুণাঢ্যকৃত 'বৃহৎকথা'তে রামকথা বর্ণিত ছিল ইহা অনুমান করা যায়। ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী'তে রামকথা অতি সংক্ষিপ্তরূপে পাওয়া যায়। বসুদেব বিণ্ডি জৈন মহারাষ্ট্রীয় গদ্যতে বৃহৎকথার জৈনীরূপ দান করেন। এখানে সংক্ষিপ্ত রামকথা পাওয়া যায়। সোমদেব একাদশ শতাব্দীতে 'কথাসরিৎসাগর' রচনা করেন। এখানে দুই স্থানে রামকথার বর্ণনা পাওয়া যায়।

চম্পূসাহিত্য

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রামবিষয়ক এক বিস্তৃত চম্পূসাহিত্য দৃষ্ট হয়। একাদশ শতাব্দীর রাজা ভোজ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রচলিত রামবিষয়ক চম্পূর রচয়িতা। এই চম্পূরামায়ণ বাল্মীকি-রামায়ণের দাক্ষিণাত্যপাঠ আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। পরে উত্তরকাণ্ডের কথাবস্তু লইয়া উত্তরকাণ্ডচম্পূ ও উত্তররামায়ণচম্পূ রচিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে বাসুদেব গদ্যে রামকথা রচনা করেন। অনন্তভট্টের 'রামকল্পদ্রুম' গদ্যে রচিত।

রামকথাবিষয়ক জৈনসাহিত্য

রামকথা জৈনধর্মকে অত্যন্ত প্রভাবিত করিয়াছে। জৈনসাহিত্যের বিশাল অংশ রামকথায় পূর্ণ। ইহা প্রাকৃত, সংস্কৃত, অপভ্রংশ তিন ভাষাতেই লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় নিম্নলিখিত জৈনরামায়ণ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে প্রাচীনতম জৈন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতেছে রবিষেণকৃত 'পদ্মচরিত'। দ্বাদশ শতাব্দীতে হেমচন্দ্রকৃত 'ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিতে' রামকথার উল্লেখ পাওয়া যায়। হেমচন্দ্রের যোগশাস্ত্রের টীকার অন্তর্গত হইতেছে 'সীতা-রাবণকথানকম্'। পঞ্চদশ শতাব্দীতে জিনদাস রামায়ণ অথবা 'রামদেব-পুরাণ' রচনা করেন। পদ্মদেব বিজয়গণি ষোড়শ শতাব্দীতে 'রামচরিত' রচনা করেন। ভীমসেনের রামচরিত ষোড়শ শতাব্দীতেই রচিত। আচার্য সোমপ্রভ 'লঘুত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষ' রচনা করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে মেঘবিজয়গণিবর 'লঘুত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত্র' রচনা করেন। ইহা ছাড়া জিনরত্নকোষে ধর্মকীর্তি, চন্দ্রসাগর, শ্রীচন্দ্র, পদ্মনাভ প্রভৃতি দ্বারা রচিত বিভিন্ন পদ্মপুরাণ অথবা 'রামচরিত্র' নামক গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

সীতাচরিত্র রচয়িতার তিনটি নাম পাওয়া যায়— পদ্মনেমিদত্ত, শান্তিসুরি ও অমরদাস।

দশম শতাব্দীতে হরিষেণকৃত কথাকোষে 'রামায়ণকথানকম্' ও 'সীতাকথানকম্' পাওয়া যায়। ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্রমুমুক্ষুকৃত 'পুণ্যাশ্রবকথাকোষে' লবকুশের কথা পাওয়া যায়। 'শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য' নামক নবম সর্গে লিখিত রামকথা বিমলসূরি অনুসারে লিখিত। কিন্তু ইহাতে কৈকেয়ী রাম ও লক্ষ্মণ দুইজনের বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ভারতে ইংরাজী সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

ইংরাজী বিদেশী ভাষা। কিন্তু প্রায় দুই শতাধিক বৎসর ভারত ইংরাজদের অধীনে থাকায় ইংরাজী একটি ভারতীয় ভাষায় পরিণত হইয়াছে। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের ইহা মাতৃভাষা। ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত ভাষার অন্যতম এই ইংরাজী ভাষা। বস্তুতঃ ইংরাজী ভাষা হইতেছে বিভিন্ন রাজ্যের সংযোগকারী একমাত্র ভাষা। ইহা আন্তর্জাতিক ভাষাও বটে। বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার পরেই ইহার স্থান। ভারতীয় বহু মনীষী এই ভাষার মাধ্যমেই তাঁহাদের মনোভাব দেশবাসীকে জানাইয়া থাকেন। কারণ প্রতিটি প্রদেশের শিক্ষিত লোক ইংরাজী ভাষা জানেন। রামায়ণগ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত বহু ব্যক্তিকে প্রভাবিত করিয়াছে। তাহারই ফলশ্রুতি ইংরাজীভাষায় রচিত রামসম্বন্ধী গ্রন্থগুলি। এই বিংশ শতাব্দীতেও বহু লোক রামায়ণকাহিনী দ্বারা প্রভাবিত, তাহারই নিদর্শন হইতেছে বর্তমান কালে রামায়ণ অবলম্বনে লিখিত গ্রন্থসকল। বিভিন্ন ভাষাভাষীদের দ্বারা লিখিত রামসম্বন্ধী ইংরাজীসাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ্। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শান্তিকুমার নানূরাম লিখিত 'ইণ্ডিয়া ইন দি রামায়ণ এ্যাজ' গ্রন্থে বাল্মীকি-রামায়ণে বর্ণিত প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার মনোজ্ঞ বর্ণনা রহিয়াছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'অন্ধ্র পেন্টিংস অব দি রামায়ণ' গ্রন্থে জগদীশ মিত্তাল অন্ধ্র প্রদেশের রামবিষয়ক চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। সি. আর. এক্রামবলনের 'চিত্র রামায়ণ' গ্রন্থটিতে কাহিনী ও ছবির সাহায্যে রাম-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ভি. ভি. দীক্ষিত তাঁহার 'রিলেশন অব দি এপিকস্ টু দি ব্রাহ্মণ লিটারেচার' গ্রন্থে রামায়ণের ইতিহাস, ধর্ম ও সমাজ-বিদ্যার সহিত ব্রাহ্মণসাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রকৃতপক্ষে রামায়ণের যুদ্ধ হইতেছে আর্য ও দ্রাবিড়জাতির

মধ্যে যুদ্ধ। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'স্টাডিস্ ইন রামায়ণ' গ্রন্থে কে. এস. রামস্বামী শাস্ত্রী রামায়ণের আধ্যাত্মিক আদর্শ ও অন্যান্য আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 'এ নিউ এপ্রোচ টু দি রামায়ণ' গ্রন্থের লেখক এ. আর. নবলেকরের মতে অবতারবাদ জীবজগতের ক্রমোন্নতির বিবরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি মৎস্য অবতার হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধ অবতার পর্যন্ত সকল অবতারের আবির্ভাব সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বর্ণনা দেন। সত্যব্রত শাস্ত্রী তাঁহার 'রামায়ণ—এ লিঙ্গুয়িস্টিক স্টাডি' গ্রন্থে রামায়ণের ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। অধুনা লিখিত 'এ সোসিও-পলিটিক্যাল স্টাডি অব দি বাল্মীকি রামায়ণ' গ্রন্থে রামাশ্চর্য শর্মা রামায়ণযুগের সমাজনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এরূপ অজস্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় রচিত হইয়াছে।

পরিশিষ্টে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় লিখিত রাম ও রামায়ণ অবলম্বনে রচিত সাহিত্যকৃতির বিবরণ প্রদত্ত হইল যাহা বিশাল রামসাহিত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোকপাত করে।

রামায়ণ সম্পর্কে বিবিধ আলোচনাচক্র

রামায়ণের উপর আলোচনা ও গবেষণা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২২ ও ১৯২৫ সালে দুইটি আলোচনাচক্রে রামায়ণ সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় উদ্ঘাটিত হয় এবং সেই আলোচনাচক্র হইতে রামায়ণের সার্বজনিক আবেদন আরও প্রকট হয়। এখানে ঐ দুইটি আলোচনাচক্রের মূল সিদ্ধান্তগুলি উপস্থাপিত হইতেছে।

১৯২২ সালে ইন্দোনেশিয়াতে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক উৎসবের[১] সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নহে বিদেশেও রামায়ণের কিরূপ সুদূরপ্রসারী প্রভাব আজিও বর্তমান তাহার প্রমাণ হইতেছে কিছুদিন পূর্বে ১৯৭২ সালে ইন্দোনেশিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসব উদ্যাপন। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট এইচ্. ই. জেনারেল সুহার্তো এই উৎসবের উদ্বোধন করেন ও পূর্ব জাভার গভর্ণর মোহম্মদ নোয়ের ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করেন। ইন্দোনেশিয়ার ডাকবিভাগ এই

১। ইণ্টারন্যাশানাল একাডেমী অব ইণ্ডিয়ান কালচারের সৌজন্যে প্রাপ্ত

উৎসব উপলক্ষে দুইটি ডাক টিকিট বাহির করেন। ৩১শে আগষ্ট হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই উৎসব চলে। ইন্দোনেশিয়া ছাড়া বার্মা, সিংহল, থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইনস্, ভারত প্রভৃতি দেশ ইহাতে অংশ গ্রহণ করে। এমন কি জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতগণও ইহাতে অংশ নেন। ভারত হইতে দুইটি নৃত্যশিল্পী দল সেখানে যান। 'রঙ্গশ্রী লিট্‌ল ব্যালে' ও 'পি. এস্. ডি. নাট্যসঙ্ঘম্' এই দুইটি দল রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে নৃত্যাভিনয় প্রদর্শন করিয়া ইন্দোনেশিয়াবাসীদের মনোরঞ্জন করেন।

রামায়ণের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ রামায়ণ প্রভাবযুক্ত দেশগুলির নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, লাওস, কাম্বোডিয়া, বার্মা, সিংহল, ভারত, নেপাল, ফিজি, মরিশাস, ত্রিনিদাদ, সুরিনাম, গুয়ানা ও জাপান—প্রত্যেকটি দেশে রহিয়াছে রামায়ণের ঐতিহ্য।

বিদেশে রামকথার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় চীনদেশে। ২৫১ খৃষ্টাব্দে কায়াং সেঙ্ হুই 'রামায়ণজাতক' চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ছিসি হু চি তাঁহার অন্যান্য রচনার সঙ্গে হনুমানের সীতা অন্বেষণের কাহিনী লেখেন।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিংহলী কবি ও রাজা কুমারদাস 'জানকীহরণ' রচনা করেন। ইহাই হইতেছে সিংহলের প্রথম সংস্কৃত সাহিত্য রচনা। বর্তমান যুগে সি. ডন কাস্টিয়ানের রামায়ণের সিংহলী অনুবাদ সিংহলী সাহিত্যে নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। নাট্যকার জন. ডি. সিলভা রামায়ণ-কাহিনী রচনা করিয়াছেন। রামায়ণের আদর্শ সিংহলীদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিশেষতঃ সীতার গুণাবলী তাঁহাদের মুগ্ধ করিয়াছে।

সপ্তম শতাব্দীতে কাম্বোডিয়ার খমেরদের নিকট রামায়ণ শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় মহাকাব্যরূপে পরিণত হয়। সপ্তম জয়বর্মণের চামদের বিরুদ্ধে জয়লাভের কাহিনী (বায়নের স্থাপত্য গ্যালারীতে রক্ষিত) রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বন করিয়া খোদিত। খমেরদের রাজা হইতেছেন 'নূতন রাম' যিনি রাবণরূপী শত্রুকে ধ্বংস করিয়াছেন। সপ্তম জয়বর্মণের কাল হইতেই রামায়ণ খমেরদের জীবনে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিণত হয়। তখন হইতেই তাঁহাদের নানা সামাজিক উৎসবে রামায়ণ নাটক অভিনীত হইয়া থাকে। ফ্রেস্কোতে রামায়ণকাহিনী অঙ্কিত হয়, কথকগণ রামায়ণের কাহিনী কথকতা করেন। খমের জনসাধারণের নিকট রামায়ণ অতি জনপ্রিয় কাব্যরূপে পরিগণিত হয়।

নবম শতাব্দীতে 'প্রামবনের চণ্ডী লোরো ইয়নগ্রাং' মন্দিরের স্থাপত্য-কর্মে রামায়ণকাহিনী অঙ্কিত হয়। ইহা ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন রাম-কাহিনী 'রামায়ণ ককবিন' হইতে ভিন্ন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ইন্দোনেশিয়াতে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত ছিল। এই রামায়ণে স্থানীয় ছাপ রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া হনুমান্ ও তাঁহার কার্যাবলীর বর্ণনাতে।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে রামায়ণ-শিল্পকলা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। লাওসে ক্রা চাও অনুরুট্ (রাজা অনুরুদ্ধ) 'ভাটমি ফুমে ভাট্ মাই' নিউ প্যাগোডা নির্মাণ করেন। প্যাগোডার বহির্দ্বারে রামায়ণকাহিনী খোদিত করা হয়। লাওসের গীতিনাট্যে রামায়ণের সবিশেষ প্রভাব রহিয়াছে। নাট্যশালা অথবা ভিয়েনটিয়েনের ব্যালে স্কুল নিয়মিত সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষা দেয়। রাজা সাভাং বট্থানার কন্যা ডালার (তারার) বিবাহের সময় লুয়াং প্রাভাং রাজসভাতে জাঁক-জমকের সহিত রামায়ণনৃত্য পরিবেশিত হয়। বর্তমান লাওসের রাজা লাওস ভাষায় নব রামায়ণ রচনা করেন। থাইল্যাণ্ডের রামকথা 'রাম কিয়েন' অথবা 'রামকিরতি'র কাহিনী থাই রাজাদের সাহিত্যকর্মে পাওয়া যায়। থাইল্যাণ্ডের চারিজন রাজা যাঁহারা প্রথম রাম, দ্বিতীয় রাম, তৃতীয় রাম ও চতুর্থ রাম নামে খ্যাত, তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটি করিয়া রামায়ণ রচনা করেন। তবে কেবলমাত্র রাজা প্রথম রামের রামোপাখ্যানের পূর্ণরূপ পাওয়া যায়। রাজা দ্বিতীয় রামের লিখিত রামকাহিনীর যে অংশ পাওয়া যায় তাহা মঞ্চে উপস্থাপনের উপযোগী। বেঙ্ককের 'শিলপকন' অথবা 'রয়েল আর্টস ডিপার্টমেণ্ট' রামায়ণের এই দুইটি কাহিনী হইতে অভিনয়ের জন্য কিছু অংশ বাছিয়া লইয়াছেন। রাজা চতুর্থ রামের রচিত রামোপাখ্যানই থাইল্যাণ্ডবাসীর অতি প্রিয়। তাঁহার কাহিনী বাল্মীকি-রামায়ণের অনুকরণে লিখিত। থাইল্যাণ্ডে প্রচলিত 'খোন্' অর্থাৎ মুখোশনৃত্যে, 'নাং' অর্থাৎ ছায়ানৃত্যেও রামকিয়েন এর কাহিনীর নৃত্যরূপ দেওয়া হইয়া থাকে। ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দেই প্রথম 'নাং' নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মালয়েশিয়ার রামকাহিনী 'হিকাকাত শেরীরাম' (১৪০০-১৫০০) মালয়ের ছায়ানৃত্য 'ওয়াং সিয়াম্' ও 'ওয়াং যাওয়া'র উৎস।

ব্রহ্মদেশেও রামকাহিনী রহিয়াছে। রাজা কিয়জিটথা (১০৮৪-১১১২) নিজেকে রামের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে

ব্রহ্মদেশ কর্তৃক থাইল্যাণ্ড জয়ের পরই বার্মার রামকাহিনী (যামা-রাম) প্রথম অভিনীত হয়। পূর্বে 'যামা পাউই'-এর অভিনয় ২১ রাত্রি ব্যাপিয়া চলিলে সম্পূর্ণ হইত। কিন্তু বর্তমানে ইহা ১২ রাত্রি ধরিয়া অভিনীত হইয়া থাকে।

তিব্বতের মাধ্যমে রামকাহিনী মঙ্গোলিয়ায় ও মঙ্গোলিয়া হইতে পশ্চিমে ভল্গার তীরে উপস্থিত হয়। ভল্গার তীরে কামলুক ভাষায় রামায়ণের এক গ্রাম্য অনুবাদ পাওয়া যায়। ইহা সাইবেরিয়ার একাডেমী অব্ সায়েন্সে সংরক্ষিত। মঙ্গোলিয়ার অধ্যাপক ডামডিন সুরেন মস্কো ও লেলিনগ্রাডে মঙ্গোলিয়ার রামায়ণ ও ইহার গ্রাম্য অনুবাদের উপর কাজ করিতেছেন।

তিব্বতে রামকাহিনী বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। তিব্বতী-ভাষায় অনেক হস্তলিপিতে রামকাহিনী পাওয়া যায়। তিব্বতী রামায়ণের কাহিনী বাল্মীকি-রামায়ণ অনুসারী নহে। তিব্বতী রামায়ণ গুণভদ্রের উত্তর পুরাণ ও বৃহৎকথা দ্বারা প্রভাবিত।

খোতান অর্থাৎ পূর্ব তুর্কীস্থানে নবম শতাব্দী হইতেই রামকথা প্রচলিত। তিব্বতের মাধ্যমেই খোতানে রামকাহিনীর প্রচলন হয়। তবে খোতানী রামায়ণ সম্পূর্ণভাবে তিব্বতী রামায়ণের অনুসারী নহে। ইহাতে কিছু পরিমাণ বৈসাদৃশ্য বর্তমান।

১৯২৫ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক রামায়ণ সেমিনারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।[১]

১৯২৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর হইতে ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত দিল্লীতে আন্তর্জাতিক রামায়ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রফেসর নুরুল হাসান এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ও ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী ৫০ জন প্রতিনিধি ইহাতে অংশগ্রহণ করেন।

ডঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী, ডঃ ভি. রাঘবন, প্রোফেসর মিনোরু হারা, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রী জুয়ান. আর. ফ্রান্সিস্কো, শ্রী জে. তিলকসিরি, ফাদার কামিল বুল্কে, ডঃ কপিল বাৎসায়ন, শ্রী সি. শিবরামমূর্তি অধিবেশনগুলির সভাপতিত্ব করেন। সংযোজকের কাজ করেন ডঃ সি. আর. শর্মা।

১। সাহিত্য একাডেমী, ন্যাশানাল একাডেমী অব লেটার্স্-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত

'সংস্কৃত সাহিত্যে রামায়ণ' প্রবন্ধে ডঃ রাঘবন মন্তব্য করেন যে ভারতীয় সাহিত্যিক ঐতিহ্য বাল্মীকিকে আদিকবি ও রামায়ণকে আদিকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার মতে বাল্মীকি-রামায়ণ ও ইহার অবলম্বনে লিখিত কাব্য ও নাটকেই রামোপাখ্যান শুদ্ধ হইয়া যায় নাই। সংস্কৃতকাব্যের উৎসস্বরূপ রামায়ণের শ্লোকাবলী কেবলমাত্র অলঙ্কার ও নাট্যশাস্ত্রেই উল্লিখিত হয় নাই, ইহা ধর্মশাস্ত্রেও যথেষ্ট পরিমাণে উল্লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত শিলালিপিও রামায়ণের প্রভাবের উল্লেখ্য উদাহরণ। বর্তমানকালে প্রকাশিত ভুশুণ্ডী-রামায়ণ তাঁহার মতে আধ্যাত্ম-রামায়ণ, আনন্দরামায়ণ ও অন্যান্য রামায়ণের উৎস।

'ধর্মে পবিত্রগ্রন্থের ভূমিকা' প্রবন্ধে ডঃ হ্যারি এস. বাক লক্ষ্য করিয়াছেন যে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর মত রামকাহিনীও মানব অভিজ্ঞতারই অঙ্গ। তিনি বলেন যে রামোপাখ্যানের শক্তি রহিয়াছে তাহার জীবন্ত ঐতিহ্যের মধ্যে।

ডঃ সোয়েবিতো সন্তোস তাঁহার 'প্রাচীন জাভার রামায়ণ—ইহার রচয়িতা ও রচনাতে'—মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রাচীন জাভার রামায়ণ ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, সর্বজনজ্ঞাত ও সর্বজনপঠিত গ্রন্থ। এক হাজার বৎসর ধরিয়া ইন্দোনেশিয়ার জনমানসে ইহার ছাপ বিদ্যমান।

শ্রীমতী সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁহার 'রামায়ণে নৈতিকমূল্যের বৈধতা' প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে রামায়ণের নৈতিক মূল্যবোধ ছিল মহৎ ও সৎ। অকালমৃত্যুরোধে শম্বুকবধ সে যুগের প্রচলিত নৈতিক নিয়মানুযায়ী সঠিক পন্থা। রামায়ণ মহোত্তম নৈতিক মূল্যের বাহক।

'রামচরিতমানস ও ইহার সহিত বর্তমান যুগের সম্পর্ক' প্রবন্ধে ফাদার কামিল বুল্কে লক্ষ্য করিয়াছেন যে রামচরিতমানসের বার্তা বর্তমান যুগেও উপযোগী। অমর কাব্য রচনা করা তুলসীদাসের লক্ষ্য ছিল না, তাঁহার কাব্য রচনার উদ্দেশ্য হইল ভগবদ্‌ভক্তির যোগ্য সরণি নিরূপণ। ভগবৎ-ভক্তি (দাস্যভক্তি) ভগবানের প্রতি নিখাদ ভক্তির প্রধান উপাদান।

প্রোফেসর হিমাংশুভূষণ সরকার তাঁহার লিখিত 'ইন্দোনেশিয়াতে রামোপাখ্যানের গমন ও জাভার রামায়ণ গঠনে ও বিষয়বস্তুতে কিছু সমস্যা' নামক প্রবন্ধে চতুর্থ হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত রামায়ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রামায়ণের চরিতাবলীর অনেক নামই প্রাক্ লঙ্কাযুগের মধ্য জাভার শিলালিপিতে পাওয়া গিয়াছে।

আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ লোকেশচন্দ্র বলেন যে, ভাষার প্রাচীনতা দেখিয়া মনে হয় আদিকাণ্ডের পূর্বেই জাভার রামায়ণ বিদ্যমান ছিল।

'বিভিন্ন সংস্করণে রামায়ণের পাণ্ডুলিপি' নিবন্ধে প্রফেসর ইউ. পি. শাহ্ অনেক পাণ্ডুলিপির বর্ণনা দেন। বরোদার মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাল্মীকি-রামায়ণের সংস্করণ এই সকল পাণ্ডুলিপির আলোচনা করিয়াই লিখিত। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি হইতেছে কাঠমুণ্ডুর বীর লাইব্রেরীতে রক্ষিত নেয়ারী হরফে লিখিত তালপাতার পাণ্ডুলিপি (১০২০ খৃষ্টাব্দে লিখিত)।

ডঃ রাঘবন, ডঃ ডি. সি. সরকার ও ডঃ এস. শংকররাজু নাইডু উত্তর-কাণ্ডের প্রধান সমস্যাগুলি আলোচনা করেন। প্রোফেসর শাহের মতে উত্তরকাণ্ডের প্রারম্ভ সর্গগুলি খুবই প্রাচীন। খুব সম্ভবতঃ ইহা মূল রামায়ণের পরিশিষ্টরূপে গণ্য ছিল।

ডঃ ভি. এম. কুলকর্ণি 'জৈন রামায়ণ ও তাহার উৎস' প্রবন্ধে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বাল্মীকি-রামায়ণই জৈন রামায়ণের উৎস।

আলোচনা প্রসঙ্গে প্রোফেসর ডি. সি. সরকার বলেন যে জৈন ও বুদ্ধ রামায়ণ হইতেছে ব্রাহ্মণ রামায়ণের বিকৃত রূপ। সীতা কর্তৃক রাবণের ছবি আঁকার কাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে খুবই জনপ্রিয়। প্রোফেসর উমাশংকর যোশী বলেন যে, এই কাহিনী গুজরাটী ও তেলুগু লোক-সাহিত্যেও প্রচলিত।

'অভিনয়ে মালয়েশীয় রামায়ণ' প্রবন্ধে ডঃ আমিন স্বিনী বলিয়াছেন যে, বহু শতাব্দী ধরিয়া রামায়ণ গ্রন্থ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবাসীর হৃদয় জয় করিয়াছে। কম্বোডিয়া হইতে বালী পর্যন্ত রামায়ণ অবলম্বন করিয়া কাব্য-রচনা, আবৃত্তি, স্থাপত্যরচনা ও অভিনয় হইয়া থাকে। 'ওয়াং সিয়াম্' অথবা মালয়-রামায়ণের নাট্যরূপ ছায়ানাটকেই পরিবেশিত হয়। চরিত্র ও স্থানের স্থানীয় নাম দেওয়া হইয়াছে। ছায়ানৃত্যে রাম রমণীকান্তরূপে বর্ণিত, রাম শূর্পণখাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, রাবণ পরিণত হইয়াছিল টিকটিকিতে। রাবণের ১২টি অথবা ৭টি মুণ্ড ছিল।

'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাষান্তরে প্রাপ্ত নূতন বিষয়বস্তু' সম্বন্ধে ডঃ রাঘবন বলেন যে, ইহাদের ভারতীয় ও সংস্কৃত উৎস পাওয়া যাইতে পারে। আনন্দ-রামায়ণে বলা হইয়াছে যে, সাতটি তালবৃক্ষের নীচে একটি নাগ পাওয়া গিয়াছে। ইহা দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যেও দেখা যায়। প্রোফেসর দিস্কুলের বলেন যে থাই অনুবাদে আছে যে হনুমান্

মন্দোদরীকে ভালবাসিতেন। ডঃ সিংগরাভেলুর মতে সাহিত্যিক অনুবাদ লৌকিক অনুবাদের উপর নির্ভরশীল।

'মালয়েশিয়ার রামায়ণ' প্রবন্ধে প্রোফেসর ইসমাইল হাসান লক্ষ্য করিয়াছেন যে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহু শতাব্দী ধরিয়া মালয়েশীয় জনমনে গভীরভাবে প্রোথিত। রামোপাখ্যান বহু পরিবর্তিত হইয়াছে ও অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তাঁহার মতে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সম্পূর্ণভাবে মালয়েশীয় চরিত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। রামকে বলা হইয়াছে আগুং (শ্রেষ্ঠ বা ঈশ্বর)। প্রোফেসর হাসান অধুনা প্রাপ্ত পদো লিখিত হাজার পাতার পাণ্ডুলিপি 'সাইয়ার আগুং'-এর প্রধান বক্তব্য উপস্থাপন করেন। মালয় রামায়ণে ইসলামের প্রভাব লক্ষ্য করিবার জন্য ডঃ স্বিনী অনুরোধ জানান।

ডঃ জুয়ান. আর. ফ্রান্সিস্কো ১৯৬৮ সালে আবিষ্কৃত 'ফিলিপাইনের রামায়ণ' (মহারাডিয়া লাওয়ানা) প্রবন্ধে বলেন যে ফিলিপাইনের সংস্কৃতিতে ভারতীয় প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। দক্ষিণ ফিলিপাইনের মারানও গোষ্ঠীর মধ্যে ইহার মৌখিক রূপ প্রচলিত এবং ইহা রামকাহিনীতে ইসলামের উপাদানের ব্যাখ্যা করে। ডঃ ফ্রান্সিস্কোর মতে লাবণ (রাবণ) একজন মুসলমান সন্ন্যাসী। উপাখ্যানে একটির বদলে দুইটি মৃগের আবির্ভাব হইয়াছিল। ডঃ রাঘবন বলেন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশীর ভাগ অনুবাদই কেবলমাত্র রাবণকাহিনী লইয়া রচিত।

প্রোফেসর ভি. সীতারামাইয়া তাঁহার 'কানাড়াতে রামায়ণ-সংস্কৃতি' প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে রামোপাখ্যান জনসাধারণের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।

'মালয় সাহিত্যে ও চলিত কাহিনীতে রামায়ণ' প্রবন্ধে এন. ভি. কৃষ্ণ ওয়ারিয়ার লক্ষ্য করিয়াছেন যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রামায়ণ হইতেছে 'রামচরিত'। ইহা বাল্মীকির যুদ্ধকাণ্ডের অনুবাদ। এজুথাসনের অধ্যাত্ম-রামায়ণ যে মালয় রামায়ণ সাহিত্যে প্রধান স্থান অধিকার করে তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন।

'তেলুগু সাহিত্য ও চলিত কাহিনীতে রামায়ণ' শীর্ষক প্রবন্ধে ডঃ সি. আর. শর্মা লক্ষ্য করিয়াছেন যে তেলুগু জনসাধারণ রামপূজা দ্বারা গভীর-ভাবে প্রভাবিত। অন্ধ্র প্রদেশে ইহা একটি জীবন্ত কাহিনী।

আলোচনাকালে ডঃ ডি. সি. সরকার জানান যে কবি মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের প্রেরণা পাইয়াছিলেন সুলোচনার কাহিনী হইতে।

ডঃ রাঘবন বলিয়াছেন যে তপস্বী সঙ্গীতরচয়িতা ত্যাগরাজ কর্তৃক রাম-কাহিনী অবলম্বনে রচিত সঙ্গীতই সঙ্গীতকলায় রামসাহিত্যের বৃহত্তম সংকলন।

রামকিয়েন বা রামকীর্তি থাইল্যাণ্ডের লোকেদের অতি পরিচিত। তাঁহারা জানেন যে বাল্মীকি ২০০০ বৎসর পূর্বে ইহা রচনা করেন। চামলং সরপাদনুকে তাঁহার 'থাই থিয়েটারে রামায়ণ' প্রবন্ধে ইহা বলিয়াছেন। থাই সাহিত্যে রামকাহিনী অতি গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় উপাখ্যান। ইহা থাই বিদ্যালয়ে পঠিত হইয়া থাকে। থাই অভিনয়েও ইহার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। 'নাংইয়াই' ও 'খোটি' রূপে ইহা মঞ্চে অভিনীত হয়।

'লাওসের রামায়ণ' প্রবন্ধটি দাখিল করেন শ্রীমতী কমলা রত্নম্। তিনি বলেন যে, লব রামায়ণ একেবারই নূতন ও বাল্মীকি-রামায়ণের সহিত ইহার পার্থক্য বর্তমান। লব রামায়ণের সহিত থাই ও কম্বোডিয়ান অনুবাদের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ডঃ এস. সহাই তাঁহার 'গভয় দুরভি' প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে 'খবাই দুরভি' হইতেছে অপ্রকাশিত ৫০ পাতার পাণ্ডুলিপি, ইহাতে রামোপাখ্যান বর্ণিত, যদিও শিরোনামে রহিয়াছে দুন্দুভির গল্প। ইহার প্রক্ষিপ্ত অংশ-গুলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে খুবই জনপ্রিয়। পাণ্ডুলিপিতে সমস্ত বংশ বিবরণ পরিবর্তিত। থাইল্যাণ্ডের জনপ্রিয় ভস্মাসুরের কাহিনী ইহাতে রহিয়াছে।

আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ সহাই জানান যে লাওসের অনুবাদে রাবণ দশ-মুণ্ডধারী দৈত্য নহে, তিনি ইন্দ্রের ন্যায় সুন্দর ও রামের মত সচ্চরিত্রযুক্ত। ডঃ রাঘবন বলেন যে বাল্মীকি-রামায়ণেও রাবণকে মহৎ ব্যক্তি বলা হইয়াছে। তবে তাঁহার চরিত্রের একমাত্র ত্রুটি অধর্মই তাঁহাকে সকলের বিরাগভাজন করিয়াছে।

'রামায়ণ—ইহার চরিত্র, উদ্ভব, ইতিহাস, বিস্তৃতি ও বহিঃপ্রসার' প্রবন্ধের প্রারম্ভে ডঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী বলেন যে, আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে রামায়ণের আরম্ভকাল হইতেই রামায়ণের কলেবর ক্রমশঃ সঙ্কলন ও সংযোজনের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার মতে সচেতন কবি বাল্মীকি তাঁহার রাম ও সীতা চরিত্রে সামাজিক আদর্শকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। বাল্মীকি কর্তৃক রামের ধারণা গ্রীসদেশীয় প্রভাবের ফলে হইতে পারে বলিয়া তিনি মনে করেন।

'বর্মী সাহিত্যে ও শিল্পে রামায়ণ' প্রবন্ধে শ্রী উ থাইন হান বলেন

যে, বর্মী অঙ্কন ও স্থাপত্যে রামোপাখ্যান দৃষ্ট হয়। রাম একজন আদর্শ ব্যক্তিরূপে চিত্রিত। এখানে শূর্পণখা নিজে হরিণে পরিণত হয়।

'শিলালিপিতে রামায়ণ' প্রবন্ধে ডঃ ডি. সি. সরকার জানাইলেন যে, শিলালিপি রামায়ণের প্রাচীনতা, উৎপত্তি ও চরিত্রাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করে। শ্রী সি. শিবরামমূর্তি মনে করেন যে তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর মাত্তেপাদ শিলালিপি হইতেছে রামায়ণশ্লোকসমন্বিত প্রাচীনতম শিলালিপি।

প্রফেসর মিনোরু হারা তাঁহার 'জাপানে রামায়ণের মূল বিষয়বস্তু' নিবন্ধে মধ্যযুগীয় জাপানসাহিত্যে রক্ষিত রামায়ণের দুইটি ভাষান্তর পাঠ করেন এবং ভারতীয় মূল রামায়ণ ও প্রাচ্যের অনুবাদগুলির মধ্যে তুলনামূলক ও বিশ্লেষণ-মূলক আলোচনা করেন।

'নেপালী ভাষায় রামায়ণ' প্রবন্ধে শ্রীমতী কমলা সাংকৃত্যায়ন নেপালী গদ্য ও পদ্য রামায়ণ ও আচার্য ভানুভক্তের রামায়ণের তুলনামূলক আলোচনা করেন।

শ্রী জে. তিলকসিরি তাঁহার 'সিংহলী সাহিত্য ও ইহার লৌকিক অনুবাদ' প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, সিংহলে বৌদ্ধমত প্রচলিত থাকায় সেখানে রামায়ণ সম্বন্ধে মিশ্র মনোভাব দেখা যায়। তবে শ্রীলঙ্কার গ্রামীণ জনতা রামোপাখ্যানকে ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানে পরিণত করিয়া আস্বাদন করে।

ডঃ সি. ই. গোদকুম্বুর 'শ্রীলঙ্কার রামায়ণ ও রামায়ণের লঙ্কা' প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, শ্রীলঙ্কাতে রামসীতাকে লইয়া বহু লৌকিক গল্প প্রচলিত। তাঁহার মতে শ্রীলঙ্কা অথবা পূর্ববর্তী লঙ্কাদ্বীপ যে রাবণের বাসভূমি ছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই।

'হিন্দীতে রচিত তুলসীদাসের রামচরিতমানস এবং ইহার সহিত বাল্মীকি-রামায়ণ, কম্বনের তামিল রামায়ণ ও রাজা প্রথম রামের থাই রামায়ণের সম্পর্ক',—প্রবন্ধে ডঃ সি. সিংগরাভেলুর মতে রাম ও সীতার প্রাক্-বিবাহ প্রেম সম্বন্ধে প্রচলিত ভাবটি সম্ভবতঃ এই তিনটি রামায়ণের পরস্পর সম্পর্কের তথা সেই সেই কবির ব্যক্তিগত প্রতিভার সামগ্রিক ফল।

'ভূশুণ্ডী-রামায়ণ ও মধ্যযুগীয় রামায়ণ সাহিত্যে ইহার প্রভাব' প্রবন্ধে ডঃ ভগবতীপ্রসাদ সিং বলিয়াছেন যে, দ্বাদশ শতাব্দীর পর সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষাতে রচিত রামায়ণ সাহিত্যের উৎস হইতেছে ভূশুণ্ডী-রামায়ণ।

শ্রীমতী ইন্দুজা অবস্থী তাঁহার 'রামচরিতমানস ও রামায়ণের অভিনয় ঐতিহ্যে' বলিয়াছেন যে, রামচরিতমানস উত্তরভারতের সামাজিক ব্যবহার,

মূল্যবোধ ও আদর্শকে প্রভাবিত করিয়াছে। বর্তমানে প্রচলিত রামলীলার প্রবর্তক খুব সম্ভবতঃ তুলসীদাস।

'পাঞ্জাবী সাহিত্যে রামায়ণ' প্রবন্ধে শ্রীমতী বলজিৎ তুলসী বলিয়াছেন যে সাহসিকতা ও বীরত্বে জনগণকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য গুরু গোবিন্দ সিংহ ৭১টি অপূর্ব ছন্দে 'রামাবতার' রচনা করেন।

'রামায়ণ ও গুজরাটি সাহিত্যে ইহার প্রভাব' প্রবন্ধে শ্রীউমাশংকর যোশী বলিয়াছেন যে জৈনধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবের ফলেই বোধহয় গুজরাটে রামায়ণ সেরূপ প্রভাব বিস্তার করে নাই। কিন্তু রামোপাখ্যান জনগণের খুবই প্রিয়।

প্রোফেসর পি. এন. পুষ্প তাঁহার 'কাশ্মীরী সাহিত্যে ও লোকগাথায় রামায়ণ' প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, রামকাহিনী কৃষ্ণকাহিনীর বহু পরে কাশ্মীরে প্রবেশ করে।

'বাংলার রামায়ণ' প্রবন্ধে প্রোফেসর ভবতোষ দত্ত জানাইলেন যে বাংলায় প্রচলিত কোন রামায়ণই বাংলার বিদগ্ধ সমাজ শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন না।

প্রোফেসর কে. সি. সাহু 'উড়িষ্যাতে রামসাহিত্য ও ইন্দোনেশিয়াতে ইহার প্রভাব' নিবন্ধে জানাইলেন যে, রামকাহিনী সপ্তম শতাব্দীতে উড়িষ্যাতে প্রবেশ করিয়াছে। হনুমানের জন্ম প্রভৃতি কাহিনীতে উড়িষ্যা ও ইন্দোনেশিয়ার রামসাহিত্যের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

শ্রী ই. নীলকান্ত সিংহ তাঁহার 'মণিপুরী ভাষা ও লৌকিক গাথাতে রামায়ণ' নিবন্ধে বলিয়াছেন যে, খুব সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে মণিপুরে রামকাহিনী জনপ্রিয় হইয়াছিল। কিন্তু বাংলার বৈষ্ণবমতের প্রভাবে ইহার জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। মণিপুরী পণ্ডিতগণ কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন।

'অসমীয়া সাহিত্যে রামায়ণ' প্রবন্ধে বিশ্বনারায়ণ শাস্ত্রী লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আসামে কোন মন্দির রাম বা মারুতির নামে উৎসর্গ করা হয় নাই। অসমীয়া ঐতিহ্যে ও সংস্কৃতিতে হনুমানের সহিত দৈবসম্পর্ক আছে বলিয়া কখনও স্বীকার করা হয় নাই।

'বাংলা রামায়ণের মৌখিক ঐতিহ্য' সম্বন্ধে বলিতে গিয়া আশুতোষ ভট্টাচার্য জানাইলেন যে, কথকতা, লোকগীতি ও রামায়ণের মৌখিক রূপান্তর বাংলা দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। বিবাহগীতিতে রামায়ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। বাংলা পরিবারের বরকে রাম ও কন্যাকে

সীতা বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু কোন পিতা তাঁহার কন্যার সীতা নামকরণ করিবেন না। কথকগণ রামায়ণের বিষয়বস্তু কণ্ঠস্থ রাখেন।

শ্রীনীলমণি মিশ্র তাঁহার 'ওড়িয়া সাহিত্য ও মৌখিক ঐতিহ্য' প্রবন্ধে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, উড়িষ্যাতে রামগীতির অমর ঐতিহ্য রহিয়াছে। উড়িষ্যার মন্দির গাত্রে ও প্যানেলে রামকাহিনী অঙ্কিত। অজস্র মন্দির ও মঠ রামের নামে উৎসর্গীকৃত করা হইয়াছে। এখানকার গ্রামে রামনবমী উপলক্ষে রামলীলা অভিনীত হয়।

ডঃ শংকর রাজু নায়ডু তাঁহার 'তামিল ও হিন্দীতে রামায়ণের নূতন-সৃষ্টি' নিবন্ধে বলিয়াছেন যে, কম্বন ও তুলসী উভয়েই প্রায় একই উদ্দেশ্যে ও একই ভাবে মূল রামায়ণের ভিন্ন রূপ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীশিবরামমূর্তি উত্তর ভারতের সর্বত্র বর্তমান বিশাল রামায়ণস্থাপত্য সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করেন। তাঁহার মতে বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে জাতকের পরিবর্তিত রামকাহিনীই প্রথম রামায়ণ স্থাপত্যের সূচনা করেন। দক্ষিণে সুসংবদ্ধ রামোপাখ্যানের প্রথম বর্ণনা পাওয়া যায় পাপনাথ মন্দির প্যানেলে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মোগরাজপুরম্ ও বেজওয়াব প্যানেলই দক্ষিণের প্রথম প্যানেল। কুম্ভকোণমের নাগেশ্বর মন্দিরে মনোরম কারুকার্যমণ্ডিত প্যানেল দেখিতে অপূর্ব ও গুরুত্বপূর্ণ।

'তামিলনাড়ুতে শ্রীরামায়ণ' প্রবন্ধে শ্রী আর নাগস্বামী রামায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে বহুযুগ ধরিয়া বিস্তৃত তামিলনাড়ুর সাহিত্য, কলা ও চিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহার মতে তামিল সাহিত্যের প্রারম্ভকাল সঙ্গমযুগ হইতেই তামিলনাড়ুতে রামোপাখ্যান প্রচলিত। তিনি রামায়ণের অঙ্কন ও স্থাপত্য সম্বন্ধীয় কিছু স্লাইড প্রদর্শন করেন।

ডঃ লোকেশচন্দ্র 'এশিয়ার মহাকাব্য রামায়ণ' প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, রামকাহিনী সাইবেরিয়া হইতে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত প্রচলিত। ইহাকে এশিয়ার মহাকাব্য বলা যাইতে পারে। তিনি সিংহল, কাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, জাপান ও অন্যান্য দেশের প্রচলিত রামোপাখ্যান আলোচনা করেন। ইন্দোনেশিয়া হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি শিল্পকর্মও তিনি সকলকে দেখান।

তিব্বতী 'মহাবুৎপত্তি'তে উল্লিখিত সীতাহরণ সম্বন্ধে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ গোডকুম্বুর ও ডঃ রাঘবন। ডঃ লোকেশচন্দ্র জানান যে, কুমারদাসের জানকীহরণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে প্রচলিত ও ইন্দোনেশিয়ার পণ্ডিতবর্গ ইহার উপর গবেষণা করিতেছেন।

প্রোফেসর ডামিন সুরেন তাঁহার 'মঙ্গোলিয়ার রামায়ণ' প্রবন্ধে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রামকাহিনী মঙ্গোলিয়াতে সর্বজনজ্ঞাত। প্রচলিত বেশীর ভাগ রামোপাখ্যানই মঙ্গোলিয়ার কবিদের স্বাধীন কাব্যরচনা। রাম নয়টি পর্বত ও নয়টি সমুদ্র অতিক্রম করিয়াছেন হরিণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া। জীবককাহিনীতে রামকাহিনী বিধৃত। সুভাষিত রত্ননিধি, কাব্যাদর্শ ও অন্যান্য প্রবন্ধে রামকাহিনী রহিয়াছে। মঙ্গোলিয়াবাসী হনুমানের পূজা করিয়া থাকে। তাঁহাদের ধর্মীয় জীবন ও সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব রহিয়াছে।

'রামায়ণ ঐতিহ্য ও অভিনয়' প্রবন্ধের লেখক ডঃ সুরেশ অবস্তীর মতে রাম ঐতিহ্যের চারিটি মূল উপাদান রহিয়াছে। (১) সাহিত্য (২) মৌখিক (৩) অভিনয় (৪) অঙ্কন। তাঁহার মতে রামায়ণের আবৃত্তিই হইতেছে অভিনয় ঐতিহ্যের মূল। শুভ ও অশুভ শক্তির দ্বন্দ্বই রামায়ণ ঐতিহ্যের মূল উপাদান।

প্রোফেসর এ. সি. সুভদ্রদিশ্ দিস্কুল তাহার 'থাইল্যাণ্ডে রামায়ণ-স্থাপত্য ও অঙ্কন' সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন সুন্দর সুন্দর স্লাইডের মাধ্যমে, নানারূপ অঙ্কন, [illegible] নানা শিল্পকর্ম প্রস্তরে ও পুতুলের সাহায্যে বর্ণিত রামকাহিনীগুলি [illegible] প্রদর্শন করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতেই থাইল্যাণ্ডে রামায়ণ প্রচলিত ছিল। 'রামকিরতি' এখনও জনপ্রিয়। হনুমান খুব জনপ্রিয় ও তিনি থাইল্যাণ্ডে মহৎ প্রেমিক বলিয়া পরিগণিত।

ডঃ কপিল বাৎস্যায়ন তাঁহার 'এশিয়ার শিল্পে রামায়ণ' প্রবন্ধে অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, নৃত্য, গীতিনৃত্য, ছায়ানৃত্য, পুতুলখেলা, ব্যালে প্রভৃতি দ্বারা রামায়ণ ঐতিহ্য এখনও জীবন্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবাসুরের সংগ্রাম

বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণের প্রথম মন্ত্র—"দ্বয়া হ প্রাজপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ; ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাঃ ত এষু লোকেষ্বস্পর্ধন্ত, তে হ দেবা উচুর্হন্তাসুরান্ যজ্ঞ উদ্গীথেনাত্যায়ামেতি।" মন্ত্রার্থ—দেবগণ ও অসুরগণ প্রজাপতির দুই প্রকার সন্তান। ইহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ দেবগণ ও জ্যেষ্ঠ অসুরগণ। তাহারা সমগ্র ভোগ্যলোক ভোগ করিবার জন্য স্পর্ধা করিয়াছিলেন। তখন দেবগণ বলিয়াছিলেন—হন্ত! আমরা যজ্ঞে উদ্গীথ দ্বারা অসুরগণকে পরাজিত করিব।

বাক্ প্রভৃতি প্রাণসমূহই এখানে প্রজাপতির দুই প্রকার সন্তান। তাহাদের দেবত্ব ও অসুরত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে আচার্য শঙ্করের অভিমত—শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্মানুষ্ঠানলব্ধ-সংস্কার সম্পন্ন হওয়ায় প্রকাশবাহুল্যহেতু যে সকল প্রাণগণ দেবতা পদবাচ্য, তাহারাই আবার লোকসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে ঐহিক প্রয়োজনমাত্রসাধক জ্ঞান ও কর্মানুষ্ঠান জনিত সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া কেবলমাত্র নিজ নিজ প্রাণ পরিতৃপ্তিতে রত বলিয়া অসুরপদবাচ্য। সাত্ত্বিক ও রাজসিক বৃত্তিবিশিষ্ট বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণই ক্রমে 'দেবতা' ও 'অসুর' নামে অভিহিত। প্রজাপতির ন্যায় প্রত্যেক জীবের বিশেষ করিয়া মনুষ্য হৃদয়ে এই দেবাসুর সংগ্রাম অর্থাৎ সাত্ত্বিক ও রাজসিক প্রবৃত্তির সংগ্রাম দিবারাত্র চলিতেছে। দেবগণ কানীয়স্ অর্থাৎ অল্পসংখ্যক ও অসুরগণ জ্যায়স্ অর্থাৎ বহুসংখ্যক কেন? এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে যে, অধিকাংশ মানুষই চাহে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে পরিজ্ঞাত ঐহিক সুখসম্ভোগ ও তৎসাধনের অনুষ্ঠান করিতে। কারণ শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্মানুষ্ঠান স্বভাবতই আয়াসসাধ্য এবং সে বিষয়ে প্রবৃত্তিও অল্প। আবার জ্যায়স্ শব্দের বর্ষীয়ান্ ও কানীয়স্ শব্দের স্বল্পবয়োবিশিষ্ট অর্থ গৃহীত হইতে পারে। সাধারণতঃ মানবমনে কুপ্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়টাই স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু অন্তরস্থিত বিবেকের প্রভাবেই হউক অথবা জ্ঞানী ব্যক্তির সদুপদেশ শুনিয়াই হউক অথবা সজ্জনের কার্যাবলী দর্শনেই হউক মানবের সেই কুপ্রবৃত্তিসমূহ সময়ে সময়ে বশীভূত হইয়া

অন্তরে সাত্ত্বিক অর্থাৎ দেবপ্রবৃত্তির প্রাদুর্ভাব ঘটে। মানবমনে প্রথম কুপ্রবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়াই অসুরগণ জ্যায়ান্ আর সৎপ্রবৃত্তির পরে আবির্ভাব হয় বলিয়াই দেবগণ কনীয়ান্ মানবমনে দুই প্রবৃত্তির মধ্যে সর্বদা স্পর্দ্ধা অর্থাৎ সংগ্রাম চলিয়া থাকে। যখন সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির জয় হয় তখন ধর্মপ্রবৃত্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় ও তাহার ফলে প্রজাপতিত্ব লাভ পর্যন্ত উৎকর্ষ প্রাপ্তি সম্ভব হয়। অসুরগণের অর্থাৎ রাজসিক বৃত্তির জয় হইলে অধর্মের বাহুল্য ঘটে ও তখন স্থাবরত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত অধোগতি হয়। আর উভয়ের সমতা ঘটিলে মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

সৎ ও অসতের এবং শুভ ও অশুভের সংগ্রাম: আবার এই ব্রাহ্মণের আরও তিনটি মন্ত্র[১] 'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়'—এই ভাবেরই দ্যোতক। এখানে অসৎ বলিতে মৃত্যুকে বুঝাইতেছে। মৃত্যু শব্দদ্বারা স্বভাবজাত জ্ঞান ও কর্ম অভিহিত। ইহারা অধঃপতনের কারণ বলিয়া অসৎ। আবার সৎ এবং জ্যোতি হইতেছে অমৃত। শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্ম মৃত্যুভয় নিবারণের হেতু বলিয়া সৎপদবাচ্য।

আমরা দেখিলাম যে প্রজাপতির দুই প্রকার সন্তান দেবতা ও অসুর শুভশক্তি ও অশুভশক্তির প্রতীক। প্রত্যেক মানবের চিত্তেই এই দুই শক্তির সংগ্রাম অহরহ চলিতেছে। একে অপরকে পরাভূত করিতে সর্বদা সচেষ্ট। যাহার মধ্যে সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির প্রাধান্য বেশী সেই মানব দেবত্বে পরিণত হইয়া থাকে, আর রাজসিক প্রবৃত্তির বাহুল্য যাহার হৃদয়ে বেশী তাহাকে আমরা বলি অমানুষ পশু। সৎ অর্থ হইতেছে অমৃত। দেবশক্তিসম্পন্ন মানব সৎকর্ম করিয়া অমরত্ব লাভ করে। অসৎ অর্থ মৃত্যু। অসৎকর্মকারী লোককে মানুষ কখনও স্মরণ রাখিতে চায় না, সুতরাং অসৎকর্মকারী মৃত্যুলাভ করে। আবার মানবের অন্তরলোকে এই দুই শক্তির মধ্যে যেরূপ দ্বন্দ্ব চলে সেরূপ দ্বন্দ্ব বহির্জগতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা বাহ্যজগতেও দেখি সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত রাজসিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তির সংগ্রাম সতত বিদ্যমান। এই সংগ্রাম ভিন্নগুণসম্পন্ন এক ব্যক্তির সহিত অপর ব্যক্তিরও হইতে পারে। আবার কখনও এক ব্যক্তির

১। আচার্য শংকর তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—'এতানি তানি যজুংষি—' অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়েতি। ইহাতে প্রতীত হয় যে, ইহা তিনটি মন্ত্রেরই সমষ্টি ও যজুর্মন্ত্র।

সহিত একাধিক ব্যক্তির সংগ্রামে পর্যবসিত হইতে পারে। বর্তমান যুগেও দেখি রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এককভাবে সারাজীবন ধরিয়া সমাজের নানা অশুভ শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন।

দেবাসুরের সংগ্রাম—শ্রীশ্রীচণ্ডীতে : উপনিষদের এই দেবশক্তি ও অসুরশক্তির সংগ্রামের কল্পনা আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে পাই। আদ্যাশক্তি শ্রীচণ্ডী অথবা শ্রীদুর্গাকর্তৃক মহিষাসুরনিধন, শুম্ভনিশুম্ভবধ প্রভৃতি মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য বা দুর্গাসপ্তশতীর মূল উপজীব্য। অসুরকর্তৃক পরাভূত দেবতাগণের সম্মিলিত তেজঃপুঞ্জদ্বারা সৃষ্টা শ্রীদুর্গাই অসুর বধ করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। দুর্গা যে-শক্তিদ্বারা অসুরনিধন করিয়াছেন তাহা দেবগণেরই নিজস্ব শক্তি। অথচ এই শক্তি পূর্বে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অসুরগণ দেবগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, দেবগণের অন্তরলোকে যখন সাত্ত্বিক ও রাজসিক প্রবৃত্তির সংগ্রাম চলিতেছিল তখন তাঁহাদের অন্তরস্থিত রাজসিক-শক্তি সাত্ত্বিকশক্তিকে পরাভূত করে। সাত্ত্বিকশক্তিহীন দেবগণ তখন অসুর কর্তৃক পরাজিত হন। ইহার পর একশত বৎসর দেবগণের সহিত অসুরগণের প্রচণ্ড সংগ্রাম চলে। অবশেষে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতে বহির্গত তেজঃসমষ্টিদ্বারা সৃষ্টা শ্রীদুর্গাই অসুরগণকে বধ করিতে সমর্থা হন। ত্রিগুণাত্মিকা[১] দুর্গার পক্ষে কেবলমাত্র রজোগুণ-সম্পন্ন অসুরদিগকে বধ করা অতি সহজসাধ্য হইয়াছে। আবার এই সংগ্রামকে আমরা দেবগণের অন্তরস্থিত সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি ও রাজসিক প্রবৃত্তির

১। দেবতা মানব সকলের মধ্যেই রহিয়াছে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের মিশ্রণ। দেবগণের মধ্যে সত্ত্বগুণেরই আধিক্য, রজোগুণও যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। আর রহিয়াছে সামান্য পরিমাণে তমোগুণ। অসুরগণের মধ্যেও তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকিলেও তাহাদের মধ্যে রজঃ ও তমোগুণেরই প্রাধান্য। সত্ত্বগুণ স্বল্প পরিমাণে রহিয়াছে।

যোগদর্শনের সাধনপাদের অষ্টাদশ সূত্রে আছে—

"প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥"

প্রকাশস্বভাব সত্ত্ব, ক্রিয়াত্মক রজঃ, এদুভয়ের প্রতিরোধক অচলস্বভাব তমঃ—এতত্ত্রিতয়াত্মক ভূত ও ইন্দ্রিয়, ইহারা দৃশ্য এবং ইহারা সকলেই পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ প্রদানার্থ উদ্যত। তাৎপর্য এই যে, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতি ও তদুৎপন্ন যে কিছু ভূতভৌতিক—সমস্তই পুরুষের ভোগের ও অপবর্গের (মোক্ষের) নিমিত্তকারণ (প্রয়োজক)। উহারা অবিবেকীর ভোগ এবং বিবেকীর মোক্ষ প্রদানার্থ উদ্যত আছে।

সংগ্রামরূপে গ্রহণ করিতে পারি। সাধারণতঃ স্বভাবসিদ্ধ-অনুরাগমূলক কর্ম ও অনুমানলব্ধ জ্ঞানসাধ্য অনুষ্ঠানেই অধিকাংশের প্রবৃত্তি। এখানেও দেবগণের অন্তরস্থিত শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম ও জ্ঞানচিন্তাত্মক প্রবৃত্তির সহিত ঐহিক প্রয়োজন সাধক প্রবৃত্তির সংগ্রাম একশত বৎসর অর্থাৎ বহুকাল ধরিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু তৎকালে সত্ত্বগুণহীন দেবগণের প্রবল রাজসিকশক্তিসম্পন্ন অসুরগণের নিকট বারংবার পরাজয় ঘটে। অবশেষে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণ ও সকল দেবগণের সত্ত্ব ও রজোগুণের সম্মিলিত শক্তির নিকট তমোমিশ্র রজোগুণসম্পন্ন অসুরগণ পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। আর পুনরায় দেবগণের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাবল্য ঘটায় আবার তাঁহারা দেবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হন।

দেবাসুরের সংগ্রাম—কেনোপনিষদে : আবার কেনোপনিষদে উল্লিখিত একটি আখ্যায়িকা হইতে জ্ঞাত হই আসুরী সম্পদ্ আত্মশ্লাঘা বা অভিমান কিরূপে অধঃপতনের কারণ হইতে পারে। দেবতারা একবার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভাবিলেন যে এই জয় তাঁহাদের নিজেদের শক্তিবলেই সম্ভব হইয়াছে। আত্মশ্লাঘাপরায়ণ দেবতাদের দর্পচূর্ণ করিবার জন্য ব্রহ্ম যক্ষের বেশে তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যক্ষ দেবতাদের সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিলে অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ তাহা দগ্ধ করিতে অথবা উড়াইয়া দিতে সমর্থ হইলেন না। এমন সময় অতি শোভনরূপসম্পন্না দেবী হৈমবতী আবির্ভূতা হইয়া দেবতাদের নিকট যক্ষের যথার্থ পরিচয় ব্যক্ত করিলেন। তখন দেবতারা উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে ব্রহ্মের শক্তিবলে শক্তিমান্ হইয়াই তাঁহারা যুদ্ধে জয়লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিজস্ব কোন শক্তিবলে নয়। এভাবে তাঁহাদের হৃদয় হইতে অভিমান দূরীভূত হইলে তাঁহারা স্ব স্ব শক্তি ফিরিয়া পাইলেন।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের সংগ্রাম : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কথিত দৈবী ও আসুরী সম্পদ্ বিভাগ হইতে আমরা মানুষের প্রবৃত্তিযোগ্য ও প্রবৃত্তি অযোগ্য বিষয়গুলি জানিতে পারি। কঠোপনিষদেও দেখিতে পাই যম নচিকেতাকে আত্মবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদানকালে বলিয়াছেন—

> শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
> শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে, প্রেয়ো মন্দো
> যোগ-ক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ কঠোপনিষৎ, ১।২।২

যমকর্তৃক উক্ত এই শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ দেবশক্তি ও অসুর শক্তি ব্যতীত কিছুই নহে। কষ্টসাধ্য শ্রেয়োলাভ সাধারণ জীবের কাম্য হইতে পারে না। তাহাদের একান্ত কামনার ধন হইতেছে তাহা যাহা দ্বারা যম নচিকেতাকে প্রথমেই প্রলোভিত করিতে চাহিয়াছেন—

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব বহূন্, পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব, স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥
কঠোপনিষৎ, ১।১।২৪

তবে তাহাদের অন্তরাত্মা নিশ্চয়ই কেবলমাত্র অর্থদ্বারা তৃপ্ত হয় না। তাই দেখি অতি বিত্তশালী সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিও জীবনে সুখী নহে। তাহাদের হৃদয়েও নিঃসন্দেহে চলে শ্রেয়োলাভ ও প্রেয়োলাভের অবিশ্রান্ত সংগ্রাম। এই সংগ্রামে অবশ্যই প্রেয়ের আকর্ষণই দুর্বার। শ্রেয়োলাভের জন্য চাই তপস্যা, ধৈর্য, অলোভ, অহিংসা প্রভৃতি দৈবী সম্পদ্। ভগবৎ-কৃপা ও পূর্বজন্মের পুণ্যার্জিত কর্মফল ছাড়া শ্রেয়োলাভ সম্ভব নহে। কারণ—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।
কঠোপনিষৎ, ১।৩।১৪

রামায়ণে উপনিষদে আদর্শের ক্রমবিকাশ

একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে আমরা রামায়ণ মহাকাব্যকে রূপক বলিতে পারি। দেব অর্থাৎ সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি ও রাক্ষস অর্থাৎ আসুর-প্রবৃত্তির সংগ্রামের রূপককাহিনী রামায়ণ। এখানেও চলিয়াছে দৈবী সম্পদের সহিত আসুরী সম্পদের সংগ্রাম। বাল্যকাল হইতেই রাম রজোগুণসম্পন্ন রাক্ষসদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। রামকে দেবশক্তি ও রাবণকে আসুরীশক্তির প্রতীকরূপে ধরা যাইতে পারে। প্রথম দিকে আসুরী শক্তি অর্থাৎ রাবণেরই জয় হইয়াছে। কিন্তু রামের সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির নিকট রাবণের আসুরীশক্তি শেষ পর্যন্ত দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই, সমূলে তিনি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আসুরীশক্তিকে পরাভূত করিয়া দেবশক্তির প্রতিষ্ঠার নিমিত্তই রামের এই ধরাধামে আবির্ভাব। কবি বাল্মীকি দেখাইয়াছেন যে অশুভশক্তির যত প্রাবল্যই থাকুন না কেন তাহার পরাজয় সুনিশ্চিত। অশুভশক্তির প্রতীক রাবণের ত্রাসে ত্রিভুবন কম্পমান ছিল, সেই রাবণ সামান্য মানব সাত্ত্বিকগুণসম্পন্ন রামকর্তৃক অতি সহজেই

অতি সহজেই বিধ্বস্ত ও পরাভূত হইয়াছেন। রাম ক্ষুদ্র মানব হইলেও তাঁহার মধ্যে দেবপ্রবৃত্তির আধিক্য আবার অমিতশক্তিধর রাবণ দেবজয়ী হইলেও তাঁহার মধ্যে আসুরীশক্তির প্রাধান্য। সুতরাং বাহ্যদৃষ্টিতে প্রথম-দিকে রাবণের জয় সূচিত হইলেও তাঁহার কার্যাবলীর মধ্যেই অধঃপতনের বীজ লুক্কায়িত ছিল। শুভশক্তির নিকট অশুভশক্তির যথাকালে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

সুবর্ণলঙ্কার অধীশ্বর রাবণের ঐশ্বর্যের সীমাপরিসীমা নাই। যুদ্ধে তিনি যমসহ সকল দেবগণকেই পরাজিত করিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহার দম্ভের অন্ত ছিল না। দেব, দানব, যক্ষ প্রভৃতি হইতে তাঁহার মৃত্যু হইবে না—রাবণ এই বর লাভ করিলেন ব্রহ্মার নিকট হইতে। বানর অথবা মানুষকে তিনি ধর্তব্য মনে করেন নাই। তাহার ফল হইয়াছিল বিষময়। ব্রহ্মার বলে বলীয়ান্, ঐশ্বর্য ও পরাক্রম মদে মত্ত রাবণ শুধুমাত্র দেবগণ ও নৃপতিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি কুলবধূ, অপ্সরা, সতীসাধ্বী বহু নারীকেও হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। ত্রিভুবনে কাহারও নিকট বাধাপ্রাপ্ত না হওয়ায় তাঁহার দর্প এরূপ তুঙ্গে উঠিয়াছিল যে তিনি লক্ষ্মীস্বরূপা সতীসাধ্বী সীতাকে হরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মারীচ তাঁহাকে রামের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত করিবার বহু চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অভিমান ও অজ্ঞানের দ্বারা অন্ধ রাবণ মারীচের কল্যাণপ্রদ উপদেশ তুচ্ছ করিয়াছেন। সীতার তিরস্কারকে করিয়াছেন অবজ্ঞা। নিজ ভ্রাতা বিভীষণকে মনে করিয়াছেন পরম শত্রু। এমন কি রাম সীতাকে প্রত্যর্পণের নিমিত্ত অনুরোধ জানাইয়া হনুমান্‌কে পাঠাইলে তাঁহার লাঙ্গুলে অগ্নিসংযোগ করিয়া চরম অবমাননা করিয়াছেন। সামান্য বানর হইয়া একাকী লঙ্কাতে তাণ্ডবলীলা সৃষ্টি করিলেও রাবণের বোধোদয় হয় নাই যে যাঁহার দূত এত শক্তিমান্ তিনি স্বয়ং কত অপরিমেয় শক্তিধর হইতে পারেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্ দর্প, দম্ভ, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞান প্রভৃতি যেসকল আসুরী সম্পদের কথা বলিয়াছেন রাবণচরিত্রে সকলগুলি পূর্ণভাবে বিদ্যমান। অত্যাচারপরায়ণ রাবণের কৃতকর্মের জন্য কোন অনুশোচনা নাই, বিবেকের দংশন অথবা প্রবৃত্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব নাই। প্রতিটি অন্যায় আচরণকে রাবণ সঙ্গত ও উচিত কর্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার বৃহদারণ্যকোপনিষদে উল্লিখিত প্রত্যেকের হৃদয়ে যে সাত্ত্বিক ও রাজসিক প্রবৃত্তির সংগ্রাম অহরহ চলিতেছে তাহা

তাঁহার অন্তরে একেবারেই অনুপস্থিত। সুতরাং রাবণ যে আসুরী প্রবৃত্তির প্রতীক ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিতে পারে না।

এখন দেখা যাউক রাম দেবশক্তির প্রতীক কি না? আদিকবি বাল্মীকি তাঁহার আশ্রমে আগত নারদকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নর সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন রাখিয়াছেন—এই জগতে এমন কোন মনুষ্য জন্মিয়াছেন কি যিনি ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাক্য, দৃঢ়বাক্য, চারিত্র্যযুক্ত, সর্বভূতের হিতে রত, বিদ্বান্, আত্মবান্, জিতক্রোধ, দ্যুতিমান্, অনসূয়ক এবং অন্যান্য সদ্গুণসম্পন্ন? তাঁহার কথার উত্তরে নারদ জানাইলেন যে পৃথিবীতে এরূপ একজনই মানব আছেন এবং তিনি হইতেছেন দশরথ-হৃদয়নন্দন রামচন্দ্র।

রামের জীবনে বহুবার শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ একসঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রতিবারই তিনি অবিকৃতচিত্তে শ্রেয়ঃকেই গ্রহণ করিয়াছেন। রাজ্যাভিষেকের মুহূর্তে তিনি বননির্বাসনের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ইহার প্রতিবাদ করিতে পারিতেন, ইহার জন্য ক্রোধ ও ক্ষোভ দুইই প্রকাশ করিতে পারিতেন, পিতা ও বিমাতাকে দোষারোপ করিতে পারিতেন। রাম এই সকল কিছুই করিলেন না। বরঞ্চ গতব্যথ রাম কৈকেয়ীকে বলিলেন—'নাহমর্থপরো দেবি লোকমাবস্তুমুৎসহে।' আমি স্বার্থপর হইয়া এই সংসারে বাস করিতে ইচ্ছা করি না।

অথবা রামকর্তৃক দুই দুইবার সীতাপরিত্যাগের ব্যাপার। সীতা-পরিত্যাগ কতটা সঙ্গত অথবা অসঙ্গত তাহা ভিন্ন প্রশ্ন। যে সীতা উদ্ধারের জন্য তিনি এত কাণ্ড করিয়াছেন সেই সীতাকে প্রাপ্তিমাত্র পরিত্যাগ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। আর দ্বিতীয়বার তিনি একজন মাত্র প্রজার কথা শুনিবামাত্র স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়াছেন। যদি তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতেন তবে অন্য কথা ছিল। সীতা ব্যতীত অন্য কোন নারীকে তিনি অন্তরে স্থান দেন নাই। তিনি সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিমা যজ্ঞস্থলে স্থাপন করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন। নিজে দুঃখবরণ করিয়া প্রজাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিয়াছেন। রাম নচিকেতার ন্যায় জানিতেন 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।' এজন্য পঞ্চবিংশতি বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাঁহাকে একটির পর একটি দুঃখ বরণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু শ্রেয়ের পথ হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই। সুতরাং রাম যে দেবশক্তির প্রতীক ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

কেবল রামচন্দ্র নহেন রামায়ণের অধিকাংশ চরিত্রই প্রেয়ঃ অপেক্ষা শ্রেয়ঃকে গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছেন। রামপিতা দশরথের কথাই ধরা যাউক। রাম দশরথের সর্বাপেক্ষা প্রিয় পুত্র। দশরথ সেই প্রাণপ্রতিম প্রিয়পুত্রকে ত্যাগ করিয়াছেন সত্যরক্ষার জন্য। তিনি ইচ্ছা করিলে কৈকেয়ীর বাক্য রক্ষা না করিলেও পারিতেন। আর তাহা করিলে কৈকেয়ী ব্যতীত রাজ্যের সমস্ত লোকই সুখী হইত ও দশরথকে সমর্থন করিত। তাহা ছাড়া রাজারা ত অনেক সময় স্বেচ্ছাচারিতা করিয়াই থাকেন। প্রজাবৃন্দের সমর্থন না থাকিলেও রাজক্ষমতাবলে তিনি রামকে বনবাসে না পাঠাইতেও পারিতেন। তিনি জানিতেন প্রিয়পুত্রকে হারাইয়া জীবিত থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। নিজের প্রাণাপেক্ষা সত্যরক্ষা করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন ও শ্রেয়ঃ রক্ষার্থে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন।

দশরথের দ্বিতীয় পুত্র সকলের সন্দেহভাজন ভরতের চরিত্রেও আমরা একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। এই রাজপুত্রটির নিকট রাজলক্ষ্মী স্বেচ্ছায় আসিয়া ধরা দিয়াছিলেন। কিন্তু ভরত তাঁহাকে অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যে অবস্থান করিয়াই সন্ন্যাসজীবন পালন করিয়াছেন। অন্তরে গভীর বৈরাগ্য না থাকিলে ইহা কখনও সম্ভবপর ছিল না। ভোগ্যবস্তুতে মানুষের তৃপ্তি নাই তাহা এই সন্ন্যাসব্রতধারী রাজপুত্র অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের কথাও বলা যাইতে পারে। লক্ষ্মণ পিতার নিকট হইতে রাজ্যত্যাগের কোন আদেশ প্রাপ্ত হন নাই। আর বনবাসের জীবন অতি সুকঠোর ও কষ্টদায়ক। সুতরাং রাজপুত্র লক্ষ্মণের রাজ্যভোগ ছাড়িয়া বনে যাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। লক্ষ্মণ অর্জিত সম্পদ্ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বনবাসের দুঃখকে পরম বরণীয় ও রমণীয় মনে করিয়াছেন। লক্ষ্মণের নিকট রাম হইতেছেন পরম পুরুষার্থ। রামের সুখসম্পাদন ও রামের ক্ষেমলাভ তাঁহার নিকট চরমপ্রাপ্তি। সেই চরমপ্রাপ্তির কাছে নগরীর বিত্তবৈভব, বিলাস, আনন্দ সকল প্রেয়ঃ পদার্থই অতি নগণ্য। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' এই উপনিষদুক্ত বাণীই সার্থক হইয়াছে এই রাজপুত্রের জীবনে।

আবার দেবদ্বেষী ও ঋষিবিরোধী রাক্ষসকুলেও এমন একটি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই যিনি প্রবৃত্তিতে ও চিন্তাধারায় রামলক্ষ্মণেরই সগোত্র। তিনি হইতেছেন লঙ্কাধীশ রাবণের কনিষ্ঠভ্রাতা বিভীষণ। তিনি রাবণের মঙ্গল-

সাধন করিতে গিয়া রাবণেরই অপ্রিয়ভাজন হইলেন; সত্যধর্মা ও ধর্মপরায়ণ বিভীষণের পক্ষে অন্যায়কারী রাবণকে সমর্থন করা অসম্ভব ছিল। রাবণ যখন তাঁহার সদুপদেশে কর্ণপাত করিলেন না তখন তিনি বাধ্য হইয়াই ধর্মাত্মা রামের শরণ লইলেন। নানা বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও ধর্মাশ্রয়ী বিভীষণ রামের পক্ষে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। রাজোগুণসম্পন্ন জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাবণকে সত্ত্বগুণসম্পন্ন বিভীষণের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিশ্চিত আশ্রয় ছাড়িয়া শ্রেয়ের অন্বেষণে তিনি শত্রু রামের শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে প্রথমে লক্ষ্মণজননী সুমিত্রার কথাই আলোচনা করা যাউক। সুমিত্রা দশরথের দুই পুত্রের জননী। কিন্তু তিনি পুত্রসুখ কোন দিনই লাভ করেন নাই। বনযাত্রার জন্য প্রস্তুত মুনি-বেশধারী লক্ষ্মণ কৌশল্যাকে প্রণাম করিবার পর সুমিত্রাকে প্রণাম করিতেছেন। সুমিত্রা স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়াই স্বীয়পুত্রকে রামের সহিত বনগমনের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। সুমিত্রা যদি সাধারণ জননী হইতেন তবে নিশ্চয়ই স্বীয়পুত্রকে বিনা কারণে এরূপ বনবাসে গমন করিতে সম্মতি দিতেন না। সুমিত্রা রামের অনুগমন করাই পুত্রের পক্ষে শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন। সেজন্য অন্তরের দুঃখভার সহিয়া রোদন করিতে করিতে পুত্রকে বননির্বাসনের অনুমতি দান করিয়াছেন। আর দ্বিতীয় পুত্র শত্রুঘ্ন ত বার বৎসর ধরিয়া ভরতের সহিত কেকয়প্রদেশে অবস্থান করিয়াছেন। বার বৎসর পর অযোধ্যায় ফিরিবার পরও অযোধ্যা হইতে দূরে নন্দিগ্রামে ভরতের সহিত বাস করিয়াছেন। ইহাতেও সুমিত্রাকে কখনও ক্ষুব্ধ হইতে দেখি নাই। সুতরাং দেখিতে পাই সুমিত্রাজননী কখনও ক্ষুদ্র স্বার্থ ও ক্ষুদ্র সুখের জন্য ব্যস্ত ছিলেন না।

সীতা রাজর্ষি জনকের কন্যা ও দশরথের অতি আদরণীয়া জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ ও সকলগুণান্বিত রামের প্রাণপ্রিয়া। এই সীতা জীবনের অষ্টাদশ বৎসর পর্যন্ত জানিতেন না দুঃখ কাহাকে বলে। রাজপুত্র রামের সহধর্মিণী সীতা রামের রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে রাজমহিষীর সম্মান লাভ করিবেন আগামী কল্য প্রভাতে। তাঁহার হৃদয় আনন্দে উত্তেজনায় চঞ্চল অধীর। রাত্রি প্রভাতেই বননির্বাসনের দুঃখসংবাদ বহন করিয়া আনিলেন রামচন্দ্র। শুনিবামাত্র কৌশল্যা লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলেই মর্মাহত। সীতার কোন অভিযোগ নাই, দঃখও নাই। বনবাসে প্রতি পদে বিঘ্ন, জীবন অতি দুর্বহ ও কঠোর, সেখানে নাই কোন নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য। তৎসত্ত্বেও

সীতা রামের সহিত বনগমনে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। রাজপ্রাসাদের চির অভ্যস্ত ভোগবিলাস তাঁহার কাম্য নহে। তিনি রামের সঙ্গলাভকেই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন, তাহাতে যত দুঃখই বরণ করিতে হউক না কেন। সীতার জীবনে যখন শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়ই উপস্থিত তখন তিনি শ্রেয়ঃকেই বরণ করিয়াছেন। ধরিত্রীর মত ধৈর্যশীলা সীতার পরবর্তী জীবনে দুঃখের পর দুঃখ আসিয়াছে। এই দুঃখভারাক্রান্ত জীবন তিনি শান্তচিত্তে অতিবাহিত করিতে পারিতেন না যদি তাঁহার প্রেয়েব প্রতি কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকিত।

আরও একটি চরিত্র সম্বন্ধে না বলিলে বক্তব্য সম্পূর্ণ হইবে না, তাহা হইতেছে লঙ্কেশ্বর রাবণের পত্নী মন্দোদরীর চরিত্র। মন্দোদরীর চরিত্র রাবণের সম্পূর্ণ বিপরীত। মন্দোদরীর স্বামী রাবণ সারাজীবন ধরিয়াই পাপকার্য করিয়াছেন। মন্দোদরী স্বামীর পাপাচরণ কখনও সমর্থন করেন নাই। সদা সর্বদা দম্ভপরায়ণ স্বামীর পাপকার্য দর্শন করিয়াও তিনি কিভাবে আত্মস্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হই। মন্দোদরীর হৃদয়ে দৈবী সম্পদেরই আধিক্য বর্তমান ছিল। সুতরাং জীব যে পরিবেশেই অবস্থান করুক না কেন তাহার প্রবৃত্তির কোন পরিবর্তন হয় না। ইহা তাহার অন্তরের নিজস্ব সম্পদ্। জন্ম জন্মান্তরের সুকর্মের ফলেই মানুষ এই প্রবৃত্তি লাভ করে।

ইহাতে আরও একটি চরিত্র সংযোজিত হইতে পারে তাহা হইতেছে রাক্ষসী ত্রিজটার। রাক্ষসী ত্রিজটার সঙ্গিনীগণ সকলেই বিকটাকৃতি নিষ্ঠুরা রাক্ষসী। তাহারা সকলেই সীতাকে নানাভাবে ভীতিপ্রদর্শন করিয়া রাবণের বশীভূত করিতে ব্যস্ত। একমাত্র ব্যতিক্রম ত্রিজটা। তিনি সীতাকে যথেষ্ট স্নেহ ও সমীহ করিতেন তাহা তাঁহার বাক্যালাপ হইতেই বোঝা যায়। ইন্দ্রজিতের বাণে রামলক্ষ্মণ মৃত মনে করিয়া সীতা বিলাপ করিতে থাকিলে ত্রিজটাই রামলক্ষ্মণ জীবিত আছেন বলিয়া সীতাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। রাবণের সকল নিষ্ঠুর প্রবৃত্তিসম্পন্না রাক্ষসীদের মধ্যে থাকিয়াও ত্রিজটা সাত্ত্বিকগুণসম্পন্না।

সুতরাং শ্রেয়ের পথের সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় আদিকবি বাল্মীকি রচিত এই রামায়ণগ্রন্থে। ইহা যে একটি উচ্চ পর্যায়ের কাব্য এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নাই। যাহার জন্মে কবি শব্দটির[১]

১। 'জাতে জগতি বাল্মীকৌ কবিরিত্যভিধাভবৎ।' —বহুস্থলে উদ্ধৃত

সৃষ্টি হইল এবং যিনি কাব্য নামক এক নবীন শাস্ত্রের জনয়িতা তাঁহার রচিত কাব্য যে উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থরূপে পরিচিত হইবে ইহা অবধারিত সত্য। কিন্তু রামায়ণকে কেবলমাত্র কাব্য হিসাবে বিচার করা চলে না, ইহা একখানি দার্শনিক গ্রন্থরূপেও পরিচিত হইবার যোগ্য।

দর্শনশাস্ত্র ও রামায়ণ

বিভিন্ন, আস্তিক দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যে মতভেদ আছে তাহা সুবিদিত। এই মতভেদ সত্ত্বেও কতকগুলি বিষয়ে যে চিন্তার ঐক্য রহিয়াছে তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায়। রামায়ণে নাস্তিকতার কোন অবকাশ নাই। রামের প্রতি জাবালির লোকায়ত মতপ্রদর্শন কেবলমাত্র পূর্ব-পক্ষরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা রামের পরবর্তী সিদ্ধান্তসূচক বাক্যগুলির দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হয়। ইহা জাবালির সুস্পষ্ট স্বীকৃতির দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হয়। আস্তিক দর্শনগুলিতে সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব নির্দ্বিধায় অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এই পরমেশ্বর সাকার অথবা নিরাকার, সগুণ অথবা নির্গুণ, সধর্মক অথবা নির্ধর্মক এরূপ পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত দর্শন-প্রস্থানগুলির মধ্যে পরিস্ফুট হইলেও পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে কাহারও কুণ্ঠা নাই। সাংখ্যদর্শন ঈশ্বর স্বীকার করে না বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে কিন্তু পরম অস্তিত্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ স্বীকারে তাহাদের কোন আপত্তি নাই। মীমাংসক স্ব-সিদ্ধান্ত করিবার জন্য ঈশ্বরকে বর্জন করিয়া চলিতে পারেন কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করেন না ইহা দৃঢ়তার সহিত বক্তব্য উপস্থাপিত করা যায় কিনা এই শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি ভালভাবেই জানেন। পরমেশ্বরকে ব্রহ্ম, পুরুষ প্রভৃতি যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন তিনি যে যাবতীয় দোষের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট এবিষয়ে সকলেই একমত। সেই পরমতত্ত্ব ব্রহ্মস্বরূপ জানিতে পারিলে দুঃখ থাকে না, অপরিচ্ছিন্ন সুখ-লাভ হয়,. ইহা সকল দার্শনিক স্বীকার করিলেও সেই ব্রহ্মজ্ঞান কি নিজেকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে জ্ঞান অথবা নিজেকে সখা বলিয়া জানা, অথবা নিজেকে তাঁহার অনুগামী বা দাসরূপে জানিলে দুঃখমুক্তি হয় কিনা ইহা লইয়া মতভেদ অবশ্যই আছে। যে ব্যাখ্যাকার যে দার্শনিক সম্প্রদায়ের অনুগামী তিনি সেইভাবেই বিচার করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু দার্শনিক জিজ্ঞাসার মূলসূত্রটিকে বুঝিতে কোন বিবাদ বা তজ্জন্য

রামায়ণগ্রন্থ বোধে কোন অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করা যায় না। যেহেতু এ গ্রন্থ সর্বজনীন। কোন বিশেষ দর্শন-সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নহে।

মনুষ্যজীবনে চতুর্বর্গ অবলম্বনের উপদেশ শাস্ত্রের সর্বত্র সুপ্রকট। এই চতুর্বর্গের মধ্যে মোক্ষ পরম প্রাপ্তব্য এই বিষয়ে কোন বিরোধ নাই। প্রথম তিনটি অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষের সহায়ক কিনা এবং সহায়ক হইলে কোন স্তর পর্যন্ত তাহা সহায়ক হইয়া থাকে, ইহাতে কিঞ্চিৎ বিবাদ অবশ্যই আছে। এই চতুর্বর্গের মধ্যে ধর্মকে প্রথমস্থানে রাখিলেও ধর্মই যখন পূর্ণাঙ্গস্বরূপে অনুষ্ঠিত এবং অবলম্বিত হয় তখন তদ্দ্বারা অর্থ ও কাম সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, এমন কি মোক্ষ পর্যন্ত অধিগম অসম্ভব নয় এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও শাস্ত্রপাঠে ব্যাঘাত হয় না। পুনরায় ধর্ম বলিতে কর্মকে বুঝিতে হইবে কিনা, কর্ম অবিদ্যক হওয়ায় তাহা বিদ্যালভ্য মোক্ষের বিরোধী এরূপে অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে বিচার করা যাইতে পারে। ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে ফলাসঙ্গবর্জিত কর্মের অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং শুদ্ধচিত্তে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সম্ভব। অদ্বৈতবাদীর এরূপ সিদ্ধান্ত কর্মের স্বীকৃতির স্পষ্ট অভিব্যক্তি বলা যায়। নিষ্কামকর্ম কর্মমার্গের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইলেও কর্মাধিকারী শাস্ত্রবিহিত শুভকর্ম অবশ্যই করিবেন এবং তজ্জন্য শুভকর্মের ফল কখনও ইহজন্মে, কখনও পরবর্তী কোন জন্মে ভোগ করিতেই হইবে। কামনাপূর্বক অনুষ্ঠিত কর্মের শুভাশুভ ফল হইতে মনুষ্য নিজেকে কখনও বিমুক্ত করিতে পারে না। কর্মফল ভোগ করিবার জন্য বিবিধ শরীরগ্রহণ শাস্ত্রের অমোঘ সিদ্ধান্ত। কর্ম অত্যন্ত গহন স্বভাব হওয়ায় কোন্ কর্ম কোন্ সময়ে ফলোন্মুখ হইবে তাহা বলা যায় না। ফলোন্মুখ কর্মগুলি সম্মিলিত হইয়া একটি জীবনের সূচনা করে এবং সেই জীবনে ঐ কর্মগুলির ফলভোগ অনিবার্য। সঞ্চিত কর্মগুলি এখনও ফলোন্মুখ না হওয়ায় ভবিষ্যতে কখনও ফলদানে সমর্থ হওয়ার জন্য নির্দিষ্টকালের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে। অনন্ত কাল সেই কর্মগুলিকে যথাসময়ে পরিপক্ব করিয়া যখন ফলদানে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহা অমোঘশক্তি লইয়া প্রাণিজীবনে এরূপ বিচিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করে যে তাহার অন্য কোন ব্যাখ্যা দিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে বিধির বিধান, নিয়তির প্রভুত্ব, দৈবের শক্তি প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করিয়া মানুষ কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে চেষ্টা করে। কিন্তু দৈব অবিবেচক নয়, তাহা অহেতুকও নয়, তাহা স্বকৃতকর্মের কালজনিত পরিপক্ব অবস্থান। এই কালের শক্তিতে বিমূঢ় হইয়া কালকে ঈশ্বর পরমেশ্বর প্রভৃতি শব্দে অভিহিত

করা হয়। কাল অনাদি, অনন্ত তাহার গ্রাস হইতে কাহারও মুক্তি নাই। জীবন-যৌবন চলিয়া যায় কিন্তু কাল স্থির হইয়া রহিয়াছে, ইহার কোন অবসান নাই। ইহা ভূরিরেতাঃ[১] বলিয়া মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ইহাকে বিশেষিত করিয়াছেন। ইহা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া ইহা কে পরমাত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপ বলিতে বেদান্তীর কোন আপত্তি নাই।

কালের করাল গ্রাস হইতে যেমন কোন প্রাণীর পরিত্রাণ নাই তেমনই জড়পদার্থেরও অব্যাহতি থাকিবে না, ইহা বলাই বাহুল্য। বৃন্তাগ্রে দৃশ্যমান মনোরম কুসুমটি কালের প্রভাবেই কিছুক্ষণ পরে শুষ্ক ও পরে বৃন্তচ্যুত হইয়া যায়। দৃঢ়ভিত্তিক গৃহ কয়েকবর্ষ পরে জীর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হয়, জননী জঠর হইতে জন্মলাভ করিয়া কাল-প্রভাবেই সেই জননীকে হারাইতে হয়। পিতামাতা, পুত্রকন্যা, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের নিবিড়তা অনুভব করিয়াও কালের-প্রভাবেই সহসা বিচ্ছেদ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। প্রতিনিয়তই অসংখ্য মানুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ যেরূপ মৃত্যুর কবলে নিপতিত হইতেছে সেরূপ জাগতিক সকল নির্জীব পদার্থও ক্রমশঃ বিকারগ্রস্ত হইয়া ক্ষীণ হইতে হইতে অবশেষে বিনাশদশায় উপনীত হয়। পর্বতও চিরন্তন নয়, সাধারণ ঘটপটমঠাদির ত কথাই নাই। এজন্য কেহ জগৎকে নশ্বর বলিয়া থামিয়াছেন, কেহ বা এই নশ্বরত্বকে অতি তুচ্ছজ্ঞানে কাল্পনিক বলিয়া ইহার মর্যাদাকে আরও হীনপর্যায়ে অধঃপাতিত করিয়াছেন। সাধারণ মানুষ জগৎকে জগৎরূপে দর্শন করিয়া সত্য বলিয়া মানিয়া লইবে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি জগৎকে নশ্বর বলিবে। ক্রমশঃ সোপানারোহণ ন্যায়ে এই জগৎকে ক্ষণভঙ্গুর, মিথ্যা, অলীক বলিয়া নানা বিশেষণে বিশেষিত করার দার্শনিক প্রয়াস শাস্ত্রে বিভিন্ন আচার্যগণের দ্বারা কীর্তিত হইয়াছে।[২]

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার উৎস শ্রুতি। শ্রুতির মধ্যে আবার প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে উপনিষৎ। উপনিষৎকে শ্রুতিশিরঃ[৩] বলা হইয়া

১। কালো অশ্বো বহতি সপ্তরশ্মিঃ সহস্রাক্ষো অজরো ভূরিরেতাঃ।
তমা রোহন্তি কবয়ো বিপশ্চিতস্তস্য চক্রা ভুবনানি বিশ্বা॥ অথর্ববেদ ৫৩৷১

২। তুচ্ছানির্বচনীয়া চ বাস্তবী চেতি সা ত্রিধা।
একা মায়া ত্রিভির্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ॥ অদ্বৈতরক্ষা, ২৩ পৃঃ

৩। তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি॥
শ্বেতাশ্বেতরোপনিষৎ ১৷১৫

থাকে। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য সকল শাস্ত্র উপনিষদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত এবং চিন্তাজগতে বস্তুতঃ ইহারা উপনিষৎকেই জীবনরসরূপে গ্রহণ করিয়াছে। এজন্য রামায়ণের দার্শনিক ভাবধারার বিশ্লেষণ করিতে গেলে উপনিষদের সহিত তুলনামূলক বিচার আবশ্যক হইয়া পড়ে। এজন্য বিভিন্ন চিন্তার মূলসূত্রের সহিত উপনিষদের সাদৃশ্য স্থলে স্থলে উদ্ধৃতিপূর্বক উপন্যস্ত হইয়াছে।

রামায়ণে উপনিষদ্ ও দর্শনের ভাবধারা

রামায়ণের সর্বত্র—আখ্যানে, উক্তি-প্রত্যুক্তিতে, উপদেশে, স্তবস্তুতিতে দার্শনিক ভাবধারা পরিস্ফুট। তাহা কখনও স্থূলভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, কখনও সূক্ষ্মভাবে। দার্শনিক চিন্তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত নিম্নলিখিত পর্যায়ে শ্লোকাবলীকে বিভক্ত করা চলে।—

(১) ব্রহ্মস্বরূপ, পরমেশ্বর

(২) নিষ্কাম কর্ম, বিহিত কর্ম, শুভ কর্ম, ঈশ্বরার্পণ কর্ম, কর্মফল অপরিহার্য

(৩) জগতের মিথ্যাত্ব, জগতের নশ্বরত্ব

(৪) কালই পরমেশ্বর, কালের প্রভাব, নিয়তি, দৈব, বিধি।

এই চতুর্বিধ পর্যায়ে বিভক্ত দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত আখ্যানভাগের সামঞ্জস্য বিহিত আছে এবং এখানে সেভাবে ঐ পর্যায়ের চিন্তাধারাকে উপস্থাপিত করা হইতেছে। প্রতীকরূপে কেবল কতকগুলি শ্লোকই এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অসংখ্য সমজাতীয় শ্লোক উদ্ধৃত করা যায় না এবং তাহা করা এক দৃষ্টিতে নিষ্প্রয়োজনও বটে।

ব্রহ্মস্বরূপ, পরমেশ্বর

রামায়ণ মহাকাব্যে উপনিষদের মন্ত্রসমূহের সমপর্যায়ের বেশ কিছু শ্লোক দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ আদিত্যহৃদয় স্তোত্রে বর্ণিত সূর্যদেবের ও ব্রহ্মাকর্তৃক রামের স্তবে বর্ণিত রামের সহিত উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্মের তথা পরমেশ্বরের প্রচুর সাদৃশ্য বিদ্যমান। ইহা ব্যতীত বসিষ্ঠ, সুমিত্রা বা ভরতের উক্তিতেও এই জাতীয় শ্লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। ইক্ষ্বাকুবংশের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মার স্বরূপ সম্বন্ধে বসিষ্ঠ বলিয়াছেন যে আকাশপ্রভব ব্রহ্মা হইতেছেন শাশ্বত, নিত্য ও অব্যয়। কঠোপনিষদে আছে—অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ। ১।২।১৮।

রামের নির্বাসনে শোকবিধুরা কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিয়া রামের স্বরূপ সম্বন্ধে সুমিত্রা বলিয়াছেন যে রাম সূর্যেরও সূর্য, অগ্নিরও অগ্নি, প্রভুরও প্রভু, শ্রীরও শ্রী, কীর্তিরও কীর্তি, ক্ষমারও ক্ষমা। ইহার সহিত কেনোপনিষৎ ও বৃহদারণ্যকোপনিষদের দুইটি শ্লোকের সাদৃশ্য বিদ্যমান—

> শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
> বাচো হি বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
> চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
> প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ কেনোপনিষৎ, ১।২

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ। তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৪।১৮

কঠোপনিষদে রহিয়াছে—

> ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
> তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ কঠোপনিষৎ, ২।২।১৫

অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনে অস্বীকৃত রামের জন্য ভরত বিলাপ করিতে থাকিলে রাম তাঁহাকে সংসারের নশ্বরতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া ভরতকে নিজের জন্য শোক প্রকাশ করিতে বলিলে ভরত জানাইলেন যে রামের মত আত্মতত্ত্বজ্ঞব্যক্তির নিকট সুখদুঃখ সমভাবে প্রতিভাত। তাঁহাকে দুঃখ ব্যথিত করিতে পারে না, সুখও আনন্দ দান করিতে পারে না। কারণ যেরূপ জীব মৃত হইলে তাহার নিজের শরীরের কোন প্রয়োজন থাকে না, সেরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞব্যক্তি জীবিত থাকাকালেও নিজ শরীরের সহিত সম্বন্ধরহিত থাকেন। অবিদ্যমান বস্তুর প্রতি মানুষের যেরূপ রাগদ্বেষ থাকে না, সেরূপ বিদ্যমান বস্তুর প্রতিও তত্ত্বজ্ঞব্যক্তির কোনরূপ আগ্রহ অনাগ্রহ থাকে না।

তিলককার বলিয়াছেন—মৃতদেহ পরিত্যাগকারী আত্মার যেরূপ দেহ ও পুত্রাদির সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না, সেরূপ জীবিতকালেও স্থিতপ্রজ্ঞ-ব্যক্তি তাঁহার দেহ ও স্ত্রীপুত্রাদির সহিত সম্বন্ধহীন হইয়া থাকেন। কারণ, নিত্য, শুচি, সুখী ও চৈতন্যযুক্ত আত্মার সঙ্গে অনিত্য, অশুচি, দুঃখপূর্ণ

জড়দেহের[১] কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কর্মফল মানুষকে জীবিত অবস্থায় যেরূপ চালিত করে, সেরূপ মৃত অবস্থায় ও চালিত করে। আবার জীবিত থাকিলে যেরূপ সকলের সহিত সম্বন্ধ থাকে সেরূপ মৃত্যুর পর আত্মা সর্বগামী হওয়ায় সকলের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে (যথা জীবন্ সর্বৈঃ সম্বন্ধঃ মৃতোঽপি সর্বাত্মত্বদস্য)। অবিদ্যমান বস্তুর প্রতি যেমন কাহারও প্রীতি উৎপন্ন হয় না, তেমনি বিদ্যমান বস্তুর প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন হওয়া উচিত নহে। ধার্মিক ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ যেরূপ উচিত নহে, সেরূপ অধার্মিকের প্রতি দ্রোহাচরণ কর্তব্য নহে। নশ্বর জগতের প্রতি অনুরাগ বা প্রীতি বস্তুতঃ শাশ্বত, ধ্রুব, নিত্য ব্রহ্মের প্রতি অনুরাগ হইতে অভিন্ন। সকল রাগ বা প্রীতি আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই প্রকাশ। স্থিতপ্রজ্ঞের নিকট সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হওয়ায় তিনি সর্বত্রই সমভাবে প্রিয়ত্ব বুদ্ধি করিয়া থাকেন। ব্রহ্মনিষ্ঠব্যক্তির যেরূপ মুক্তি অথবা বন্ধন কিছুই নাই সেরূপ লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে শরীরধারণকারী জীবন্মুক্ত পুরুষ অনিত্যজগতে রাগবান্ বা প্রীতিমান্ বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ তিনি রাগজন্য বন্ধনের দ্বারা বা রাগত্যাগনিমিত্তক মুক্তির দ্বারা অস্পৃষ্ট থাকেন। সুতরাং এতাদৃশ দৃষ্টিসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ কখনই পরিতাপ করেন না যেহেতু তাঁহার নিকট পরিতাপের কোন হেতুই থাকে না। রাজ্যরক্ষা হইল বা রাজ্য শত্রুকবলিত হইল তত্ত্বদৃষ্টিতে পরিতাপের আর কি আছে?

সেহেতু স্থিতপ্রজ্ঞ রামের প্রতি ভরতের উক্তি—

> যথা মৃতস্তথা জীবন্ যথাসতি তথা সতি।
> যস্যৈষ বুদ্ধিলাভঃ স্যাৎ পরিতপ্যেত কেন সঃ ॥ ২।১০৬।৪

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় রহিয়াছে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ—

> রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
> আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২।৬৪

রাবণের সহিত যুদ্ধে বিজয়লাভের নিমিত্ত রণক্লান্ত ও চিন্তামগ্ন রামকে অগস্ত্যমুনি গোপনে আদিত্যহৃদয় স্তোত্র বলিয়াছিলেন। সূর্য দেবতার স্বরূপ ও মাহাত্ম্যের সহিত ব্রহ্ম তথা পরমেশ্বরের স্বরূপ ও মাহাত্ম্যের কোন পার্থক্যই দৃষ্ট হয় না। এখানে বর্ণিত আদিত্যদেবতা ব্রহ্মেরই নামান্তর।

১। অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।

পাতঞ্জলসূত্র, সাধনপাদ, ৫।

ঈশোপনিষদে রহিয়াছে—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ ।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ ।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬

রামায়ণে সূর্যদেব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, সূর্য সকল দেবতার স্বরূপ, তেজস্বী সূর্য নিজের রশ্মিদ্বারা জগতের সত্তা ও স্ফূর্তি প্রদান করেন। তিনি দেবতা, সুর ও ত্রিলোককে রক্ষা করেন। ইনি হইতেছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ, প্রজাপতি, মহেন্দ্র, ধনদ, কাল, যম, সোম ও বরুণ। ইনিই পুনরায় পিতৃগণ, অষ্টবসু, অশ্বিনীদ্বয়, মরুদ্‌গণ, মনু, বায়ু, বহ্নি, সবিতা, দিবাকর, শম্ভু, মার্তণ্ড ও অংশুমান্ প্রভৃতি দেবতা।

তুলনীয়—এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশো আপো জ্যোতীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজাণি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ কিঞ্চেদং প্রাণিজঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্। সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। ঐতরেয় উপনিষৎ, ৩।১।৩

ইনি আবার—

ব্যোমনাথস্তমোভেদী ঋগ্‌যজুঃসামপারগঃ ।
ঘনবৃষ্টিরপাং মিত্রো বিন্ধ্যবীথীপ্লবঙ্গমঃ ॥
আতপী মণ্ডলী মৃত্যুঃ পিঙ্গলঃ সর্বতাপনঃ ।
কবির্বিশ্বো মহাতেজা রক্তঃ সর্বভবোদ্ভবঃ ॥ ৬।১০৬।১৩-১৪

তুলনীয়—

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৪।২

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষস্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৪।৪

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ।।
ঈশোপনিষৎ, ৮

এই সূর্যদেব হইতেছেন নক্ষত্র, গ্রহ, তারাদিগের অধিপতি ও বিশ্বের পালক ; ইনি অগ্ন্যাদি তেজঃপদার্থ সকলের স্ফূর্তিসাধক চিন্ময় তেজঃস্বরূপ, ইনি বৈশাখাদি দ্বাদশ মাস বলিয়া দ্বাদশাত্মা । এরূপ উগ্র, বীর, সারঙ্গ, পদ্মপ্রবোধ ও প্রচণ্ড সূর্যকে নমস্কার ।

ব্রহ্মেশানাচ্যুতেশায় সূরায়াদিত্যবর্চসে ।
ভাস্বতে সর্বভক্ষায় রৌদ্রায় বপুষে নমঃ ।। ৬।১০৫।১৯

তুলনীয়—

স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ।। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।১৬

ইনি কাঞ্চনবর্ণ, অজ্ঞানহারী, বিশ্বকর্মা, তমোনাশক ও লোকসাক্ষী, ইনি সৃষ্টিপালনসংহারকর্তা । ইনি কিরণমালা দ্বারা সকলকে রক্ষা করেন, তাপিত করেন ও বর্ষণ করেন । সকলে নিদ্রিত হইলে সকল প্রাণিগণের অন্তর্যামিরূপে সূর্যদেবই জাগরিত থাকেন ও তিনি নিজে অগ্নিহোত্র ও তদনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ । ইনি সকলের পরমপ্রভু ।

তুলনীয়—

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ।। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।১১

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ।। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ১।১২

রাবণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মন্দোদরী বিলাপ করিতে করিতে রামের যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে বলেন—

অনাদি মধ্যনিধনো মহতঃ পরমো মহান্ ।
তমসঃ পরমো ধাতা শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥
শ্রীবৎসবক্ষা নিত্যশ্রীরজয্যঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ ।
মানুষং রূপমাস্থায় বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ৬।১১১।১২-১৩

তুলনীয়—

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্ ।
বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ ॥
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৪।২০

লঙ্কাপুরীতে জানকী অনলে প্রবেশ করিলে দেবগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া রামের স্তব করিয়াছেন—রাম হইতেছে সর্বলোকের কর্তা, জ্ঞানিগণের ধ্যেয় ও বিভু ।

তুলনীয়—

স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ
তমেব জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি ॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৪।১৫

রাম হইলেন—

রুদ্রাণামষ্টমো রুদ্রঃ সাধ্যানামপি পঞ্চমঃ ।
অশ্বিনৌ চাপি কর্ণৌ তে সূর্যাচন্দ্রামসৌ দৃশৌ ॥ ৬।১১৭।৮

তুলনীয়—

অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ ।
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।১।৪

তদেতচ্চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদশ্চক্ষুঃ পাদঃ শ্রোত্রং পাদ ইত্যধ্যাত্মমথাধিদৈবতমগ্নিঃ পাদো বায়ুঃ পাদ আদিত্যঃ পাদো দিশঃ পাদ ইত্যুভয়মেবাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চৈবাধিদৈবতং চ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৩।১৮।২

দেবগণ সর্বজ্ঞ রামের স্তব করিতে থাকিলে রাম বলিলেন যে তিনি নিজেকে দশরথাত্মজ মনুষ্য রাম বলিয়াই জানেন, দেবগণ যেন তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বলেন। ব্রহ্মা তখন রামের স্তব আরম্ভ করিলেন—

ভবান্নারায়ণো দেবঃ শ্রীমাংশ্চক্রায়ুধঃ প্রভুঃ।
একশৃঙ্গো বরাহস্ত্বং ভূতভব্যসপত্নজিৎ ॥
অক্ষরং ব্রহ্ম সত্যঞ্চ মধ্যে চান্তে চ রাঘব।
লোকানাং ত্বং পরো ধর্মো বিষ্বক্সেনশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৬।১১৭।১৩-১৪
সেনানীর্গ্রামণীশ্চ ত্বং বুদ্ধিঃ সত্ত্বঃ ক্ষমা দমঃ।
প্রভবশ্চাপ্যয়শ্চ ত্বমুপেন্দ্রো মধুসূদনঃ ॥ ৬।১১৭।১৬

তুলনীয়—

এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম ॥ মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, ৬

তুলনীয়—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩।১

যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেব-মেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি ॥ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ২।১।২০

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৪

ব্রহ্মা আরও বলিলেন—

দিব্য মহর্ষিগণ আপনাকেই ইন্দ্রকর্মা, মহেন্দ্র, পদ্মনাভ, রণান্তকারী, শরণ ও শরণ্য নামে অভিহিত করেন।

আপনিই—

সহস্রশৃঙ্গো বেদাত্মা শতশীর্ষো মহর্ষভঃ ।
ত্বং ত্রয়াণাং হি লোকানামাদিকর্তা—স্বয়ম্প্রভুঃ ॥ ৬।১১৭।১৮

তুলনীয়—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।১৪

যঃ পূর্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্বমজায়ত ।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত ॥ কঠোপনিষৎ, ২।১।৬

ব্রহ্মা আরও বলিলেন—

আপনিই সিদ্ধ ও সাধ্যগণের আশ্রয়, পূর্বজ, যজ্ঞ, বষট্কার, পরাৎপর ও ওঙ্কারস্বরূপ ।

প্রভবং নিধনঞ্চাপি নো বিদুঃ কো ভবানিতি ।
দৃশ্যসে সর্বভূতেষু গোষু ব্রাহ্মণেষু চ ॥ ৬।১১৭।২০

তুলনীয়—

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবঃ বয়াংসি ।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিশ্চ ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।১।৭

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী ।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪।৩

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥
কঠোপনিষৎ, ২।২।১০

ব্রহ্মা বলিলেন—

ত্রাঁল্লোকান ধারয়ন্ রাম দেব-গন্ধর্ব-দানবান্ ।
অহং তে হৃদয়ং রাম জিহ্বা দেবী সরস্বতী ॥
দেবা রোমাণি গাত্রেষু ব্রহ্মণা নির্মিতাঃ প্রভো ।
নিমেষস্তে স্মৃতা রাত্রিরুন্মেষো দিবসস্তথা ॥ ৬।১১৭।২৩-২৪

তুলনীয়—

অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদো-ঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টং হুতমাশিতং পায়িতময়ং চ লোক পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতান্যস্যৈবৈতানি সর্বাণি নিশ্বসিতানি ॥ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৫।১১

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য
স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশেতি ॥ প্রশ্নোপনিষৎ, ৪।১১

রাবণ ইন্দ্রলোক আক্রমণ করিলে ভীত ইন্দ্র বিষ্ণুর শরণ লইয়া তাঁহাকে বলিলেন—

আপনি দেবগণেরও দেবতা, আপনি ব্যতীত দ্বিতীয় আশ্রয় কেহ নাই। আপনাতে ত্রিলোক স্থাপিত। আপনি আমাকে স্বর্গের রাজা করিয়াছেন।

ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত কাল রামকে বলিলেন—

সংক্ষিপ্য হি পরা লোকান্ মায়য়া স্বয়মেব হি।
মহার্ণবে শয়ানোঽপ্সু মাং ত্বং পূর্বমজীজনঃ ॥ ৭।১০৪।৪

সরযূর তীরে আগত প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত রামকে পিতামহ বলিলেন—

বৈষ্ণবীং তাং মহাতেজা যদ্বাকাশং সনাতনম্।
ত্বং হি লোকগতির্দেব ন ত্বাং কেচিৎ প্রজানতে ॥
ঋতে মায়াং বিশালাক্ষীং তব পূর্বপরিগ্রহাম্।
ত্বামচিন্ত্যং মহদ্ ভূতমক্ষয়ং চাজরং তথা
যামিচ্ছসি মহাতেজস্তাং তনুং প্রবিশ স্বয়ম্ ॥ ৭।১১০।১০-১২

তুলনীয়—

মায়াং তু বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়ভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪।১০

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥ শ্বেতাশ্বরোপনিষৎ, ১৷১০
এষ লোকপালঃ। এষ লোকাধিপতিঃ। এষ সর্বেশঃ।
কৌষীতকি উপনিষৎ, ৩৷৮

নিষ্কাম কর্ম, বিহিত কর্ম, শুভ কর্ম, ঈশ্বরার্পণ কর্ম, কর্মফল অপরিহার্য।

কর্মফলহেতু মানুষ জন্মলাভ করিয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করে ইহাই ভারতীয় সকল আস্তিকদর্শনের অভিমত। কর্মফলের প্রতি এই বিশ্বাস জনগণের হৃদয়ের গভীর মূলে প্রোথিত ইহা জনপ্রিয় মহাকাব্য রামায়ণ পাঠ করিলেই জ্ঞাত হওয়া যায়। রামায়ণের প্রায় সকল চরিত্রই কর্মফলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রামায়ণের প্রধান চরিত্র রাম হইতে আরম্ভ করিয়া দশরথ, কৌশল্যা, সীতা, হনুমান্, জটায়ু, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, মন্দোদরী, কুবের ও নন্দী সকলেই কর্মফলের নিকট নতি স্বীকার না করিয়া পারেন নাই।

রামের বনগমনের পর বিলাপকারী দশরথ কৌশল্যাকে বলিয়াছেন—

যদাচরতি কল্যাণি শুভং বা যদি বাঽশুভম্।
তদেব লভতে ভদ্রে কর্তা কর্মজমাত্মনঃ॥ ২৷৬৩৷৬

রাম খরকে বলিয়াছেন—

ন চিরাৎ প্রাপ্যতে লোকে পাপানাং কর্মণাং ফলম্।
সবিষাণামিবান্নানাং ভুক্তানাং ক্ষণদাচর॥ ৩৷২৯৷৯

সীতাকে হরণকালে রাবণকে সীতা বলিয়াছেন—

ননু সদ্যোঽবিনীতস্য দৃশ্যতে কর্মণঃ ফলম্।
কালোঽপ্যঙ্গীভবত্যত্র শস্যানামিব পক্তয়ে॥ ৩৷৪৯৷২৭

রাম সীতার জন্য বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছেন—

পূর্বং ময়া নূনমভীপ্সিতানি পাপানি কর্মাণ্যসকৃৎকৃতানি।
তত্রায়মদ্য পতিতো বিপাকো দুঃখেন দুঃখং যদহং বিশামি॥
৩৷৬৩৷৪

মন্দোদরী রাবণের মৃত্যুর পর বিলাপ করিয়াছেন—

শুভকৃচ্ছুভমাপ্নোতি পাপকৃৎ পাপমশ্নুতে।
বিভীষণঃ সুখং প্রাপ্তস্ত্বং প্রাপ্তঃ পাপমীদৃশম্ ।। ৬।১১১।২৬

তুলনীয়—

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মনা ভবতি পাপঃ পাপেন ।। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৪।৫

তদেব সক্তঃ সহ কর্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য। প্রাপ্যান্তং কর্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহ করোত্যয়ম্। তস্মাল্লোকাৎপুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্মণ ইতি। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৪।৬

জগতের মিথ্যাত্ব, জগতের নশ্বরত্ব

জগতের নশ্বরতা প্রতিপাদক কিছু শ্লোক রামায়ণে রহিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশের বক্তা হইতেছেন রাম। রাম বিলাপকারী ভরতকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্ ।। ২।১০৫।১৬
সহৈব মৃত্যুর্ব্রজতি সহ মৃত্যুর্নিষীদতি।
গত্বা সুদীর্ঘমধ্বানং সহ মৃত্যুর্নিবর্ততে ।। ২।১০৫।২২
এবং ভার্যাশ্চ পুত্রাশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ বসূনি চ।
সমেত্য ব্যবধাবন্তি ধ্রুবো হ্যেষাং বিনাভবঃ ।। ২।১০৫।২৭

তুলনীয়—

অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথাহপরে।
সস্যমিব মর্তঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ ।।

কঠোপনিষৎ, ১।১।৬

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ, সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব, তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ।।

কঠোপনিষৎ, ১।১।২৬

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ গীতা, ২।২৭

কালই পরমেশ্বর, কালের প্রভাব, নিয়তি, দৈব, বিধি

দৈববিষয়ক অজস্র শ্লোক রহিয়াছে রামায়ণ মহাকাব্যে। ইহাদের অধিকাংশের প্রবক্তা হইলেন রামচন্দ্র। বারংবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া রাম ভাগ্যকে দোষারোপ করিয়া সান্ত্বনা খুঁজিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, সুমন্ত্র, হনুমান্, বালী, কবন্ধ, সম্পাতি, মাল্যবান্ এমন কি রাবণ পর্যন্ত কালকে ভাগ্যনিয়ন্তা বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

নির্বাসনদণ্ডাদেশ শ্রবণে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে রাম সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন—

যদচিন্ত্যং তু তদ্দৈবং ভূতেষ্বপি ন হন্যতে।
ব্যক্তং ময়ি চ তস্যাঞ্চ পতিতো হি বিপর্যয়ঃ ॥ ২।২২।২০
সুখ-দুঃখে ভয়-ক্রোধৌ লাভালাভৌ ভবাভবৌ।
যস্য কিঞ্চত্তথাভূতং ননু দৈবস্য কর্ম তৎ ॥ ২।২২।২২

ভরত রামের ভূশয্যা দেখিয়া বিলাপ করিয়াছেন—

ন নূনং দৈবতং কিঞ্চিৎ কালেন বলবত্তরম্।
যত্র দাশরথী রামো ভূমাবেবমশেত সঃ। ২।৮৮।১১

সীতাহরণের পর লক্ষ্মণ রামকে সান্ত্বনা দিয়াছেন—

সুমহান্ত্যপি ভূতানি দেবাশ্চ পুরুষর্ষভ।
ন দৈবস্য প্রমুঞ্চন্তি সর্বভূতানি দেহিনঃ ॥ ৩।৬৬।১২

বালিবধের পর রাম বিলাপকারী সুগ্রীব, তারা ও অঙ্গদকে বলিয়াছেন—

নিয়তিঃ কারণং লোকে নিয়তি কর্মসাধনম্।
নিয়তিঃ সর্বভূতানাং নিয়োগেষ্বিহ কারণম্ ॥ ৪।২৫।৪
ন কালস্যাস্তি বন্ধুত্বং ন হেতুর্ন পরাক্রমঃ।
ন মিত্রজ্ঞাতিসম্বন্ধঃ কারণং নাত্মনো বশঃ ॥ ৪।২৫।৭

সীতা হনুমান্‌কে বলিয়াছেন—

বিধির্নূনমসংহার্যঃ প্রাণিনাং প্লবগোত্তম।
সৌমিত্রিং মাঞ্চ রামঞ্চ ব্যসনৈঃ পশ্য মোহিতান্ ॥ ৫। ৭।৪

তুলনীয়—

ততঃ কালবশাদেব প্রারব্ধে তু ক্ষয়ংগতে।
বৈদেহীং মামকীং মুক্তিং যান্তি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

মুক্তিকোপনিষৎ, ১।৪৫

কালশ্চ নারায়ণঃ। নারায়ণাথর্বশিরোপনিষৎ, ২

তৃতীয় অধ্যায়

রামায়ণের জীবনাদর্শ তথা চরিত্রবিশ্লেষণ

আদর্শের আবশ্যকতা ঃ মানব জন্ম দুর্লভ জন্ম। জীব নানা দেহে নানারূপে জন্মগ্রহণ করিবার পর মানবরূপে এই পৃথিবীতে আসে। এমন কি দেবতাদের নিকটও এই মানবদেহ বহু আকাঙ্ক্ষিত। দেবতাগণও তাঁহাদের উদ্দেশ্য বা সাধনা সিদ্ধ করিতে মানব জন্মই গ্রহণ করিয়া থাকেন। অধর্মের বিনাশ ও ধর্মের সংস্থাপন করিতে স্বয়ং ভগবান্ও সৃষ্টজীবের মধ্যে মানবদেহকেই বেশী পছন্দ করিতেছেন। বিধাতা তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবকে বুদ্ধি দিয়াই ধরিত্রীতে প্রেরণ করিয়াছেন। এই বুদ্ধিই তাহাকে শুভাশুভ নির্ণয় করিতে সাহায্য করে। বুদ্ধিবলেই সে বুঝিতে পারে কোন্ পথ গ্রহণ তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক এবং কোন্ পথ তাহার পক্ষে অমঙ্গলকর। এই মঙ্গলের পথ, কল্যাণের পথ গ্রহণ করিতে হইলে তাহাকে কতকগুলি আদর্শ গ্রহণ করিবে হইবে। এই আদর্শ-গুলিই হইবে তাহার জীবনের ধ্রুবতারা। কিন্তু জীবনের পথ বড়ই পিচ্ছিল। এই পথ অনুসরণ করা বড়ই কষ্টদায়ক, যে কোন মুহূর্তেই পদস্খলনের সম্ভাবনা। শত বাধাবিঘ্নের মধ্যেও যাঁহারা এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন না তাঁহারাই মহাপুরুষ। মহাজনদের অনুসৃত পথই আমাদের পথ। ভারত চিরকালই ভাববাদী দৃষ্টি লইয়া জগতের সর্ববস্তুকে দর্শন করিয়াছে। বস্তুবাদ হইতে ভাববাদের প্রতিই তাহার চিরকালীন অনুরাগ। সেজন্য আদর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাহাকে বারংবার ছুটিতে হইয়াছে রামায়ণ ও মহাভারত দুইটি মহাকাব্যের নিকট। এই ধরিত্রীর বক্ষে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে যুঝিবার জন্য মানবের আদর্শ থাকা দরকার। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের মানবাদর্শ সম্বন্ধে উপদেশ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"আমাদের একটি আদর্শ থাকা আবশ্যক। শুধু তাহাই নহে, আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ থাকাই আবশ্যক। অধিকাংশ ব্যক্তি এই জগতে কোনরূপ আদর্শ না লইয়াই জীবনের এই অন্ধকারময় পথে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে। যাহার একটি নির্দিষ্ট আদর্শ আছে, সে যদি সহস্রটি ভ্রমে পতিত হয়, যাহার কোনরূপ আদর্শ নাই, সে দশ সহস্র ভ্রমে পতিত হইবে, ইহা নিশ্চয়। অতএব একটি আদর্শ থাকা ভাল। এই আদর্শ সম্বন্ধে যত

পারি শুনিতে হইবে, ততদিন শুনিতে হইবে যতদিন না উহা আমাদের রক্তের ভিতর প্রবেশ করে, যতদিন না উহা আমাদের প্রতি শোণিত-বিন্দুতে প্রবেশ করে, যতদিন না উহা আমাদের শরীরের অণুতে-পরমাণুতে ব্যাপ্ত হইয়া যায়।"—২৪৭ পৃষ্ঠা জ্ঞানযোগ, স্বামী বিবেকানন্দ।

ভারতবাসীর চিরকালের আদর্শ রাজ্য রামরাজ্য, চিরকালীন আদর্শ রাজা হইতেছেন রামচন্দ্র, শাশ্বত সাধ্বী হইতেছেন সীতা, আর হনুমান্ হইতেছেন চিরন্তন বিশ্বস্ত অনুচরের প্রতীক। এখানে আমাদের একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত যে, রামচন্দ্র আমাদের প্রায় সর্ববিধ আদর্শের প্রতীক। আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্বামী, আদর্শ রাজা, আদর্শ বীর, আদর্শ বন্ধু ও আদর্শ প্রভু। এই রামচন্দ্র হইতেছেন দশ অবতারের অন্যতম। কিন্তু আমরা যখন রামায়ণের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিব তখন আমাদের প্রাথমিক বিচারে ভগবান্ রামচন্দ্রের কথা বিস্মৃত হইতে হইবে। আদর্শ চরিত্রের অধিকারী রাম, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন বা সীতাকে ভগবানের অবতার বা দেবতার অংশরূপে ধরিয়া লইলে তাঁহাদের চরিত্রের অনুকরণীয় কিছুই থাকে না বলিয়া মনে হইবে। কারণ মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের মধ্যে একটি দুস্তর ব্যবধান আছে বলিয়াই অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস। যাহা দেবসাধ্য তাহা কিরূপে মনুষ্যসাধ্য হইতে পারে এরূপ প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদিত হয়। চিন্তাজগতের উচ্চস্তরে যিনি আরোহণ করিয়াছেন তিনি অবশ্যই জানেন যে, মনুষ্যত্ব হইতে ক্রমমুক্তির পথে দেবত্বে উন্নত হওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু রামায়ণ ত আর কেবল-মাত্র উচ্চস্তরের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্যই লিখিত হয় নাই। ইহা সর্বজনীন গ্রন্থ। সেজন্য বাল্মীকি রামচরিত্রকে মুখ্যতঃ মনুষ্যরূপেই অঙ্কিত করিয়াছেন। বাল্মীকি নারদের নিকট পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবের কথা জানিতে কৌতহল প্রকাশ করিলে নারদ শ্রেষ্ঠ নর রামের কথাই বলিয়াছেন—

> বহবো দুর্লভাশ্চৈব যে ত্বয়া কীর্তিতা গুণাঃ।
> মুনে বক্ষ্যাম্যহং বুদ্ধ্যা তৈর্যুক্তঃ শ্রূয়তাং নরঃ॥ ১।১।৭

রামায়ণে পারিবারিক আদর্শ : এই সর্বগুণসম্পন্ন মানব রাম ও তাঁহার পরিবারের সদস্যবর্গই ভারতীয় পারিবারিক জীবনের আদর্শ। ভারতীয় সামাজিক স্থিতির মূল ভিত্তি হইতেছে পরিবার। ভারতীয়

আর্যরা তাঁহাদের জীবনকে চারিটি আশ্রমে ভাগ করিয়াছেন। নিয়মবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য শাস্ত্রীয় পদ্ধতি হইতেছে চতুরাশ্রম। তাঁহারা গৃহকে বলিয়াছেন আশ্রম। গৃহ হইতেছে গৃহস্থের কর্তব্যপালনের স্থান। গার্হস্থ্য আশ্রমকেই অপর আশ্রমগুলির পোষক এবং মাতৃতুল্য বলা হইয়াছে।

রামায়ণে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবিষয়ক বহু উপদেশ থাকিলেও ইহাতে ধর্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ধর্মপথে থাকিয়া গৃহীর জীবনযাপন করিয়াও বৈরাগ্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায় তাহা রামায়ণের প্রধান চরিত্রগুলি দ্বারা প্রদর্শিত। ধর্মাচরণপূর্বক চারিটি আশ্রমের মধ্য দিয়া সন্ন্যাসে প্রবেশ করিতে পারিলেই ত্যাগশিক্ষা হয়। এই ত্যাগ বা নিবৃত্তিই মোক্ষের দ্বার। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রটিতে এই ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥ ঈশোপনিষৎ, ১

ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, এই সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়। উত্তমরূপে ত্যাগের দ্বারা (আত্মাকে) পালন কর; কাহারও ধনে লোভ করিও না। অথবা (ধনের) আকাঙ্খা করিও না, (কারণ), ধন আবার কাহার?

অথবা,

ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ ॥ মহানারায়ণোপনিষৎ, ১।৫
আমি, আমার চিন্তা ত্যাগ অর্থাৎ অহং ভাবের বিনাশই ত্যাগের পথ।[১]

১। আস্তে কশ্চন ভিক্ষুঃ সগত্বমব্যয়ানি দশ।
ন মমেত্যব্যয়যুগলং প্রার্থয়ামো ন চান্যৎ ॥ (অপ্যয়দীক্ষিত রচিত শ্লোক)

তাৎপর্য—মহাদেব একজন ভিক্ষুক, তিনি ভিক্ষা করিয়া অনেক পদার্থই সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি একজন অসাধারণ ভিক্ষুক বলিয়া তাঁহার সংগৃহীত ভিক্ষালব্ধ পদার্থগুলিও অসাধারণ। ক্ষয়িষ্ণু জগতের ক্ষয়শীল পদার্থ না লইয়া তিনি অব্যয়গুলিকেই লইয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে মহাদেব দশটি অব্যয়ের অধিকারী যেমন—জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, স্রষ্টৃত্ব, আত্মজ্ঞান, অধিষ্ঠাতৃত্ব। কবি এই স্থলে বলিয়াছেন যে, মহাদেবের নিকট ভিক্ষা করিয়া তিনি মাত্র দুইটি অব্যয় গ্রহণ করিতে চান—'ন' এবং 'মম'। ইহার অর্থ—আমার নয়। অহঙ্কার ও মমকার বর্জন করিতে পারিলেই তত্ত্বজ্ঞান সুগম হয়। লক্ষ্য করিতে পারা যায় যে, উক্ত দুইটি অব্যয় দশটি পূর্বোক্ত অব্যয়ের অন্তর্গত নয়। আক্ষরিকভাবে না থাকিলেও বৈরাগ্যের মধ্যে উক্ত দুইটিই অন্তর্ভুক্ত আছে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

সেজন্য দেবতাকে হবিঃ প্রদানকালে মন্ত্র বলিতে হয়—'ইদং হবিরগ্নয়ে, ন মম।' এই হবিঃ অগ্নিকে প্রদত্ত হইল, ইহা আমার নহে। এরূপে ধীরে ধীরে অহংভাব দূর হইলে মানুষ ত্যাগের পথে অগ্রসর হয়। ইহাই নিবৃত্তিমার্গ। কিন্তু নিবৃত্তিমার্গের পথ অতি দুরূহ। সাধারণ লোকের পক্ষে নিবৃত্তিমার্গ অনুসরণ সহজসাধ্য নহে। সেহেতু শাস্ত্রে প্রবৃত্তিমার্গকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্রে এই প্রবৃত্তি-মার্গের কথা বলা হইয়াছে—

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরেঃ ॥২

'যে ব্যক্তি এই জগতে শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে উৎসুক, তিনি (শাস্ত্রবিহিত) কর্ম করিয়াই বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেন। এই প্রকার (আয়ুস্কামীও) নরাভিমানী তোমার পক্ষে এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই যাহাতে তোমাতে (অশুভ) কর্ম লিপ্ত না হইতে পারে।

মনে রাখিতে হইবে যে, নিবৃত্তিমার্গই শ্রেষ্ঠ এবং তদ্দ্বারাই সাক্ষাৎভাবে মোক্ষলাভ সম্ভব হয়। এই সাক্ষাৎ মোক্ষলাভের জন্য নিবৃত্তিকে মহাফলা বলা হইয়াছে। প্রবৃত্তিমার্গে থাকিয়া ক্রমশঃ নিবৃত্তির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। মনুসংহিতাকার বলিয়াছেন—

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥ মনুসংহিতা, ৫।৫৬

উচ্চাধিকারী ব্রহ্মচর্য হইতে সংযম অভ্যাস করিয়া নিবৃত্তিমার্গের চরম পরিণতিতে উপনীত হইতে পারে। সারকথা বৈরাগ্য হইলেই সন্ন্যাস-প্রবৃত্তি হয়।

জাবালোপনিষদে আছে—

ব্রহ্মচর্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ॥ যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্বা বা বনাদ্বা॥ অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বাহস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিরনাগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ॥ জাবালোপনিষৎ, ৩

ব্রহ্মচর্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, গার্হস্থ্যধর্ম পালন করিবার পর বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিবে। বাণপ্রস্থের পর সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। যদি অন্যরূপ হয় তবে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ যে কোন আশ্রম

হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। আবার ব্রহ্মচর্যব্রত ধারণ হউক বা না হউক, স্নাতক হউক বা না হউক, অগ্নি পরিত্যাগ করুক বা না করুক যে মুহূর্তে বৈরাগ্য আসিবে সেই মুহূর্তেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে।

এই বৈরাগ্য তথা সন্ন্যাসই মোক্ষের উপায়। ইহাই সংসারী পুরুষের চরম অবস্থা। যতক্ষণ না এই অবস্থায় আসা যায় ততক্ষণই অন্যান্য আশ্রমের আবশ্যকতা। গৃহস্থাশ্রম রক্ষা করিতে গেলে পরিবারই তাহার স্তম্ভ, স্নেহ মায়া সেখানে অপরিহার্য। কিন্তু পরমসত্যকে এই অবস্থায়ও বিস্মৃত হইলে চলিবে না, ইহাই আদর্শ। ইহাই গৃহী রামচন্দ্র তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

রামায়ণ হইতেছে পারিবারিক সম্পর্কেরই মহাকাব্য। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন মহাকাব্যে পারিবারিক সম্পর্কের এরূপ উচ্চতম আদর্শ আর কখনও দেখা যায় নাই। রামায়ণে পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতির আদর্শ বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে প্রতিফলিত। পুত্রের প্রতি স্নেহশীল আদর্শ পিতা দশরথ, পিতার প্রতি অনুরক্ত সত্যসন্ধ রামচন্দ্র, স্বামীর প্রতি অনুরক্তা স্ত্রী কৌশল্যা, ভ্রাতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগী অনুজ লক্ষ্মণ, রাজ্যলাভ করিয়াও জ্যেষ্ঠভ্রাতার জন্য সন্ন্যাসব্রতধারী ভরত, ভ্রাতৃভক্ত শত্রুঘ্ন, স্বামীর জন্য সর্বপ্রকার কষ্টসহিষ্ণু ও পতিপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রী সীতা, সর্বস্বত্যাগিনী সুমিত্রা. এমন কি কৈকেয়ীর শুভাকাঙ্ক্ষিণী দাসী মন্থরা—প্রতিটি চরিত্র স্ব স্ব মহিমায় ভাস্বর। এই সকল কারণে রামায়ণ গৃহী মাত্রেরই পরম উপাদেয় গ্রন্থ। নিবৃত্তি উপদেশের জন্য ইহা অপর সকলের নিকট আদর্শ গ্রন্থ।

রামায়ণে আদর্শ রাষ্ট্রীয় নীতি: ভারতীয় সমাজের মূলভিত্তি পরিবার। পরিবার সমাজের অঙ্গ বলিয়া বিপর্যস্ত পরিবার সামাজিক সম্পর্কের মূলভিত্তিকে নাড়া দেয়। আবার সমাজ লইয়াই রচিত হইয়াছে দেশ বা রাষ্ট্র। পরিবার, সমাজ, বা রাষ্ট্র প্রত্যেকটি পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ রহিয়াছে। একটিতে বিপর্যয় ঘটিলে অপরটিতে বিপর্যয় ঘটিতে বাধ্য। যেমন দেশ যদি বহিঃশত্রুদ্বারা আক্রান্ত হয় তবে সেই আক্রমণের ঢেউ পরিবারেও আসিয়া পড়িবে। কারণ রাষ্ট্র পরিবারের নিরাপত্তার জন্য দায়ী সেজন্য ব্যক্তিকে কেবলমাত্র নিজের কথা চিন্তা না করিয়া পরিবার, গ্রাম, সমাজ তথা দেশের সকলের কথাই চিন্তা করিতে হইবে। কারণ ব্যক্তির উন্নতিতেই সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নতি। আবার রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির অর্থ হইতেছে ব্যক্তির সমৃদ্ধি। সুতরাং যখন

ব্যক্তিস্বার্থ ও বৃহৎ স্বার্থের সংঘাতের প্রশ্ন আসিবে তখন আমাদের কর্তব্য হইবে —

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥

আদর্শ রাষ্ট্র সম্বন্ধে রামায়ণের কি বক্তব্য তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। রামায়ণে আদর্শ রাজার কি কি গুণ থাকা উচিত তাহার অতি সুচিন্তিত ও যুক্তিশীল বর্ণনা রহিয়াছে। চিত্রকূটে রাম আদর্শ রাষ্ট্রীয় নীতি সম্বন্ধে ভরতের নিকট বহু প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। রামের প্রশ্নাবলীর মধ্যেই আমরা রামায়ণের যুগে রাজারা কিরূপ রাষ্ট্রীয় আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হইত তাহা জানিতে পারি। বর্তমান যুগে গণতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত তথাকথিত কল্যাণমূলক রাষ্ট্র অপেক্ষা সে যুগের রাজ্যও যে কম কল্যাণমূলক ছিল না তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করি। রাম ভরতকে রাজা, রাজত্ব ও রাজনীতি সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশ্ন করিয়াছেন। সে যুগের রাজধর্ম বুঝিবার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন তুলিয়া ধরা হইল।

রামচন্দ্র ভরতকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে ধনুর্বেদবিশারদ ও অর্থশাস্ত্রবিদ্ উপাধ্যায় সুধন্বার প্রতি ভরত সম্মান প্রদর্শন করেন কিনা? তিনি শূর, বিদ্বান্, জিতেন্দ্রিয়, সদ্বংশসম্ভূত, ইঙ্গিতজ্ঞ পুরুষগণকে মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন কিনা? ভরত কি সহস্র মূর্খ পরিত্যাগ করিয়া একজন বিদ্বান্‌কে সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন? কারণ বিদ্বান্ ব্যক্তিরাই সঙ্কট দূর করিয়া মহাকল্যাণ সাধন করিতে পারেন।

রাজ্য পরিচালনা করিতে গেলে অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ ও অর্থশাস্ত্রে নিপুণ ব্যক্তি যে অপরিহার্য একথা রামচন্দ্র ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও ইহা সমানভাবে প্রযোজ্য। আধুনিক যুগে মন্ত্রী জনতার দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার উপরিলিখিত গুণাবলী থাকার কোন আবশ্যকতা নাই, অর্থের প্রাচুর্য থাকিলেই হইল।

ভরত অযোগ্য লোককে যোগ্যস্থানে, যোগ্য লোকদের অযোগ্যস্থানে নিয়োজিত করেন নাই ত? এই প্রশ্নের উত্তর এ যুগে নিঃসন্দেহে ইতিবাচক হইবে। কারণ বর্তমান যুগের ইহাই রীতি। রাজনীতিতে রাজশক্তির অনুগৃহীত ব্যক্তির যোগ্যতা ও অযোগ্যতার প্রশ্ন অবান্তর।

যে সকল অমাত্য উৎকোচ গ্রহণ করেন না, পিতৃ-পিতামহাদি

পুরুষানুক্রমে মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছেন ও যাঁহাদের বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় বিশুদ্ধ সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ অমাত্যকে ভরত শ্রেষ্ঠকর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন ত? অমাত্যগণের উৎকোচ গ্রহণ না করা বর্তমান যুগে সাধারণ লোক অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া মনে করে। পৃথিবীর বহুদেশেই রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন ইহা বিরল নহে। পিতৃ-পিতামহাদিক্রমে মন্ত্রিত্ব গণভোটের যুগে অচল। মন্ত্রিগণের বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় বিশুদ্ধ থাকা বর্তমান রাজনীতিতে অতি অবান্তর গুণাবলীর পর্যায়ে পড়ে।

বিপক্ষীয় যোদ্ধৃগণকে পরাস্ত করিতে সমর্থ, সপ্রতিভ, বিপদ্‌কালে ধৈর্যশালী, বুদ্ধিমান্, সৎকুলসম্ভূত, শুদ্ধাচারী ও অনুরক্ত ব্যক্তিকে ভরত সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন ত?[১] প্রাচীযুগের ন্যায় বর্তমান যুগেও সেনাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে কিছু পরিমাণ এই নীতি গ্রহণ করা হইয়া থাকে। তবে সৎকুল অথবা শুদ্ধচারিতা নিশ্চয়ই গণ্য হয় না।

অপর প্রশ্ন ছিল—যুদ্ধবিৎ বিক্রমশালী যোদ্ধৃগণের যুদ্ধকার্যে নৈপুণ্য দেখিয়া ভরত তাহাদিগকে সৎকৃত ও সম্মানিত করিয়া থাকেন ত? বর্তমান যুগেও বীর যোদ্ধৃগণকে বীরচক্র, বিশিষ্ট সেবাপদক প্রভৃতি দিয়া সম্মানিত করিবার প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে।

রামচন্দ্র প্রশ্ন রাখিয়াছেন—সৈন্যগণ ও যাহারা দৈনিক ও মাসিক বেতন পায় ভরত তাহাদের যথাসময়ে বেতন প্রদান করেন ত? কারণ তাহারা যদি যথাসময়ে বেতন না পায় তবে প্রভুর প্রতি ক্রুদ্ধ হয় ও মহা অনর্থের সূত্রপাত করে। রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিগণ ভরতের প্রতি অনুরক্ত আছেন ত? প্রত্যুৎপন্নমতি, যথার্থবাদী, বিচক্ষণ ও স্বরাজ্যবাসী ব্যক্তিকে ভরত দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন ত?

এই ব্যাপারগুলির যথোচিত প্রতিপালন বর্তমান যুগেও হইয়া থাকে?

ভারতীয় দণ্ডনীতিতে মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, ধনাধ্যক্ষ প্রভৃতি ১৮টি তীর্থ ছিল। ভরতকে রাম বলিয়াছিলেন যে পররাজ্যে এই ১৮ তীর্থের ও স্বীয়রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী, পুরোহিত ও যুবরাজ ব্যতীত অপর ১৫টি তীর্থের সংবাদ ভরত নিযুক্ত চারবর্গ[২] দ্বারা নিয়া থাকেন ত?

১। কচ্চিদ্ ধৃষ্টশ্চ শূরশ্চ ধৃতিমান্ মতিমাঞ্ছুচিঃ।
কুলীনশ্চানুরক্তশ্চ দক্ষঃ সেনাপতিঃ কৃতঃ॥ ২।১৯০।৩০

২। কচ্চিদষ্টাদশান্যেষু স্বপক্ষে দশ পঞ্চ চ।
ত্রিভিস্ত্রিভিরবিজ্ঞাতৈর্বেৎসি তীর্থানি চারণৈঃ॥ ২।১০০।৩৬

চারবর্গ তথ্য সংগ্রহ করিলে রাজা যথোপযুক্ত বিধান করিবেন। চারবর্গের পরস্পর বিরোধ হইলে রাজা কারণ জানিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে রাজাকে চারচক্ষু বলা হইয়াছে। চার যাহার নাই সে রাজা অন্ধ।

বর্তমান যুগেও আমাদের দেশে রহিয়াছে কেন্দ্রীয় গুপ্তচর বিভাগ। আমাদের দেশে চীনযুদ্ধের পূর্বে গুপ্তচর বিভাগের কার্যাবলী কার্যতঃ ছিল না বলিলেই হয়। ১৯৬২ সালের পর বর্তমানে এই বিভাগ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। চারনীতির ব্যাপারে আমেরিকার সি. আই. এ. এবং রাশিয়ার কে. জি. বি. বর্তমান যুগে খুবই উন্নত ও দেশে বিদেশে সর্বত্র সক্রিয়। চারবর্গের জন্য প্রাচীন ভারতে যে বিশাল শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল তাহা বহুলাংশে বিস্মৃত প্রায়।

রাম প্রশ্ন করিয়াছেন—কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য দ্বারা রাজ্য সমৃদ্ধ হইতেছে ত? ভরত প্রজাদের প্রতিপালন করিতেছেন ত? রাষ্ট্রবাসী মনুষ্যমাত্র ধর্মতঃ রাজার প্রতিপাল্য। কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা বর্তমান রাষ্ট্রেও পরিলক্ষিত হয়। গণতন্ত্রে প্রতিটি মানবই রাষ্ট্রের প্রতিপাল্য। তবে তাহারা কি পরিমাণে প্রতিপালিত তাহাই প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে।

রাম আরও উপদেশ দিয়াছেন যে, কর্মচারিগণের কার্য নিয়ত দর্শন ও একান্ত অদর্শন এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পন্থাই কল্যাণের কারণ।

রাজ্যের দুর্গসমূহ ধনধান্য, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রশিল্পী ও যোদ্ধৃগণের দ্বারা পরিপূর্ণ আছে ত? ভরতের আয় অধিক ও ব্যয় অল্পতর হইতেছে ত? অপাত্রে ব্যয়িত হওয়ায় ধনাগার অর্থশূন্য হইতেছে না ত? রাজ্যের দুর্গসমূহের প্রতি যথোচিত যত্ন বর্তমান যুগেও লওয়া হইতেছে। কিন্তু 'বাজেট ঘাটতি' প্রতি বৎসরের বাজেট অধিবেশনের মূল কথা। কি পরিমাণ অর্থ সৎপাত্রে ব্যয়িত হয় তাহা ভাবিবার বিষয়।

নিরপরাধ সজ্জনব্যক্তি ভরতের কর্মচারিগণের ধনলোভের দ্বারা দণ্ডিত হয় না ত? অপরাধী ব্যক্তিগণকে ধনলোভে ছাড়িয়া দেওয়া হয় না ত? ধনাঢ্য ও দরিদ্র ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহার অমাত্যগণ ধনিব্যক্তির জয় ও নির্ধনের পরাজয় ঘোষণা করেন না ত?

১। কচ্চিদ্ দুর্গানি সর্বাণি ধনধান্যায়ুধোদকৈঃ।
যন্ত্রৈশ্চ প্রতিপূর্ণানি তথা শিল্পিধনুর্ধরৈঃ॥ ২।১০০।৫৩

বর্তমান যুগে নিরপরাধ সজ্জনব্যক্তি প্রতিনিয়ত অসৎ কর্মচারিগণের ধনলোভের শিকার হইতেছে। সাধারণভাবে দরিদ্রব্যক্তি অর্থাভাবে আইনের দ্বারা পরাজিত হয় বলিয়া বর্তমানে সরকার দরিদ্র যাহাতে বিনা পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ আইনজ্ঞের সাহায্য পায় তাহার জন্য নূতন আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। অপরাধী অর্থের বিনিময়ে ছাড়া পাইতেছে এই দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ধনিব্যক্তি যে সর্বদা সরকারী আনুকূল্য লাভ করিবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

রাম ভরতকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, ভরত সন্ধি, বিগ্রহ, যান প্রভৃতি ষাড়্‌গুণ্য সম্পূর্ণ অবগত হইয়া যথাস্থানে প্রয়োগ করেন কিনা? অগ্নি, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, মড়ক এই পঞ্চবিধ দৈববিপদের প্রতিকারের জন্য ভরত সর্বদা চেষ্টিত আছেন কিনা? আধুনিক রাষ্ট্রেও দৈব-দুর্বিপাকের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ থাকে। সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি যথাস্থানে প্রয়োগের চেষ্টা হইয়া থাকে।

ইহার পর ভরতকে রাম মানুষবিপদ্‌ প্রতীকার করিয়া রাষ্ট্রবাসিগণের রক্ষার চেষ্টায় সচেষ্ট আছেন কিনা প্রশ্ন করিয়াছেন? প্রজাগণের নিম্নলিখিত মানুষবিপদ্‌ হইয়া থাকে—(১) রাজকার্যে নিযুক্ত পুরুষগণ হইতে (২) তস্করগণ হইতে (৩) শত্রু হইতে (৪) রাজবল্লভপুরুষ হইতে (৫) পৃথিবীপাল হইতে।

ইহার মধ্যে বর্তমান যুগে তস্করগণ হইতে, শত্রু হইতে ও পৃথিবীপাল হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার চেষ্টা কিছু পরিমাণ হইয়া থাকে। কিন্তু রাজকার্যে নিযুক্ত পুরুষ ও রাজবল্লভ পুরুষ সাধারণের মনে যথেষ্ট পরিমাণ ভয় উদ্রেক করিয়া থাকে।

বহু সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও আদিকাব্য রামায়ণ হইতে বর্তমান যুগের রাজনীতিবিদ্‌গণ যুগোপযোগী রাজনীতির উপদেশ লাভ করিয়া উপকৃত হইতে পারেন। সেই যুগেও রাজধর্ম ও রাজনীতি কতটা উন্নত ছিল ও রাষ্ট্রীয়জীবনকে কি ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল, রামায়ণ-কাব্য তাহার একটি নির্ভরযোগ্য দলিল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

রামরাজ্য: রামের রাজত্বকালে রাজ্য কিভাবে পরিচালিত হইত তাহার আভাস পাওয়া যাইবে বাল্মীকিকর্তৃক বর্ণিত রামরাজ্যের বিবরণে। রামায়ণের যুগ কয়েক সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত, তথাপি বর্তমান কালেও লোকমুখে আক্ষেপ শোনা যায়—সে-রামও নাই, সে-অযোধ্যাও নাই। এই আক্ষেপ অবশ্যই পারিবারিক, সামাজিক অথবা রাষ্ট্রীয় কোন প্রতিকারবিহীন

অন্যায় ও বিশৃঙ্খল অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া। সুতরাং রাম বহুযুগ পূর্বে রাজত্ব করিলেও তাঁহার সুশাসনের মহিমা জনসাধারণের মনে জাগরূক। ভারতবাসীর মনে কোন আদর্শ রাষ্ট্রের কথা উদিত হইলে তাহার স্মরণে আসিবে রামরাজ্যের কথা। অবশ্য গান্ধীজীর চিন্তাধারা দ্বারাও জনসাধারণ প্রভাবিত। গান্ধীজী ভারতবর্ষে সুসমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

বহুখ্যাত রামরাজ্য[১] বর্ণনায় কবি বাল্মীকি মাত্র দশটি শ্লোক ব্যয় করিয়াছেন। সেই বর্ণনায় কিন্তু প্রাচুর্য এবং সম্পদের বর্ণনা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। রামরাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও আনন্দের পরিবেশ। শান্তি তথা সুখ-সম্পাদনে পার্থিব সম্পদ্ যে একান্তই অনভিপ্রেত তাহা রামরাজ্যের বিবরণে সম্যক্ প্রতিভাত। প্রজারা পরম সুখ-শান্তিতে ছিল, ধর্মপথে চলিত, রাজানুরক্ত ছিল ইহাই রামরাজ্য বর্ণনার মূল সুর। রামের রাজ্যে প্রজাবৃন্দের প্রাধান্যই বেশী। সেখানে রাজার স্থান প্রজাদের মিত্ররূপে,

১। রামায়ণে রামরাজত্ব সম্বন্ধে নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

রাঘবশ্চাপি ধর্মাত্মা প্রাপ্য রাজ্যমনুত্তমম্।
ঈজে বহুবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সসুহৃজ্জ্ঞাতিবান্ধবঃ ॥
ন পর্যদেবন্ বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্।
ন ব্যাধিজং ভয়ঞ্চাসীদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
নির্দস্যুরভবল্লোকো নানর্থং কশ্চিদস্পৃশৎ।
ন চ স্ম বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকার্যাণি কুর্বতে ॥
সর্বং মুদিতমেবাসীৎ সর্বো ধর্মপরোঽভবৎ।
রামমেবানুপশ্যন্তো নাভ্যহিংসন্ পরস্পরম্ ॥
আসন্ বর্ষসহস্রাণি যথা পুত্রসহস্রিণঃ।
নিরাময়া বিশোকাশ্চ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
রামো রামো রাম ইতি প্রজানামভবন্-কথাঃ।
রামভূতং জগদভূদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
নিত্যমূলা নিত্যফলাস্তরবস্তত্র পুষ্পিতাঃ।
কামবর্ষী চ পর্জন্যঃ সুখস্পর্শশ্চ মারুতঃ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা লোভবিবর্জিতাঃ।
স্বকর্মসু প্রবর্তন্তে তুষ্টাঃ স্বৈরেব কর্মভিঃ ॥
আসন্ প্রজা ধর্মপরা রামে শাসতি নানৃতাঃ।
সর্বে লক্ষণসম্পন্নাঃ সর্বে ধর্মপরায়ণাঃ ॥
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ শ্রীমান্ রামো রাজ্যমকারয়ৎ ॥ ৬।১২৮।৯৭-১০৬

প্রজাপীড়ক দোর্দণ্ডপ্রতাপ নৃপতিরূপে নয়। প্রজারা এরূপ মানসিক শান্তির অধিকারী ছিল যে তাহার স্পর্শ প্রকৃতিতে অনুভূত হইত। কারণ রামের রাজত্বকালে দৃঢ়মূল বৃক্ষসকল সর্বদা পুষ্প ও ফল প্রসব করিত, মেঘ প্রজাদের ইচ্ছানুরূপ বারিবর্ষণ করিত ও মন্দগতি বায়ু সকলকে সুখস্পর্শ প্রদান করিত। মনে হয় রামের সুশৃঙ্খল শাসনে রাজ্যের প্রজাগণের মানসিক শান্তি ও স্বস্তি বিদ্যমান্ থাকায় তাহারা যথোপযুক্ত বৃক্ষসকলের পরিচর্যা করায় বৃক্ষসকল সর্বদাই যথাসময়ে পুষ্পবান্ ও ফলবান হইত। রাম নিশ্চয়ই কৃষিকার্যের জন্য যথানুরূপ জলসেচের[১] ব্যবস্থাদি লইতেন, যাহাতে প্রজাবৃন্দ কৃষির জন্য বারিবর্ষণের অপেক্ষা করিত না। কৃষিকর্ম যথাসময়ে সম্পাদিত হওয়ায় ও মেঘের উপর নির্ভরশীল না হওয়ায় যে কোন সময়েরই বর্ষণ অভিনন্দনযোগ্য ছিল ইহাই কবি প্রজাগণের ইচ্ছানুরূপ বারিবর্ষণের দ্বারা বুঝাইতে চাহিতেছেন। সুতরাং বায়ু তীব্র অথবা মৃদু যেভাবেই প্রবাহিত হউক না কেন প্রজাগণের নিকট তাহা সুখস্পর্শ মৃদুবায়ুর ন্যায়ই মনে হইত। অথবা প্রকৃতিও রামকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল বলিয়া কখনও রুদ্ররূপ ধারণ করিত না।

রামরাজ্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল—রামের শাসনকালে কোন রমণীকে বৈধব্যক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই অথবা বৃদ্ধদিগকে বালকদিগের প্রেতকার্য করিতে হয় নাই। মনে হয় রামের রাজত্বকালে চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি হওয়ায় ও প্রজাদিগের রোগনিরাময়ের ব্যবস্থাদির প্রতি যথোচিত লক্ষ্য রাখায় প্রজারা নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবী হইত। পুরুষগণের যথাকালে মৃত্যু হওয়ায় রমণীগণের অকাল বৈধব্য ভোগের[২] আশঙ্কা কমিয়া গিয়াছিল। যথাকালে মৃত্যু মানুষের শোকাবেগ তত বর্ধিত করে না। যথোপযুক্ত চিকিৎসাব্যবস্থা থাকায় শিশুদের অকালমৃত্যু আর ঘটিত না। কারণ বাল্মীকি স্বয়ং বলিয়াছেন যে রামের শাসনকালে সকল লোক রোগশোকহীন হইয়া সহস্র বৎসর আয়ুলাভ করিয়াছিল। ব্যাধি ও মৃত্যু মানুষের শোকের প্রধান উৎস। অকালমৃত্যু আর ব্যধি রোধ হওয়ায় মানুষের পরমায়ু যে বাড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

১। রামের রাজত্বকালে সেচব্যবস্থাদি ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ প্রজারা কৃষির জন্য বারিবর্ষণের অপেক্ষা করিত না।

২। উভয়ের যথাকালে মৃত্যুতে বৈধব্য অপরিহার্য। অকালবৈধব্য ছিল না ইহাই কবির উক্তির তাৎপর্য বলিয়া ধরিতে হইবে।

রাম যে রাজা হইয়া নৃপোচিত গাম্ভীর্য লইয়া প্রজাগণের হৃদয় হইতে সরিয়া না গিয়া পূর্বের মতই প্রজাগণের সুখদুঃখের অকৃত্রিম বন্ধু রহিয়াছেন, স্বজনতুল্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহা প্রজাবৃন্দকর্তৃক রামের কার্যাবলীর অনুসরণেই বোঝা যায়। প্রজাবৃন্দ রামের দৃষ্টান্তে ধর্মপরায়ণ হইয়াছিল। যে রাজা তাঁহার ঐশ্বর্য ও অহঙ্কার লইয়া প্রজাবৃন্দের সুখে-দুঃখে নির্বিকার থাকিয়া সিংহাসনে আসীন থাকেন যে রাজাকে অনুসরণের কথা প্রজাগণ কখনও চিন্তা করিবে না, রাম সেরূপ নহেন বলিয়াই প্রজাবৃন্দের অনুসরণযোগ্য হইতে পারিয়াছিলেন।

রামের রাজত্বকালে প্রজাদের মধ্যে কেবল রামের চর্চাই হইত। সমুদয় জগৎ তখন রামময় হইয়াছিল। অন্যত্র বলা হইয়াছে রাম পুত্ররূপে, স্বামিরূপে, ভ্রাতারূপে, শিষ্যরূপে, গৃহিরূপে সকলেরই আদর্শ। রামের মত সর্বগুণান্বিত রাজা পৃথিবীতে বিরল। সুতরাং গৃহাস্থাশ্রমে যে কোনরূপ আদর্শের উদাহরণস্বরূপে রামের কথা স্বভাবতঃই উল্লিখিত হইত। বহুগুণের আকর রামকে সকলে পরমাত্মীয় মনে করায় ও সাংসারিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় যে কোন বিষয়ে রাম আদর্শ হওয়ায়, তাহার নাম সর্বত্র ও সর্বকার্যে উল্লিখিত হওয়ায় জগৎ রামময় হইয়াছিল।

দেখা যাইতেছে যে, রামরাজ্যের জন্য ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা অকারণ নহে। অভাবপীড়িত ও দুঃখাক্রান্ত জাতির নিকট রামরাজ্য একটি স্বপ্নরাজ্যেই কল্পনা।

রামচন্দ্র

রামচন্দ্র আদিকবি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ মহাকাব্যের অদ্বিতীয় পুরুষ। অন্যান্য চরিত্রগুলি রামের ছায়ামাত্র। রামের সম্পর্কে সম্পর্কিত হইয়াই অপরাপর চরিত্রগুলি স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

রামায়ণের আদিকাণ্ডের প্রারম্ভেই বাল্মীকি প্রশ্ন করিয়াছেন নারদকে—

কোঽন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্যবান্।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥
চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ॥
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে॥

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে।
মহর্ষে ত্বং সমর্থোঽসি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরম্ ।। ১।১।২-৫

নারদও অতি প্রহৃষ্টমনে উত্তর দিয়াছেন—

মুনে বক্ষ্যাম্যহং বুদ্ধ্যা তৈর্যুক্তঃ শ্রূয়তাং নরঃ ।১।১।৭

মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি সেই **'নরের'** কথা বলিতেছি। তুমি শ্রবণ কর।

এখানে নারদ 'নর' রামেরই বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত রামায়ণের প্রতিপাদ্য হইতেছেন মানুষ রামচন্দ্র। মানুষ স্বীয় সুকৃতি ও গুণাবলী দ্বারা কিভাবে দেবত্বে উন্নীত হইতে পারে ও সহস্র বৎসর ধরিয়া অগণিত ভক্তের হৃদয় হরণ করিতে পারে তাহার অদ্বিতীয় উদাহরণ রামচন্দ্র।[১]

রামচন্দ্রকে বলা হয় মর্যাদাপুরুষোত্তম। মর্যাদা শব্দটির অর্থ হইতেছে সীমা। পুরুষদের মধ্যে যিনি উত্তম তাহার সীমা হইতেছেন রামচন্দ্র। মানুষ স্বীয় আদর্শের দ্বারা যে উচ্চ স্তরে উন্নীত হইতে পারে তাহার চরমতম সীমা হইতেছেন রামচন্দ্র। সুতরাং রামচন্দ্র হইতেছেন পুরুষশ্রেষ্ঠ। রাম মানবের চরম শ্রেষ্ঠত্বলাভের চিরকালীন আদর্শের প্রতীক। রামচরিত্রের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য অকল্পনীয়।

১। বাল্মীকি নরশ্রেষ্ঠরূপে রামচন্দ্রকে বর্ণনা করিলেও স্থানে স্থানে তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকে বলেন ইহা প্রক্ষিপ্ত। ইহা যদি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তথাপি কিন্তু রামায়ণের প্রতিটি সংস্করণেই ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষেরও যে দেবতার স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব ইহা বুঝাইবার জন্যই হয়তো আদিকবি বাল্মীকি রামকে অনেকবার বিষ্ণুর অবতার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় রামের যেরূপ দেবতা হইবার স্বরূপযোগ্যতা ছিল সেরূপ ফলোপধায়কতাও ছিল। কুম্ভকারের কুম্ভ-নির্মাণকালে কুম্ভের নিমিত্তকারণ হয় দণ্ড। কারণ দণ্ড ব্যতীত কুম্ভনির্মাণ সম্ভব নহে। এখন যে কোন দণ্ডদ্বারাই কুম্ভ নির্মাণ সম্ভব হইলেও কুম্ভকার বিশেষ একটি দণ্ডদ্বারাই কুম্ভ নির্মাণ করে। তাহার অর্থ ইহা নহে যে, যে-সকল দণ্ডদ্বারা কুম্ভকার কুম্ভ নির্মাণ করিতেছে না তাহাদের কুম্ভনির্মাণের শক্তি নাই। বিশেষ একটি দণ্ডদ্বারা কুম্ভ নির্মিত হইলেও সকল দণ্ডেরই কুম্ভনির্মাণের স্বরূপযোগ্যতা অর্থাৎ কুম্ভনির্মাণের ক্ষমতা রহিয়াছে, কিন্তু ফলোপধায়কতা নাই অর্থাৎ অপর সকল দণ্ডের কুম্ভনির্মাণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কুম্ভনির্মাণরূপ ফল সকল দণ্ডের দ্বারা জন্মায় নাই। সেরূপ প্রত্যেক মানুষের দেবতা হইবার স্বরূপযোগ্যতা রহিয়াছে কিন্তু ফলোপধায়কতা নাই। প্রত্যেক মানুষই দেবত্ব লাভ করিতে পারে কিন্তু দেবত্ব লাভ করে না। কিন্তু রামচন্দ্র মানুষ হইয়াও দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সেজন্য রামচন্দ্রের দেবতা হইবার স্বরূপযোগ্যতা ও ফলোপধায়কতা উভয়ই ছিল।

রামের চরিত্র বিচিত্রমুখী ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। একটি মানব-চরিত্রে এত বৈচিত্র্যের সমাবেশ পৃথিবীতে আর কখনও দেখা যায় নাই। দ্বাদশ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত রামচন্দ্র একটার পর একটা মহৎকার্য সম্পাদন করিয়াছেন। আবার আধুনিক সমাজের মানদণ্ডে তাঁহার মধ্যে বিপরীতধর্মী কার্য করিবার মানসিকতাও মধ্যে মধ্যে দেখা গিয়াছে। যেমন বালিবধ, সীতার প্রতি কর্কশবাক্য প্রয়োগ অথবা নির্বাসনের পরে বনে প্রথম রাত্রিতে লক্ষ্মণের নিকট তাঁহার খেদোক্তি প্রভৃতি। অবশ্য এগুলি মানবমনের স্বাভাবিক প্রবণতা বলিয়াই মনে হয় এবং রামচন্দ্রের মধ্যেও মানবচিত্তের এই স্বাভাবিকতা আছে বলিয়াই তিনি দেবত্বে উন্নীত হইয়াও সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাহিরে যান নাই। সাধারণ মানুষ একাধারে তাঁহাকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে অপরদিকে তিনিই হইতে পারিয়াছেন তাহাদের আরাধ্য দেবতা। এরূপ একই ব্যক্তিতে দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের যুগপৎ প্রকাশ আর কখনও দেখা যায় নাই। এখানেই আদিকবি বাল্মীকির আদিকাব্যের সার্থকতা।

অযোধ্যাকাণ্ডে মানব রামের চরিত্রমহিমা অপূর্ব দ্যুতিতে ভাস্বর। আদিকাণ্ডে অবশ্য আমরা রামের বহুবিধ গুণ ও শৌর্যবীর্য প্রভৃতির পরিচয় পাই—তাড়কাসুরবধ, হরধনুর্ভঙ্গ, পরশুরামের পরাজয় প্রভৃতি প্রসঙ্গে। তবুও রামের যে আদর্শ চরিত্র অযোধ্যাকাণ্ডে প্রকাশিত তাহার দ্বারাই ভারতবাসী শাশ্বতকাল ধরিয়া প্রভাবিত। রাজপুত্র হইয়াও সন্ন্যাস-ব্রতধারী, ত্যাগী ও সংসারভোগের প্রতি আসক্তিহীন, পিতৃভক্ত, মাতৃভক্ত. ভ্রাতার প্রতি স্নেহপরায়ণ ও আদর্শ স্বামী রামের পরিচয় এই অধ্যায়ের প্রতিশ্লোকে বিধৃত।

ভরত মাতুলালয়ে থাকাকালীন প্রজাগণের বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ সব-গুণান্বিত রামকে দশরথ রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাহিলে রামচন্দ্র অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া মাতৃগৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই শুভসংবাদ মাতাকে প্রদান করিলেন।[১]

লক্ষণীয় যে, রামচন্দ্রেরও ভরত সম্বন্ধে আশঙ্কা ছিল যে, ভরত হয়তো রামের রাজ্যরাজ্যাভিষেকের বাধা সৃষ্টি করিতে পারেন। যদিও রাম পরবর্তী শ্লোকে বলিয়াছেন—'উভৌ ভরতশত্রুঘ্নৌ প্রাণৈঃ প্রিয়তরৌ

১। অম্ব পিত্রা নিযুক্তোঽস্মি প্রজাপালনকর্মণি।
ভাবিতা শ্বোঽভিষেকো মে যথা মে শাসনং পিতুঃ। ২।৫।৩৫

মম।' তবুও জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের পক্ষে যেরূপ রাজ্যাকাঙ্ক্ষা থাকা স্বাভাবিক তাহা রামচন্দ্রেরও ছিল। রাজ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা তাঁহাকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। আবার রাজ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও তাঁহাকে সাধারণ মানুষের মতই আনন্দিত করিয়াছিল।

এদিকে রাজা দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ জানাইতে কৈকেয়ী-ভবনে উপস্থিত হইলে দ্বারপালিকার নিকট জানিতে পারেন কৈকেয়ী ক্রোধাগারে ভূমিশয্যায় শয়ানা রহিয়াছেন। দশরথ কৈকেয়ীর নিকট উপস্থিত হইলে কৈকেয়ী রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক কামনা করিলেন। দশরথও সত্যরক্ষার্থে তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। পরদিবস প্রভাতে অভিষেককার্যের জন্য রামসীতা প্রস্তুত হইয়া আছেন এমন সময় সুমন্ত্র রামের ভবনে আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, দশরথ কৈকেয়ীভবনে রামকে দেখিতে উৎসুক। কৈকেয়ীভবনে উপস্থিত হওয়ামাত্র নির্লজ্জা কৈকেয়ী রামকে জানাইলেন যে পূর্বে দশরথ কৈকেয়ীকে বরদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া এখন রামের অপ্রিয় বলিয়া সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছেন না। রাম তদুত্তরে জানাইলেন—

দেবি, আমি রাজার আদেশে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে পারি, তীক্ষ্ণ বিষ ভক্ষণ করিতে পারি, সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে পারি। কারণ মহারাজ আমার পিতা, গুরু ও হিতাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং আপনার যাহা আকাঙ্ক্ষিত তাহা বলুন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিব। কারণ রাম কখনও দুই প্রকার কথা বলে না।[১]

কৈকেয়ী এবার বরদ্বয়ের কথা জানাইলে রাম বিন্দুমাত্র শোকগ্রস্ত না হইয়া জানাইলেন—

এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং ত্বিতঃ।
জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥ ২।১৯।২

রামও আরও বলিলেন—

অলীকং মানসং ত্বেকং হৃদয়ং দহতীব মে।
স্বয়ং যন্নাহ মাং রাজা ভরতস্যাভিষেচনম্ ॥

১। তদ্ব্রূহি বচনং দেবি রাজ্ঞো যদভিকাঙ্ক্ষিতম্।
করিষ্যে প্রতিজানে চ রামো দ্বির্নাভিভাষতে ॥ ২।১৮।৩০

অহং হি সীতাং রাজ্যঞ্চ প্রাণানিষ্টান্ ধনানি চ।
হৃষ্টো ভ্রাত্রে স্বয়ং দদ্যাং ভরতায় প্রচোদিতঃ ॥ ২।১৯।৬-৭

রাজা স্বয়ং কেন ভরতের অভিষেকের কথা আমাকে বলিলেন না—ইহা ভাবিয়া আমার অন্তর দগ্ধ হইতেছে। আমি হৃষ্টচিত্তে সীতা, রাজ্য, প্রাণ ও অন্যান্য প্রার্থিত বস্তু ও সম্পদ্ সকল ভরতকে দিতে পারি।

কৈকেয়ীর মুখে রাজ্যপ্রাপ্তির পরিবর্তে বননির্বাসনের আদেশ শুনিয়া রাম কিন্তু বিন্দুমাত্র শোকগ্রস্ত হইলেন না। বরং বলিলেন যে ভরতের রাজ্যাভিষেকের কথা স্বয়ং মহারাজ জানান নাই বলিয়াই তিনি ক্ষুব্ধ। এখানেই রামচন্দ্রের রামচন্দ্রত্ব। রাজ্যপ্রাপ্তির আশার আনন্দে উদ্বেলিত রামচন্দ্র নির্বাসনদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া বিন্দুমাত্র বিষাদবোধে আচ্ছন্ন হইলেন না। বরং সেই মুহূর্তেই অরণ্যে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

রামকে বনে যাইবার জন্য ত্বরা করিতে বলিলে গতব্যথ রাম বলিলেন—

নাহমর্থপরো দেবি লোকমাবস্তুমুৎসহে।
বিদ্ধি মামৃষিভিস্তুল্যং বিমলং ধর্মমাস্থিতম্ ॥ ২।১৯।২০

ইহা বলিয়াই মহাদ্যুতি রাম সংজ্ঞাহীন পিতা ও বিমাতা কৈকেয়ীর পাদবন্দনা করিয়া কৌশল্যার অন্তঃপুরে গমন করিলেন। কিন্তু রামের মধ্যে কোন চিত্তবিক্রিয়া দেখা গেল না। তবে শোকের কোন বাহ্য অভিব্যক্তি না থাকিলেও রাম যে মাতা, স্ত্রী ও অনুজের কথা চিন্তা করিয়া অন্তরে অতিশয় কষ্ট পাইয়াছেন তাহা বাল্মীকির বর্ণনা হইতেই বুঝিতে পারি। কারণ তিনি কুঞ্জরের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াই কৌশল্যার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। মাতার নিকট তিনি তাঁহার অন্তরের দুঃখ চাপিয়া রাখিতে পারেন না।

রামের নির্বাসনদণ্ডের সংবাদে কৌশল্যা বিলাপ করিতে করিতে রামের অনুগমন করিতে চাহিলেন। পূর্বপুরুষ সগরপুত্রগণ ও পরশুরাম প্রভৃতির ন্যায় পিতৃবাক্য পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাম জননীকে আরও বলিলেন—

ত্বয়া ময়া চ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন সুমিত্রয়া।
পিতুর্নিয়োগে স্থাতব্যমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ২।২১।৪৯

এদিকে পিতার প্রতি অতি ক্রোধান্বিত লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দিবার জন্য রাম বলিলেন যে তাঁহার নির্বাসন ও রাজ্যলাভে বাধা এই দুটি ব্যাপারে দৈব ব্যতীত কেহ দায়ী নহেন। দৈব দায়ী না হইলে কৈকেয়ী তাহাকে রাজ্যলাভে এরূপ বাধা দিতে স্থিরনিশ্চয় হইতেন না।

দৈবের উপর নির্ভর করিয়া রাম যেন অনেকটা সান্ত্বনা খুঁজিতেছেন। কারণ তাঁহার প্রতি কৈকয়ীর আচরণের হঠাৎ পরিবর্তনকে তিনি কোন পার্থিব ব্যাপার দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারিতেছেন না। নিজের ভাগ্য-বিপর্যয়ের কারণ দৈব এই বিশ্বাস তাঁহার মানসিক স্থৈর্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

রাম সীতার গৃহে প্রবেশপূর্বক নিজের নির্বাসনের কথা জানাইলে সীতাও রামের অনুগামিনী হইতে চাহিলেন। রাম বনবাসের নানারূপ কষ্টের বর্ণনা দিয়া সীতাকে বিরত করিতে চাহিলেন। ক্রন্দনরতা সীতা তখন বিষপানে আত্মহত্যা করিতে চাহিলে রাম জানাইলেন—

নেদানীং ত্বদৃতে সীতে স্বর্গোঽপি মম রোচতে।

রামের মনোগত অভিপ্রায় ছিল সীতাও রামের বনবাসের সঙ্গী হউন। কিন্তু রাম যদি সীতাকে প্রথমেই বনগমনের জন্য আদেশ করিতেন তবে ভবিষ্যতে সীতা হয়তো পদে পদে অরণ্যবাসের অসুবিধা ভোগ করিবার জন্য রামের প্রতি দোষারোপ করিতে পারিতেন। কিন্তু সীতার স্বেচ্ছায় বনগমনের অভিপ্রায়ে সে আশঙ্কা আর রহিল না।

বনগমনের পূর্বে রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা যখন তাঁহাদের সম্পদ্‌রাশি দান করিতেছিলেন তখন ত্রিজট নামে এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ জীর্ণবস্ত্রে নিজেকে কোনরূপ আবৃত করিয়া রামের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাম তাঁহার বহুসহস্র ধেনুর মধ্যে একসহস্র তখনও দান করেন নাই। উপস্থিত গোগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বহুব্যায়ত গোধনের যতগুলিকে অতিক্রম করিয়া ত্রিজট দণ্ড নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবেন ততদূর বিস্তৃত গোধন তাঁহারই প্রাপ্য হইবে। তখন সেই ব্রাহ্মণও ব্যস্ত হইয়া কটিদেশে বস্ত্র বেষ্টন করিয়া সরযূর অপর পারে বৃষগণের গোঠে দণ্ডটি-

প্রেরণ করিলেন। ইহা দেখিয়া রাম ত্রিজটের আশ্রমে ধেনুগুলি প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে ক্রুদ্ধ হইতে বারণ করিয়া জানাইলেন ইহা পরিহাসমাত্র।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ ত্রিজটের আখ্যান প্রমাণ করে যে চরম বিপদে পতিত হইয়াও রাম তাহার সহজাত পরিহাসপ্রিয়তা হারান নাই। বিপন্ন অবস্থায় পরিহাস করিবার মানসিকতা রামের মত স্থিতপ্রজ্ঞের পক্ষেই সম্ভব।

দশরথের নিকট বিদায়জ্ঞাপনকালে অনুতাপদগ্ধ পিতাকে সান্ত্বনা দিয়া রাম বলিতে লাগিলেন—

আমি সত্য ও সুকৃতির শপথ করিয়া বলিতেছি আমি রাজ্য চাহি না, পৃথিবীও চাহি না। অথবা সকল কাম্যবস্তু, স্বর্গ, এমন কি জীবনও আমার প্রার্থিত নহে। আমি কেবলমাত্র আপনার সত্যরক্ষা করিতে চাহি। আপনাকে মিথ্যা হইতে মুক্ত রাখিতে চাহি। আপনাকে মিথ্যাবাদী করিয়া আমি কাম্যবস্তু এমন কি মৈথিলীকেও চাহি না।[১]

সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রাম সীতা ও লক্ষ্মণসহ রথে আরোহণ করিলে অতিশয় তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেরূপ জলাভিমুখে গমন করে সেরূপ ব্যাকুল অযোধ্যাবাসিগণও রামের রথের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। অযোধ্যাবাসী অনুরক্ত জনগণ রামের অনুগমন করিয়া তাঁহাকে ফিরিবার জন্য বারংবার অনুরোধ জানাইলে রামচন্দ্র অতিস্নেহে বলিলেন—

অযোধ্যাবাসিগণ! আমার প্রতি তোমাদের যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা আছে, আমারই প্রীতি সম্পাদনের জন্য তোমরা ভরতকে সেরূপ প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিও। আর কৈকেয়ীপুত্র ভরত কল্যাণস্বভাবযুক্ত। তিনি তোমাদের প্রিয় ও হিতকার্য করিবেন।[২]

১। নৈবাহং রাজ্যমিচ্ছামি ন সুখং ন চ মেদিনীম্।
নৈব সর্বানিমান্ কামান্ন স্বর্গং ন চ জীবিতুম্॥
ত্বামহং সত্যমিচ্ছামি নানৃতং পুরুষর্ষভ।
প্রত্যক্ষং এব সত্যেন সুকৃতেন চ তে শপে॥ ২।৩৪।৪৭-৪৮

২। যা প্রীতির্বহুমানশ্চ ময্যযোধ্যানিবাসিনাম্।
মৎপ্রিয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে স বিধীয়তাম্॥
স হি কল্যাণচরিত্রঃ কৈকেয্যানন্দবর্ধনঃ।
করিষ্যতি যথাবদ্ বঃ প্রিয়াণি চ হিতানি চ॥ ২।৪৫।৬-৭

পরোক্ষভাবে ভরতই রামের বনর্নিবাসনের কারণ হইলেও তাঁহার প্রতি রামের বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ ছিল না। বরঞ্চ তাঁহার বাক্যাবলীতে ভরতের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক স্নেহ ও শ্রদ্ধার পরিচয়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তমসাতীরে প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া নিদ্রিত প্রজাদের দেখিয়া রাম সুমন্ত্রকে পরামর্শ দিলেন যে সুমন্ত্র যেন রথ উত্তরাভিমুখে লইয়া গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসেন। তাহা হইলে প্রজাবৃন্দ জাগরিত হইয়া বুঝিতে পারিবেন না রামের রথ কোন্‌দিকে গিয়াছে। তাহারা পথ ঠিক করিতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবে। সুমন্ত্রও তাহা করিলেন।

রাম ছলনার আশ্রয় লইয়া প্রজাদিগকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করিলেন। সময় বুঝিয়া রামের চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ লক্ষণীয়।

কোশলদেশ অতিক্রম করিয়া রাম গঙ্গানদীর তীরে গুহের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। জাহ্নবী নদী পারাপারের জন্য নৌকা আনীত হইল। সুমন্ত্রকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলে সুমন্ত্র অস্বীকৃত হইলেন। তখন রাম সুমন্ত্রকে বুঝাইলেন যে সুমন্ত্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন না করিলে রাম বনে গিয়াছেন তাহা কৈকেয়ী বিশ্বাস করিবেন না ও দশরথকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সন্দেহ করিবেন। অনন্যোপায় সুমন্ত্র অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলেন।

সুমন্ত্রকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের আদেশ রামের বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দেয়। তাহা না হইলে রাম যথার্থ বনে গিয়াছেন কিনা সে সম্বন্ধে কৈকেয়ী সন্দেহ প্রকাশ করিতেন।

রামলক্ষ্মণ বটবৃক্ষের ক্ষীরদ্বারা জটা ধারণ করিলেন। তারপর গঙ্গানদী পার হইয়া অবশেষে বৎসদেশে উপনীত হইলেন। চারিটি মহামৃগ বধ করিয়া তাহাদের মাংসের দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়া তাঁহারা বনবাসের প্রথম রাত্রি-যাপনের জন্য বৃক্ষতলে গমন করিলেন। গভীর বনে নির্জন পরিবেশে প্রথম বনবাসযাপনের অভিজ্ঞতায় রাজপুত্র রামচন্দ্রের এতদিনের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল। তিনি অতি কাতরভাবে বিলাপ করিয়া বলিতে

লাগিলেন—মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই আজ অতিদুঃখে শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। আর সফলকামা কৈকেয়ী আজ আনন্দে পরিপূর্ণা। সহায়হীন বৃদ্ধ মহারাজ অজিতেন্দ্রিয় হইয়া কৈকেয়ীর বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন। রাজার এই মতিভ্রম ও বিপদ্ দেখিয়া মনে হয় অর্থ ও ধন হইতে কামই বলবত্তর। কারণ কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি স্ত্রীর জন্য আমার ন্যায় ছন্দানুবর্তী পুত্রকে ত্যাগ করিতে পারেন? একাকী ও সস্ত্রীক কোশলরাজ্য ভোগ করিয়া কৈকেয়ীপুত্র ভরতও সুখী হইবেন। যে ব্যক্তি অর্থ ও ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কামের অনুবর্তন করে সে রাজা দশরথের ন্যায় এরূপ বিপদাপন্ন হয়। আমার মনে হয় দশরথের বিনাশের জন্য, আমার প্রব্রজ্যার জন্য ও ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির জন্যই কৈকেয়ী আমাদের গৃহে আসিয়াছেন। লক্ষ্মণ, তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও। কারণ কৈকেয়ী তোমার মাতা ও আমার মাতাকে বিষদানে হত্যা করিতে পারেন। আমার মনে হয় জন্মান্তরে আমার জননীও অনেক রমণীর পুত্র বিয়োজন ঘটাইয়াছেন। সেজন্য তাঁহার এই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। আমি অধর্ম ও পরলোকের ভয়ে ভীত বলিয়াই নিজেকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি না।

কবি বাল্মীকিকর্তৃক রামের এরূপ চরিত্রচিত্রণ যথার্থ মানবোচিত হইয়াছে। রাম যদি তাঁহার বনগমনের জন্য কাহাকে দোষারোপ না করিতেন বা ক্রোধ প্রকাশ না করিতেন তাহা দেবজনোচিত হইত নরজনোচিত হইত না। রামের অভিমান, শোক, ক্রোধ, কৈকেয়ীর প্রতি সন্দেহ, দশরথের প্রতি কটূক্তি প্রভৃতিতে আমরা মানব রামকেই খুঁজিয়া পাই।

রাত্রিপ্রভাতে নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া গমন করিতে করিতে তাঁহারা গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে মহামুনি ভরদ্বাজের আশ্রমে পৌঁছিলেন। ভরদ্বাজ তাঁহার আশ্রম হইতে দশক্রোশ দূরবর্তী, পুণ্যময়, রমণীয় ফলফুল-পূর্ণ, হরিণযূথ ও হস্তিযূথপূর্ণ চিত্রকূটপর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে রামকে পরামর্শ দিলেন।

রাম চিত্রকূটে বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন এমন সময় সসৈন্য ভরত চিত্রকূটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণের সন্দেহ হইল যে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিতে ইচ্ছুক ভরত তাঁহাদের বিনাশের নিমিত্তই আগমন করিতেছেন। কিন্তু রাম লক্ষ্মণকে জানাইলেন—আমি

মনে করি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ভ্রাতা ভ্রাতৃবৎসল ভরত কুলধর্ম স্মরণ করিয়াই এখানে আগমন করিতেছেন।[১]

যে-রাম অরণ্যবাসের প্রথম রাত্রিতে ভরতের প্রতি তীব্র বিষোদ্‌গার করিয়াছেন তাঁহার মনের কি পরিবর্তন। ইহাতেই বোঝা যায় ভরতের প্রতি রামের বিদ্বেষ সাময়িক ও অভিমানেরই বহিঃ-প্রকাশ মাত্র।

সাক্ষাৎলাভের পর ভরতকে রামের নানা প্রশ্ন তাঁহার সুগভীর অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার পরিচয় বহন করে। তিনি প্রথমেই সন্দেহ করিয়াছেন দশরথ জীবিত থাকিতে ভরত বনে আগমন করিতে পারেন না। ভরতের বনে আসিবার দ্বিতীয় কারণ হইতে পারে শত্রুকর্তৃক অযোধ্যা আক্রমণ। রামের প্রথম সন্দেহ সত্যে পরিণত হইয়াছিল। রাম যে কতবড় রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন তাহার পরিচয় পাই ভরতকে প্রশ্নের ছলে রাজনীতির উপদেশ দানের মধ্যে। অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের জন্য ভরতের সনির্বন্ধ অনুরোধের উত্তরে সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধেও তাঁহার উপদেশ প্রণিধানযোগ্য। পিতৃবিয়োগের সংবাদে রাম প্রথমে চৈতন্য হারায়। কিন্তু স্থৈর্য অবলম্বন করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সময় লাগে নাই। ভরত যথার্থই স্থিতপ্রজ্ঞ রাম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

> ন ত্বাং প্রব্যথয়েদ্ দুঃখং প্রীতির্বা ন প্রহর্ষয়েৎ।
> সম্মতশ্চাপি বৃদ্ধানাং তাংশ্চ পৃচ্ছসি সংশয়ান্॥ ২।১০৬।৩

জাবালি নাস্তিকমত অবলম্বন করিয়া রামকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইলে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার মত খণ্ডন করিয়া আস্তিকমতবাদ প্রতিপাদন করিয়া-ছিলেন। বসিষ্ঠ কুলধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া রামকে প্রতিজ্ঞা হইতে বিরত করিতে পারেন নাই। কিন্তু রামের এক কথা—

> স হি দশরথঃ পিতা জনয়িতা মম।
> আজ্ঞাপয়ন্মাং যৎ তস্য ন তন্মিথ্যা ভবিষ্যতি॥ ২।১১১।১১

১। মন্যেঽহমাগতোঽযোধ্যাং ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ কুলধর্মমনুস্মরন্॥ ২।৯৭।৯

ভরত শেষ পর্যন্ত রামের পাদুকা লইয়া রামহীন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

অযোধ্যাকাণ্ডের প্রতিছত্রেই মানব রামচন্দ্রের পরিচয়ই বিধৃত।

ইহার পর রাম চিত্রকূট পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডকবনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। পথে বিরাধ নামক ঘোরদর্শন রাক্ষসকে বধ করিয়াছেন। শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ ও অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিদের আশ্রমে দশ বৎসর অতিক্রম করিয়া রাম পঞ্চবটীর উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। পঞ্চবটীতে অবস্থানকালে একদা লক্ষ্মণ মধ্যমভ্রাতা ভরতের প্রশংসা করিয়া মধ্যমা জননী কৈকেয়ীর নিন্দা করিলে রাম অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে জননীর নিন্দা হইতে বারিত করিয়া বলিলেন—

ন তেঽম্বা মধ্যমা তাত গর্হিতব্যা কদাচন।
তামেবেক্ষ্বাকুনাথস্য ভরতস্য কথাং কুরু॥ ৩।১৬।৩৭

রামের এই উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয় রামের ভরত অথবা ভরতজননী কাহারও প্রতি সহজাতবিদ্বেষ ছিল না। মাঝে মাঝে রামের মধ্যে যে তাঁহাদের প্রতি ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ দেখিতে পাই তাহা তাঁহার বিপজ্জনিত মানসিক বিপর্যস্ততা হইতে সঞ্জাত।

একদিন রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সুখ আলাপে ব্যস্ত এমন সময় আবির্ভাব হইল রাম ও সীতার জীবনের কুগ্রহস্বরূপা শূর্পণখার। শূর্পণখা প্রথমে রামকে পতিরূপে কামনা করিলেন। কিন্তু পরিহাসপ্রিয় রাম লক্ষ্মণকে স্বামিরূপে ভজনা করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণও পরিহাস করিলে শূর্পণখা মনে করিল রামকে পতিরূপে পাইবার পক্ষে সীতাই প্রতিবন্ধক। শূর্পণখা সীতাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। রামের আদেশে লক্ষ্মণ শূর্পণখার কর্ণ ও নাসা ছেদন করিয়া বিকৃতরূপা করিয়া দিলেন। ক্রুদ্ধা শূর্পণখা জনস্থানে গিয়া রাবণভ্রাতা খরকে সব জানাইলে খর মহাশক্তিশালী চতুর্দশ রাক্ষস প্রেরণ করিল। রাম অনায়াসে তাহাদের বধ করিলে খর-দূষণ দুই ভ্রাতা চৌদ্দ হাজার রাক্ষসসেনা লইয়া আগমন করিল। রাম ভ্রাতৃদ্বয়সহ সকল রাক্ষসকে ধ্বংস করিলেন।

খরকে বধ করিতে গিয়া রাম দুই তিন পদ পশ্চাদপসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া বহুস্থানে সমালোচিত হইয়াছে। যুদ্ধকৌশলের অঙ্গরূপে পশ্চাদপসরণ সমালোচনার যোগ্য কিনা তাহা বিবেচ্য বিষয়।

খর-দূষণের মৃত্যু সংবাদ অকম্পন নামক জনস্থানবাসী রাক্ষস রাবণকে জ্ঞাপন করিল। এদিকে শূর্পণখাও লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইয়া রাবণকে নানারূপে রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিল—

> নিহতানি শরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তেনৈকেন পদাতিনা।
> অর্ধাধিকমুহূর্তেন খরশ্চ সহদূষণঃ ॥
> ঋষীণামভয়ং দত্তং কৃতক্ষেমাশ্চ দণ্ডকাঃ।
> একা কথঞ্চিন্মুক্তাহং পরিভূয় মহাত্মনা।
> স্ত্রীবধং শঙ্কমানেন রামেণ বিদিতাত্মনা ॥ ৩।৩৪।১০-১২

লক্ষণীয় যে, রামের বিরুদ্ধে রাবণকে উত্তেজিত করিবার কালেও শূর্পণখা রামের প্রশংসাই করিয়াছেন। রাম যে স্ত্রীবধ আশঙ্কায় তাহাকে হত্যা করেন নাই তাহা কামমোহিতা রাক্ষসীও বুঝিয়াছে। অবশ্য রাবণের সহানুভূতি উদ্রেকের জন্য শূর্পণখা রাবণকে জানাইয়াছে যে তাঁহার জন্য সীতাকে আনিতে গিয়া সে লক্ষ্মণকর্তৃক লাঞ্ছিতা হইয়াছে। নিজের কামপ্রবৃত্তির কথা সে রাবণকে বলে নাই।

শূর্পণখা কর্তৃক উত্তেজিত রাজা এবার তাড়কাপুত্র মারীচকে স্বর্ণমৃগের রূপ ধরিয়া রামের আশ্রমের নিকট বিচরণ করিতে বাধ্য করিলেন। সীতা সেই চিত্রিত-দেহ মৃগকে জীবিত ধরিয়া আনিয়া দিবার জন্য রামের নিকট প্রার্থনা করিলেন। এদিকে লক্ষ্মণের বারণ সত্ত্বেও রাম সেই মৃগকে অনুসরণ করিতে করিতে বহুদূর দেশে নীত হইলেন ও ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা মারীচকে বধ করিলেন। মারীচ এবার তাঁহার রাক্ষসদেহ ধারণপূর্বক 'হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। আর এদিকে রামকে বিপন্ন মনে করিয়া সীতা তাঁহার সাহায্যার্থে লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিলে ছলান্বেষী রাবণ সীতাকে হরণ করিতে সমর্থ হইলেন।

কুবেরের ভ্রাতা দেবজয়ী বিশ্ববিখ্যাত বীর রাবণ কিন্তু সামান্য মানুষ রামের সমক্ষে সীতাকে হরণ করিতে সাহস পান নাই।

রাম সীতার অনুরোধ ও সুবর্ণপ্রভ হরিণদ্বারা এতদূর বিস্মিত ও প্রলুব্ধ হইয়াছিলে যে, লক্ষ্মণের যুক্তিযুক্ত বাক্য গ্রাহ্য করেন নাই। দেখা যাইতেছে যে, রাম সাধারণ মানবের মতই কৌতূহলী ছিলেন। নূতন বস্তু লাভের আগ্রহে তিনি লক্ষ্মণের কল্যাণজনক উপদেশ গ্রহণ

করেন নাই। নিজের এই অপরিণামদর্শিতার[১] ফল রামকে সারাজীবন ধরিয়াই ভোগ করিতে হইয়াছিল।

সীতাহরণের পর যে রামচন্দ্রকে আমরা পাই তিনি সীতাবিরহে তাঁহার সহজাত স্থৈর্য, ধৈর্য, যুক্তিবোধ সবকিছু যেন হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার এই সমস্ত গুণ যেন লক্ষ্মণে বর্তাইয়াছে। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়া ধৈর্য ধারণ করিতে বলিয়াছেন।

অবশ্য ইহার মধ্যেই দেখি রাম জটায়ুর মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

সীতাহরণজং দুঃখং ন মে সৌম্য তথাগতম্।
যথা বিনাশো গৃধ্রস্য মৎকৃতে চ পরন্তপ ।। ৩।৬৮।২৫

ইতিমধ্যে সীতান্বষণে রত ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত রাক্ষসী অয়োমুখী ও রাক্ষস কবন্ধের সাক্ষাৎ হইয়াছে। দুই ভ্রাতা মিলিয়া তাহাদের নিধন করিয়াছেন। সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধরত বালীকে রাম অলক্ষ্যে থাকিয়া তীরনিক্ষেপ করিলে বালীর জীবনাবসান ঘটিল। বালিবধ রামচরিত্রের এক অতি নিন্দিত দিক্। ইহার জন্য রাম প্রায় সর্বত্রই সমালোচিত হইয়াছেন। বালিবধের জন্য রামের সমালোচনা যথার্থ কিনা তাহা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

সুগ্রীবের সচিব হনুমান্ সীতার সংবাদ লইয়া আসিলে রাম বানরসেনা সহ রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। এদিকে রাবণকর্তৃক তিরস্কৃত ধার্মিক বিভীষণ রামের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শত্রুভ্রাতা বিভীষণকে আশ্রয় দিতে সুগ্রীব আপত্তি করিলে রাম বলিয়াছেন—

১। রামের অপরিণামদর্শিতাসম্বন্ধে প্রচলিত নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক রহিয়াছে—

(ক) অসম্ভবং হেমমৃগস্য জন্ম
তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়।
প্রায়ঃ সমাপন্নবিপত্তিকালে
ধিয়োঽপি পুংসাং মলিনীভবন্তি ।।

(খ) ন জায়তে কুত্র ন দৃষ্টপূর্বা
ন শ্রূয়তে হেমময়ী কুরঙ্গী।
তথাপি তৃষ্ণা রঘুনন্দনস্য
বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ ।।

আনয়ৈনং হরিশ্রেষ্ঠ দত্তমস্যাভয়ং ময়া।
বিভীষণো বা সুগ্রীব যদি বা রাবণঃ স্বয়ম ॥ ৬।১৮।৩৪

এখানেই রামের মহত্ত্ব। শরণাগত যদি পরমশত্রু রাবণও হয় তবুও তাঁহাকে আশ্রয়প্রদানের উদারতাপ্রদর্শন একমাত্র রামের পক্ষেই সম্ভব। বিভীষণকে আশ্রয় দিয়া রাম রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতেই রাম লঙ্কাধীশের প্রকৃত বল, ইন্দ্রজিতের মায়া ও যুদ্ধকৌশল প্রভৃতি সম্বন্ধে জানিতে পারিয়াছিলেন।

বিভীষণকে আশ্রয়দান প্রসঙ্গে রাম একবার বলিয়াছেন—

ন সর্বে ভ্রাতরস্তাত ভবন্তি ভরতোপমাঃ।
মদ্বিধা বা পিতুঃ পুত্রাঃ সুহৃদো বা ভবদ্বিধাঃ ॥ ৬।১৮।১৫

রামকর্তৃক এরূপ আত্মপ্রশংসা আমাদের নিকট বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়।

রাবণের সেনাপতি প্রহস্ত যুদ্ধে নিহত হইলে রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলেন। রাম স্বয়ং পবননন্দন হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিলেন। রাম রাবণের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে রাবণ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এই সুযোগে রাম রাবণের দীপ্তিমান্ কীরিট ছেদন করিয়া রাবণকে বলিলেন—

তস্মাৎ পরিশ্রান্ত ইতি ব্যবস্য
ন ত্বাং শরৈর্মৃত্যুবশং নয়ামি ॥
প্রযাহি জানামি রণার্দিতস্ত্বং
প্রবিশ রাত্রিঞ্চররাজ লঙ্কাম্ ॥
আশ্বস্য নির্যাহি রথী চ ধন্বী
তদা বলং প্রেক্ষ্যসি মে রথস্থঃ ॥ ৬।৫৯।১৪২-১৪৩

রাম প্রবল পরাক্রান্ত ভার্যাপহারী পরম শত্রুকে সমক্ষে পাইয়াও বধ করিলেন না কারণ সে রণক্লান্ত। প্রবল শত্রুর প্রতি এরূপ উদারতা-প্রদর্শন সাধারণ মানুষের পক্ষে কখনও সম্ভব নহে।

এদিকে ইন্দ্রজিৎ রণক্ষেত্রে মায়াসীতা স্থাপন করিয়া সকল বানরসেনার সম্মুখে তাঁহাকে বধ করিলেন। হনুমানের নিকট সীতাবধের কাহিনী শুনিয়া

করেন নাই। নিজের এই অপরিণামদর্শিতার[১] ফল রামকে সারাজীবন ধরিয়াই ভোগ করিতে হইয়াছিল।

সীতাহরণের পর যে রামচন্দ্রকে আমরা পাই তিনি সীতাবিরহে তাঁহার সহজাত স্থৈর্য, ধৈর্য, যুক্তিবোধ সবকিছু যেন হারাইরা ফেলিয়াছেন। তাঁহার এই সমস্ত গুণ যেন লক্ষ্মণে বর্ত্তাইয়াছে। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়া ধৈর্য ধারণ করিতে বলিয়াছেন।

অবশ্য ইহার মধ্যেই দেখি রাম জটায়ুর মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

> সীতাহরণজং দুঃখং ন মে সৌম্য তথাগতম্।
> যথা বিনাশো গৃধ্রস্য মৎকৃতে চ পরন্তপ ॥ ৩।৬৮।২৫

ইতিমধ্যে সীতান্বেষণে রত ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত রাক্ষসী অয়োমুখী ও রাক্ষস কবন্ধের সাক্ষাৎ হইয়াছে। দুই ভ্রাতা মিলিয়া তাহাদের নিধন করিয়াছেন। সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধরত বালীকে রাম অলক্ষ্যে থাকিয়া তীরনিক্ষেপ করিলে বালীর জীবনাবসান ঘটিল। বালিবধ রামচরিত্রের এক অতি নিন্দিত দিক্। ইহার জন্য রাম প্রায় সর্বত্রই সমালোচিত হইয়াছেন। বালিবধের জন্য রামের সমালোচনা যথার্থ কিনা তাহা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

সুগ্রীবের সচিব হনুমান্ সীতার সংবাদ লইয়া আসিলে রাম বানরসেনা সহ রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। এদিকে রাবণকর্তৃক তিরস্কৃত ধার্মিক বিভীষণ রামের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শত্রুভ্রাতা বিভীষণকে আশ্রয় দিতে সুগ্রীব আপত্তি করিলে রাম বলিয়াছেন—

১। রামের অপরিণামদর্শিতাসম্বন্ধে প্রচলিত নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক রহিয়াছে—

> (ক) অসম্ভবং হেমমৃগস্য জন্ম
> তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়।
> প্রায়ঃ সমাপন্নবিপত্তিকালে
> ধিয়োঽপি পুংসাং মলিনীভবন্তি ॥
>
> (খ) ন জায়তে কুত্র ন দৃষ্টপূর্বা
> ন শ্রূয়তে হেমময়ী কুরঙ্গী।
> তথাপি তৃষ্ণা রঘুনন্দনস্য
> বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ ॥

আনয়ৈনং হরিশ্রেষ্ঠ দত্তমস্যাভয়ং ময়া ।
বিভীষণো বা সুগ্রীব যদি বা রাবণঃ স্বয়ম ।। ৬।১৮।৩৪

এখানেই রামের মহত্ত্ব। শরণাগত যদি পরমশত্রু রাবণও হয় তবুও তাঁহাকে আশ্রয়প্রদানের উদারতাপ্রদর্শন একমাত্র রামের পক্ষেই সম্ভব। বিভীষণকে আশ্রয় দিয়া রাম রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতেই রাম লঙ্কাধীশের প্রকৃত বল, ইন্দ্রজিতের মায়া ও যুদ্ধকৌশল প্রভৃতি সম্বন্ধে জানিতে পারিয়াছিলেন।

বিভীষণকে আশ্রয়দান প্রসঙ্গে রাম একবার বলিয়াছেন—

ন সর্বে ভ্রাতরস্তাত ভবন্তি ভরতোপমাঃ ।
মদ্বিধা বা পিতুঃ পুত্রাঃ সুহৃদো বা ভবদ্বিধাঃ ।। ৬।১৮।১৫

রামকর্তৃক এরূপ আত্মপ্রশংসা আমাদের নিকট বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়।

রাবণের সেনাপতি প্রহস্ত যুদ্ধে নিহত হইলে রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলেন। রাম স্বয়ং পবননন্দন হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিলেন। রাম রাবণের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে রাবণ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এই সুযোগে রাম রাবণের দীপ্তিমান্ কীরিট ছেদন করিয়া রাবণকে বলিলেন—

তস্মাৎ পরিশ্রান্ত ইতি ব্যবস্য
ন ত্বাং শরৈর্মৃত্যুবশং নয়ামি ।।
প্রযাহি জানামি রণার্দিতস্ত্বং
প্রবিশ্য রাত্রিঞ্চররাজ লঙ্কাম্ ।।
আশ্বস্য নির্যাহি রথী চ ধন্বী
তদা বলং প্রেক্ষ্যসি মে রথস্থঃ ।। ৬।৫৯।১৪২-১৪৩

রাম প্রবল পরাক্রান্ত ভার্যাপহারী পরম শত্রুকে সমক্ষে পাইয়াও বধ করিলেন না কারণ সে রণক্লান্ত। প্রবল শত্রুর প্রতি এরূপ উদারতা-প্রদর্শন সাধারণ মানুষের পক্ষে কখনও সম্ভব নহে।

এদিকে ইন্দ্রজিৎ রণক্ষেত্রে মায়াসীতা স্থাপন করিয়া সকল বানরসেনার সম্মুখে তাঁহাকে বধ করিলেন। হনুমানের নিকট সীতাবধের কাহিনী শুনিয়া

রাম মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে বিভীষণ মায়াসীতার রহস্য প্রকাশ করিয়া লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিলা মন্দিরে যাইবার জন্য মন্ত্রণা দিলে চিত্তের অধীরতাবশতঃ রাম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বিভীষণকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

নৈর্ঋতাধিপতে বাক্যং যদুক্তং তে বিভীষণ।
ভূয়স্তচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি যত্তে বিবক্ষিতম্ ॥ ৬।৮৫।৩

এখানে আমরা রামকে সাধারণ মানুষের মত অধীরতাযুক্ত দেখিতে পাই যিনি বিপদে ধৈর্য হারাইয়া যুক্তিযুক্ত বাক্য শুনিয়াও তাহার অর্থ বুঝিতে অসমর্থ হন।

লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎ বধ করিলে রাম সম্মুখ যুদ্ধে রাবণকে নিহত করিলেন। কিন্তু পরমশত্রু রাবণের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ অবশিষ্ট ছিল না। বিভীষণ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না রাবণের সৎকার করা রামের অভিপ্রেত কিনা। তাই তিনি রাবণের কার্যসমূহ নিন্দা করিয়া রঘুনন্দনের মনোভাব জানিতে চাহিলেন। তদুত্তরে রাম উদারভাবে বলিয়াছেন—

মরণান্তানি বৈরাণি নির্বৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্।
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব ॥ ৬।১০৯।২৫

রাবণের সৎকার সম্পন্ন হইলে পর রাম বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাম বিভীষণকে আদেশ দিলেন তিনি যেন সীতাকে দিব্য আভরণদ্বারা বিভূষিত করিয়া রামের নিকট আনয়ন করেন। রামের আদেশে সীতা বিশাল জনসংঘের মধ্য দিয়া পদব্রজে বিভীষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রামসমীপে উপস্থিত হইলেন।

এবার রামের এক নূতন রূপ দেখিতে পাই। তিনি সীতাকে জানাইলেন যে, তিনি সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কেশ্বর রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নাই। তাঁহার লঙ্কাজয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য নাকি পৌরুষপ্রদর্শন। সীতার অপহরণজনিত অপবাদ ও প্রখ্যাত বংশের কলঙ্ক অপনয়নের জন্যই তিনি এত কাণ্ড করিয়াছেন। অথচ যুদ্ধচলাকালীন রামকে অন্যরূপ বলিতেই শুনিয়াছি। অবশ্য সীতাও রামকে ছাড়িয়া কথা বলেন নাই। তিনিও রামকে প্রাকৃতজনতুল্য বলিয়াছেন।

অপমানিতা সীতা আত্মবিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়া অগ্নিতে প্রবেশ

করিলেন। কিন্তু অগ্নিদেব স্বয়ং অনিন্দিতা ও অবিকৃতা সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া আসিয়া রামকে বলিয়াছেন—

এষা তে রাম বৈদেহী পাপমস্যাং ন বিদ্যতে। ৬।১১৮।৫

তদুত্তরে রাম জানাইলেন—সীতার চারিত্রিক শুদ্ধতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সীতাকে পরীক্ষা ব্যতিরেকে গ্রহণ করিলে জনগণ বলিত, দশরথপুত্র অনভিজ্ঞ ও কামপরতন্ত্র। সুতরাং সীতা অনন্য-হৃদয়া জানিয়াও তিনি অগ্নিপ্রবেশকারিণী সীতাকে নিবৃত্ত করেন নাই।

অগ্নিপরীক্ষার পর রামসীতা বানর ও রাক্ষসসমূহের সহিত পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। নিষাদরাজ গুহ ও ভরতকে পূর্বেই সকল বৃত্তান্ত জানাইবার জন্য রাম হনুমানকে প্রেরণ করিলেন। তিনি হনুমানকে বলিয়া দিলেন, সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া ভরতের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয় তাহা যেন তাঁহার মুখবর্ণ ও আকার ইঙ্গিত দেখিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে। আকার ইঙ্গিতে যদি বোঝা যায় ভরতের রাজ্যলোভ আছে তবে ভরতই রাজ্যশাসন করিবেন। রাম আর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিবেন না।

এখানে আমরা রামের জাগতিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাই। কারণ মানুষের মন অতি সহজেই পরিবর্তিত হয়। চতুর্দশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ভরতের রাজ্যের প্রতি আসক্তি জন্মিতেও পারিত। ইহার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যসম্পদের প্রতি রামের চরম অনীহার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

রামের রাজ্যাভিষেক সুসম্পন্ন হইয়াছে। অযোধ্যার প্রজাবৃন্দ রাজারূপে রামকে পাইয়া অত্যন্ত সুখী। ইতিমধ্যে কথাপ্রসঙ্গে রাম বয়স্য ভদ্রের নিকট জানিতে পারিলেন যে, রাবণকর্তৃক অপহৃতা সীতাকে গ্রহণ করায় প্রজাবৃন্দ রাম সম্বন্ধে নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছে। মর্মাহত রাম বাল্মীকির আশ্রমে গর্ভবতী সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিবার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন। সীতা পরিত্যাগের পর বিরহকাতর রাম চারিদিন কোনও রাজকার্য করিলেন না। কিন্তু তাঁহার কর্তব্যবুদ্ধি পুনরায় তাঁহাকে স্বকার্যে ব্যাপৃত রাখিল। তিনি মনকে সংযত করিয়া রাজ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল গত হইলে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন। অন্যান্য ঋষিগণের সহিত বাল্মীকি মুনিও তাঁহার যজ্ঞসভায়

আমন্ত্রিত হইলেন। বাল্মীকির সহিত রামের দ্বাদশবর্ষীয় পুত্রদ্বয় লব ও কুশ সেই সভায় আগমন করিল। লব ও কুশের মুখে রামায়ণ গান শুনিয়া রাম বুঝিতে পারিলেন গায়কদ্বয় তাঁহার পুত্র ব্যতীত কেহ নহে। রাম সীতাকে আনয়ন করিবার জন্য বাল্মীকির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। বাল্মীকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সীতা রাজসভায় আগমন করিলে রাম জনসমক্ষে সীতার বিশুদ্ধি প্রমাণ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সীতা স্ববিশুদ্ধির প্রমাণ দিবার জন্য জননী বসুন্ধরার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। মাতা বসুন্ধরাও দ্বিধাবিভক্ত হইয়া স্বীয় ক্রোড়ে সীতাকে গ্রহণ করিলেন। ইহার পর কিছুকাল রাজত্ব করিয়া ৬৯ বৎসর বয়সে রাম সরযূর জলে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। মহাত্মা রামের কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

বর্তমান নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে যখন নীতিবোধ, কর্তব্যবোধ, উদারতা, ভ্রাতৃপ্রেম ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন প্রভৃতি শব্দগুলি আভিধানিক শব্দমাত্রে পর্যবসিত তখন পারিধির মত বিশাল ও বৈচিত্র্যময়, হিমালয়ের মত উন্নত, আকাশের মত উদার রামচরিত্রের মূল্যায়ন অতি দুষ্কর কার্য। আদিকাণ্ডে যে রামকে পাই, যিনি দ্বাদশ-বর্ষেই তাড়কা প্রভৃতি রাক্ষসীর বিনাশসাধন করিয়াছেন অবহেলায়। কিন্তু এই বয়সে এরূপ অসম্ভবকার্য সম্পাদনের জন্য তাঁহার কোন আত্মশ্লাঘা নাই। তিনি একইরূপ বিনীতভাবে ঋষি বিশ্বামিত্রের সহিত বাক্যালাপ করিয়াছেন। জনসভায় হরধনুভঙ্গকারী রামের মধ্যে আমরা কোনরূপ চাপল্য খুঁজিয়া পাই না। সীতাকে বিবাহ করিয়া ফিরিবার কালেও আমরা দেখি ত্রিভুবনের বিখ্যাত বীর পরশুরাম তাঁহার শক্তি-পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছেন হরধনুসদৃশ অপর ধনুদ্বারা। কিছুমাত্র ভীত না হইয়া রাম পরশুরামের স্পর্ধার সম্যক্ উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহার জন্য বিন্দুমাত্র গর্বপ্রকাশ করেন নাই।

বৃদ্ধ দশরথ প্রিয়পুত্র রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাহিলে রাম আনন্দে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তাঁহার আনন্দের সংবাদ জননী ও জায়াকে জানাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন কৈকেয়ী তাঁহাকে

রাজ্যাভিষেকের পরিবর্তে বনে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইলেন তখন বনগমনের মানসিক প্রস্তুতির অভাবও তাঁহার মধ্যে দেখা যায় নাই। সাংসারিক জীবনে আমাদের অনুরূপ অভিজ্ঞতাই ঘটে। বাস্তব জীবনে আশাহত মানুষ কখনও দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যকে সম আসনে বসাইতে প্রস্তুত নয়। এখানেই রামের সঙ্গে সাধারণ লোকের পার্থক্য। বিপদের মুহূর্তে দুই একবার তিনি ভরত ও কৈকেয়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। কিন্তু রামচরিত্রে যদি এরূপ দুই একটা অসঙ্গতি ধরা না পড়িত তবে রাম কেবলমাত্র দেবতারূপেই পূজিত হইতেন, মানবের আদর্শ হইতে পারিতেন না। রামচরিত্রের আরও ক্রটি আমাদের চোখে ধরা পড়ে, সেগুলি সম্বন্ধেও একথা বলা চলে যে রামের চরিত্রে ঐসকল ক্রটি আছে বলিয়াই তিনি দোষগুণমণ্ডিত মানবগণের আদর্শ হইতে পারিয়াছেন। ক্রটিবিহীন চরিত্রের অধিকারী একমাত্র দেবতারাই হইতে পারেন।

মহাভারতের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত সিংহাসন লাভের জন্য বহুরকম ঘৃণিত চক্রান্ত অনুষ্ঠিত হইতে আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু লব্ধপ্রায় সিংহাসনকে অবহেলায় ত্যাগ করিবার দৃষ্টান্তের একক ব্যতিক্রম হিসাবে রামচরিত্র আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে। সিংহাসন লাভের জন্য শুধুমাত্র মৌখিক ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কৈকেয়ী ব্যতীত সবাই তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিত। কিন্তু অন্তরে যাঁহার গভীর বৈরাগ্য ঐশ্বর্য তাঁহাকে কোনরূপ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে না। তাঁহার কাছে রাজত্ব ও বনবাসে বড় একটা পার্থক্য নাই কর্তব্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই রাম তাঁহার সমস্ত জীবনকে পরিচালিত করিয়াছেন। কখনও রাম পুত্র হিসাবে কর্তব্যসম্পাদন করিয়াছেন, কখনও বা নৃপতিরূপে। কিন্তু তাঁহার এই কর্তব্যপালনরূপ কর্মের মধ্যেও রহিয়াছে পরম বৈরাগ্যবোধ। হয়তো তিনি কখনও অধীর হইয়া পড়িয়াছেন, ধৈর্যচ্যুতিও তাঁহার ঘটিয়াছে। কিন্তু মনকে সংযত করিয়া কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হইতে তাঁহার স্বল্প সময়ই লাগিয়াছে।

এই চারিত্রিক মাহাত্ম্যের জন্যই রাজর্ষিকল্প রাম মানব হইয়াও দেবতার পর্যায়ে উন্নীত।

ভরত

রামায়ণমহাকাব্যের চরিতাবলীর মধ্যে একটি আদর্শতম চরিত্রের অধিকারী হইতেছেন ভরত। এই মহাকাব্যের প্রধান চরিত্রগুলি আলোচনা করিলে প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে কিছু দোষ ধরা পড়িবে। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম ভরত, যাঁহার কোন স্খলন আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু তবুও বিনাদোষে অকারণে বহুবার কলঙ্কলিপ্ত হইয়াছে এই চরিত্রটি। দশরথ, কৌশল্যা, রাম, লক্ষ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজাবৃন্দ, গুহ অথবা ভরদ্বাজ প্রত্যেকেই ভরতকে সন্দেহ করিয়াছেন ও তাঁহাকে দুঃখপ্রদান করিয়াছেন। ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম বা আত্মত্যাগ লক্ষ্মণ অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। কিন্তু এই ভ্রাতৃপ্রীতি বা স্বার্থত্যাগ কোনকিছুর জন্যই ভরত তাঁহার প্রাপ্য স্বীকৃতি লাভ করেন নাই। সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীর নিকট রামলক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম আদর্শ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ভরতের ভ্রাতৃপ্রেমের কথা কখন কাহারও স্মরণে আসে না। ইহার জন্য মনে হয় কতকটা তাঁহার জননী কৈকেয়ীই দায়ী। মাতার হঠকারিতার মূল্য পুত্রকে পদে পদে দিতে হইয়াছে। ভরত যে কৈকেয়ীর সন্তান ইহা যেন কেহ ভুলিতে পারে না। মাতার চরিত্রের কালিমা পুত্রের মহত্বকে ম্লান করিয়া তুলিয়াছে।

ভরত যে মহৎ, ধার্মিক ও আদর্শস্থানীয় ইহা জানিয়াও ভরতের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করিতে কেহ ছাড়ে নাই। কিন্তু নিজ জননী ব্যতীত কাহারও প্রতি ভরতের কোন অভিযোগ ছিল না। তিনি কোন ব্যাপারেই কাহারও বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করেন নাই। তবু ষড়্‌যন্ত্র না করিয়াও ষড়্‌যন্ত্রের যেন তিনিই নায়ক এরূপ ধারণায় সকলের নিকট তিনি লাঞ্ছিত হইয়াছেন। এজন্য তিনি কখনও ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই। পিতার মৃত্যুর পর চতুর্দশ বৎসর ধরিয়া ভরত কেবল দুঃখই পাইয়াছেন। রামকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিতে না পারিয়া তিনি রাজ্যশাসন করিতে থাকিয়াই চীরবস্ত্র ও জটাধারণ করিয়াছেন। বনে থাকিয়া সন্ন্যাসব্রত ও ব্রহ্মচর্য-পালন করা অনেক সহজসাধ্য। কিন্তু চরম ভোগ ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকিয়া ব্রহ্মচর্যপালন করা হইতে অধিক কৃচ্ছ্রসাধন আর কি হইতে পারে?

সুতীব্র বৈরাগ্যবোধ ভরতচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। অযাচিতভাবে রাজলক্ষ্মী ধরা দিলেও তাঁহার নিকট হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। চেষ্টা বিফল হইলে রামের পাদুকাদ্বয়কে প্রতিনিধি করিয়াই রাজ্যশাসন চালাইয়াছেন। পরলোক গমন করিবার পূর্বে রাম তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইতে চাহিলে তিনি তাহা অবহেলাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া রামের অনুগমন করাই অধিকতর কাম্য মনে করিয়াছেন। এভাবে ত্যাগের মহিমায় ভরত চরিত্র ভাস্বর।

মহাকাব্যে ভরতের বীর্যবত্তা দেখাইবার কোন সুযোগ ছিল না। কারণ ভরতকে কখনও যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হয় নাই। সুতরাং তাঁহার পরাক্রমের কথা আমরা জানিতে পারি না। কিন্তু ভরত যে সুশাসক ছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। কারণ তাঁহার রাজত্বকালে রাজকোষের অর্থ দশগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রজাগণও তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রকাশ করেন নাই। তবে ভরতের যে পৌরুষের অভাব ছিল না তাহা বোঝা যায় তাঁহার দৈবের উপর নির্ভরতা না দেখিয়া। তিনি বিনা কারণে অনেক কষ্ট পাইয়াছেন। কিন্তু একবারও দৈবকে কারণ বলিয়া অভিযোগ করেন নাই। সকল দুঃখ-কষ্ট তিনি পৌরুষসহকারে সহ্য করিয়াছেন।

ধীর, স্থির, বিবেচক ও ধার্মিক দশরথের এই পুত্রটি বহু ত্যাগ-স্বীকার করিলেও তাঁহার সকল প্রকার স্বার্থত্যাগই অবিজ্ঞাপিত রহিয়াছে। অবশ্য ভরত তাঁহার কার্যাবলী বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যস্তও নহেন। শান্তভাবে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া নিজ কর্তব্যপথে অবিচলিত থাকিয়া তিনি জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত অতিবাহিত করিয়াছেন।

মহারাজ দশরথের দ্বিতীয় পুত্র ভরত ও জ্যেষ্ঠপুত্র রামের বয়সের ব্যবধান মাত্র একদিনের। লক্ষ্মণ যেরূপ রামের অনুগত সেরূপ শত্রুঘ্নও ভরতের নিত্যসহচর। মাণ্ডবীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার পর ভরত কেকেয়রাজ্যে মাতুলগৃহে অবস্থান করিয়াছেন। ভরত সম্বন্ধে দশরথের অতি উচ্চ ধারণা ছিল। কিন্তু কৈকেয়ীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন বলিয়াই হয়তো ভরত সম্বন্ধে তাঁহার ভীতি ছিল। কারণ রামকে তিনি বলিয়াছিলেন যে ভরত অযোধ্যা হইতে দূরে থাকাকালীনই রামচন্দ্রের অভিষেক সম্পন্ন হওয়া উচিত। এই সময়েও তিনি ভরতের গুণাবলীর উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। তিনি ভরত সম্বন্ধে বলিয়া-ছিলেন—

তোমার ভ্রাতা ভরত নিয়ত সদাচর রত, তোমার অনুগামী, ধর্মপরায়ণ, দয়ালু ও জিতেন্দ্রিয়।[১]

কৈকেয়ী নিজপুত্র ভরতের জন্য রাজ্য প্রার্থনা করিলে দশরথের উত্তরদানের মাধ্যমে দেখিতে পাই এই পুত্রটি সম্বন্ধে দশরথের কি প্রকার শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তিনি দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন—ন কথঞ্চিদৃতে রামাদ্ভরতো রাজ্যমাবসেৎ। (২।১২।৬১)। আবার বলিয়াছেন—আমি ভরতকে রামাপেক্ষাও ধার্মিক মনে করি। (২।১২।৬২)।

রামের বনগমনের পূর্বে সপ্তত্রিংশ সর্গে পুনরায় দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছেন—ভরত যদি আমার পুত্র হয় তবে পিতাকর্তৃক অদত্ত রাজ্য কখন গ্রহণ করিবে না। তোমার সহিত পুত্রের মত ব্যবহার করিবে না। তুমি মৃত্যুবরণ করিলেও পিতৃবংশচরিত্রজ্ঞ ভরত অন্যরূপ কার্য করিবে না। তুমি পুত্রের প্রিয়কার্য করিতে গিয়া অপ্রিয় কার্যই করিয়াছ।[২]

আমরা খুবই বিস্ময় অনুভব করি যে-পুত্রের প্রতি পিতার এরূপ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রহিয়াছে তাঁহাকে কেন দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্র রামের অভিষেক-কার্যের সময় অযোধ্যায় আনয়ন করিতে ভীত হইলেন। কার্যতঃ আমরা দেখিতে পাই পিতার মৃত্যুর পর ভরত কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ভাবিয়াছিলেন রামের অভিষেক যজ্ঞানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়াই তিনি সত্বর অযোধ্যায় আনীত হইয়াছেন।

দশরথের মৃত্যুর পর কেকেয়প্রদেশস্থ ভরতকে সত্বর অযোধ্যায় আনিবার জন্য বসিষ্ঠকর্তৃক দূত প্রেরিত হইয়াছে। এদিকে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া রাম, দশরথ প্রভৃতির জন্য ভরতের হৃদয়ও ভারাক্রান্ত। বসিষ্ঠের বার্তা পাইয়া ভরত অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়াই পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন। সেখানে দশরথকে দেখিতে না পাইয়া মাতৃগৃহে প্রবেশ করিয়া ভরত পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। 'পিতা কোথায় আছেন'—এই প্রশ্নের উত্তরে কৈকেয়ী

১। কামং খলু সতাং বৃত্তে ভ্রাতা তে ভরতঃ স্থিতঃ।
জ্যেষ্ঠানুবর্তী ধর্মাত্মা সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২।৪।২৬

২। যদ্যপি ত্বং ক্ষিতিতলাদ্ গগনং চোৎপতিষ্যসি।
পিতৃবংশচরিত্রজ্ঞঃ সোঽন্যথা ন করিষ্যতি॥
তত্ত্বয়া পুত্রগর্ধিন্যা পুত্রস্য কৃতমপ্রিয়ম্।
লোকে নহি স বিদ্যেত যো ন রামমনুব্রতঃ॥ ২।৩৭।৩১-৩২

জানাইলেন যে, পৃথিবীতে সকল প্রাণীর যা গতি হয় তিনিও সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা শুনিয়া পিতৃশোকে বিহ্বল ভরত ভূমিতে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, দশরথ রামকে অভিষিক্ত করিবেন ও যজ্ঞানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইবে এই কথা ভাবিয়াই তিনি অযোধ্যায় যাত্রা করিয়াছেন। তাহার পর তিনি পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মৃত্যুকালে ভরত সম্বন্ধে দশরথ কি বলিয়াছেন তাহা জানিতে চাহিলে নির্লজ্জা কৈকেয়ী জানাইলেন যে, দশরথ 'হা রাম!' 'হা সীতে!' বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কৈকেয়ীর মুখে রামসীতার বনগমনের সংবাদ শুনিয়া নিজ বংশের মহিমার কথা চিন্তা করিয়া ভীত হইলেন। কিন্তু জননীর নিকট জানিতে পারিলেন যে কোন অপকর্মহেতু নয়, কৈকেয়ীর ইচ্ছাপূরণের জন্যই রামচন্দ্র বনে নির্বাসিত হইয়াছেন। ভরত তখন অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া বলিলেন--পিতা ও পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠভ্রাতৃহীন হইয়া আমি নিহত হইলাম। সুতরাং রাজ্যদ্বারা আমার কি হইবে? তুমি রাজাকে নিহত করিয়া ও রামকে বনে প্রেরণ করিয়া ব্রণের উপর ক্ষারসংযোগের ন্যায় দুঃখের উপর দুঃখ দিয়াছ। আর তোমার প্রতি রামের যদি মাতৃতুল্য শ্রদ্ধা না থাকিত তাহা হইলে তোমাকে পরিত্যাগ করিতে আমি কুণ্ঠিত হইতাম না। কৈকেয়ি! নৃশংসা তুমি রাজ্য হইতে নির্বাসিত হও। ধর্ম তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তুমি সর্বলোকের প্রিয় রামকে নির্বাসিত করিয়া আমারও ভয় জন্মাইয়া দিয়াছ। তুমি আমার মাতৃরূপিণী শত্রু।[১] অমাত্যগণের নিকট ভরত নিজের দোষহীনতার কথা বলিতে থাকিলে শোকসন্তপ্তা কৌশল্যা ভরতকে বহিলেন—বৎস, রাজ্যকামনাকারী তুমি নিষ্কণ্টক রাজ্য পাইলে। কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর কর্মদ্বারা তুমি এই রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছ। কৌশল্যা ভর্ৎসনা করিতে থাকিলে--বিব্যথে ভরতোঽতীব ব্রণে তুদ্যেব সূচিনা। ২।৭৫।১৭

ভরত তখন নানাবিধ শপথবাক্য উচ্চারণ করিয়া কৌশল্যার বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেন।

দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া প্রবাস জীবনযাপন করিলেও ভরতের চিত্তে অযোধ্যার স্মৃতি সদা জাগরূক ছিল। দুঃস্বপ্ন দেখিবার পর তিনি পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু দূতগণের

১। ২।৭৩।২-৪,
২।৭৪।৫-৭

নিকট তাঁহাদের কুশলবার্তা শুনিয়া নিশ্চিন্ত বোধ করিয়াছেন। মাতার মুখে পিতৃবিয়োগের কথা শুনিয়া ভরত বড় আশা করিয়াছিলেন যে মৃত্যুকালে দশরথ নিশ্চয়ই প্রবাসী পুত্রটির জন্য কিছু বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি শুনিতে পাইলেন তাহা নহে, রামসীতা ও লক্ষ্মণের কথা বলিতে বলিতেই দশরথ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। নিজ বংশের মহিমা সম্বন্ধে ভরত বড় সচেতন। রামচন্দ্রের বননির্বাসনের কথা শুনিয়া ভরত ভাবিয়া লইয়াছিলেন যে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা বংশের পক্ষে কলঙ্কজনক কিছু করিয়াছেন। কিন্তু বিনামেঘে বজ্রপাতের ন্যায় শুনিলেন, সকল কিছুর জন্য দায়ী হইতেছেন তাঁহার জননী। তাহা তিনি করিয়াছেন ভরতের রাজ্যলাভের নিমিত্তই। ভরত তাঁহার জননীকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। ভরত বুঝিয়াছিলেন যে ষড়্‌যন্ত্রের ব্যাপারে না থাকিলেও সকলেই সন্দেহ করিবে ইহাতে ভরতও জড়িত। সেজন্য তিনি অমাত্যদের সম্মুখে নিজের নির্দোষিতার প্রমাণ দিতে চাহিয়াছেন। কৌশল্যা যখন ভরতকে রাজ্যকামনাকারী বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন তখন ভরতের জন্য আমরাও যেন ব্রণে সূচিবিদ্ধ-হওয়ার বেদনা অনুভব করি।

দ্বাদশ দিবসে শ্রাদ্ধকার্য সমাপন করিয়া শোকবিহ্বল ভরত শত্রুঘ্নকে বলিতে লাগিলেন যে, লক্ষ্মণ কেন পিতাকে নিগৃহীত করিয়া রামকে মুক্ত করিলেন না। স্ত্রীর বশীভূত হইয়া রাজা নীতিবিরোধী পথ অবলম্বন করিবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণের উচিত ছিল ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করিয়া রাজাকে নিগৃহীত করা। এমন সময় বহুভূষণভূষিতা কুব্জা দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে দৌবারিক জানাইলেন যে রামের বনবাস ও পিতার মৃত্যু প্রভৃতি সকল কিছুর জন্য দায়ী এই কুব্জা। দৌবারিকের কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে উন্মত্ত শত্রুঘ্ন কুব্জাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া কৈকেয়ীকে নানা কটুবাক্য বলিতে লাগিলেন। ভরত শত্রুঘ্নকে নারীহত্যা করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন যে, তিনি নিজেই কৈকেয়ীকে মারিয়া ফেলিতেন যদি রাম মাতৃহন্তা বলিয়া তাঁহার প্রতি ক্রোধান্বিত না হইতেন—

হন্যামহমিমাং পাপাং কৈকেয়ীং দুষ্টচারিণীম্।
যদি মাং ধার্মিকো রামো নাসূয়েন্মাতৃঘাতকম্ ॥ ২।৭৮।২২

আর যদি ভরত মাতৃহত্যা করে রাম তাঁহার সহিত বাক্যালাপও করিবেন না। বাধ্য হইয়া শত্রুঘ্ন সংজ্ঞাহীনা কুব্জাকে ছাড়িয়া দিলেন।

লক্ষ্মণের সহিত ভরতের মতের সাদৃশ্য আমরা লক্ষ্য করি। নীতিবিগর্হিত কার্য যদি পিতামাতাও করেন তাঁহাদের হত্যা করিতে ভরত বা লক্ষ্মণ কেহই বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত নহেন।

চতুর্দশ দিবসে প্রভাতসময়ে অমাত্যগণ মিলিয়া ভারতকে রাজ্যগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে ভরত জানাইলেন যে, তিনি এই সকল অভিষেক দ্রব্য লইয়া বনে গিয়া রামকে ফিরাইয়া আনিবেন ও নিজে চতুর্দশ বৎসর বনবাস করিবেন। এদিকে সূতগণ ভরতের বন্দনাগান করিলে তিনি 'আমি রাজা নহি' বলিয়া নিষেধ করিলেন। ধর্মাত্মা বসিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সৈনিক ও সেনানায়কগণকে সভাগৃহে আসিতে আদেশ দিলেন। সুমন্ত্র, যুধাজিৎ প্রভৃতি সকলে আসিবার পর ভরত আসিলেন। ভরতকে দেখিয়া প্রজাগণ ইন্দ্রকে যেমন দেবগণ অভিনন্দিত করেন সেরূপ অভিনন্দিত করিলেন।

পরিপূর্ণ সভাতে ধর্মবিৎ বসিষ্ঠ প্রজাদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভরতকে পিতা ও ভ্রাতা কর্তৃক প্রদত্ত রাজ্যগ্রহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু ভরত জানাইলেন যে, জ্যেষ্ঠপুত্র রাম ব্যতীত আর কেহ অযোধ্যার রাজা হইতে পারেন না। সুতরাং বন হইতে রামকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। অন্যথায় তিনিও বনে বাস করিবেন।

পরদিবস প্রভাতে প্রজাবৃন্দ ও সৈন্যসহ রামকে আনিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথে শৃঙ্গবেরপুরে রামসখা গুহের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ভরত ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমের গন্তব্যপথ জানিতে চাহিলে গুহ ভরতের প্রতি নিজসন্দেহের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

কচ্চিন্ন দুষ্টো ব্রজসি রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
ইয়ং তে মহতী সেনা শঙ্কাং জনয়তীব মে ॥ ২।৮৫।৭

কিন্তু মধুর স্বভাবযুক্ত ভরত তাহাকে ভয়হীন করিয়া জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার পিতৃসম ভ্রাতা রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য গমন করিতেছেন। তখন গুহ সানন্দে বলিয়া উঠিলেন—

তোমার শাশ্বতী কীর্তি অমর হইয়া থাকিবে। কারণ তুমি ক্লেশপ্রাপ্ত রামকে ফিরাইয়া আনিতে যাইতেছ।[১]

কথাপ্রসঙ্গে গুহের নিকট রামলক্ষ্মণের তৃণশয্যায় রাত্রিবাসের কাহিনী শুনিয়া অঙ্কুশবিদ্ধ হস্তীর ন্যায় ব্যথিত ভরত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

রামের তৃণশয্যা দেখিয়াই ভরত স্থির করিলেন সেদিন হইতে তিনিও তৃণশয্যায় শয়ন করিবেন ও জটাচীরধারণপূর্বক ফলমূল ভক্ষণ করিবেন। এদিকে গঙ্গা পার হইয়া ভরদ্বাজমুনির সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনিও ভরতের বনগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। আত্যন্তিক দুঃখিত ভরত বলিলেন যে, সর্বজ্ঞ হইয়াও ভরদ্বাজ যদি তাঁহার দোষাশঙ্কা করেন তবে তাঁহার জন্ম বৃথা। তখন ভরদ্বাজ জানাইলেন যে, তিনি সকল জানিয়াও ভরতের যশোবৃদ্ধির জন্য এরূপ বলিয়াছেন।

এদিকে চিত্রকূটে বন্যজন্তুদের পলায়ন করিতে দেখিয়া রাম বুঝিতে পারিলেন, নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়াছে। শালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া লক্ষ্মণ ভরতের সৈন্যবাহিনীকে দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন যে, নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করিবার জন্য রামলক্ষ্মণকে বধের উদ্দেশ্যেই ভরতের আগমন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার দুরবস্থার কারণ অদ্য উপস্থিত। সুতরাং সে অবশ্যই বধ্য। কিন্তু রাম লক্ষ্মণকে সমর্থন না করিয়া জানাইলেন, প্রাণাধিক প্রিয়তম ভ্রাতা ভরত কুলধর্ম স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া লইতে আসিতেছেন।

ভরতের মহাদুর্ভাগ্য, প্রতিপদে সন্দেহের ডালি মাথায় লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। অথচ রামায়ণে সর্বাপেক্ষা নির্মল চরিত্রের অধিকারী বোধ হয় ভরত। কিন্তু এই বিনম্র, ভদ্র ও চারিত্র্যযুক্ত দশরথ-তনয়ের প্রতি যে যাহার খুশীমত কর্দম নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। ভরতচরিত্রের 'ট্রেজেডি' এখানেই।

রামকে দেখিবামাত্র ভরত 'আর্য' এই একটি কথামাত্র উচ্চারণ করিতে পারিলেন। রামকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের জন্য বহু অনুনয় বিনয় করিলে রাম জানাইলেন, তিনি পিতৃপ্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে

১। শাশ্বতী খলু তে কীর্তির্লোকাননুচরিষ্যতি।
যস্ত্বং কৃচ্ছ্রগতং রামং প্রত্যানয়িতুমিচ্ছসি॥ ২।৮৫।১৩

পারেন না। পিতৃদত্ত রাজ্যভোগ করাই ভরতের কর্তব্য। তখন ভরত প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, কুলধর্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজধর্মের প্রতি তাঁহার কোন আসক্তি নাই। রাম বিদ্যমান থাকিতে অযোধ্যার সিংহাসনে ভরত কিভাবে বসিবেন, সর্বভূতে দয়াশীল মহেশ্বরের ন্যায় তিনি যেন ভ্রাতাকে দয়া করেন। কিন্তু পিতৃ আজ্ঞা পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাম অযোধ্যায় প্রত্যাগমনে রাজী না হইলে ভরত রামকে হেমভূষিত পাদুকাদ্বয়ে চরণ অর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি রামকে জানাইলেন যে, রামের স্পর্শযুক্ত পাদুকাদ্বয়ে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তিনি চতুর্দশ বৎসর রামের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া অযোধ্যার বহির্দেশে জটাচীরধারী হইয়া ফলমূল ভোজন করিয়া অপেক্ষা করিবেন। চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইলে রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন না করিলে তিনি অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করিবেন।

গুহের মুখে রাম ও লক্ষ্মণের জটাবল্কল ধারণ করিবার কথা শুনিবা-মাত্র ভরতও সঙ্গে সঙ্গে জটাচীর ধারণ করিয়াছেন। ভরত রামকে ফিরাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ভাল করিয়াই চিনিতেন। তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা হইতে বিরত করা অসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং সেভাবে প্রস্তুত হইয়াই রামের জন্য রত্নখচিত পাদুকাদ্বয় লইয়া আসিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পরিচয়ই বহন করে। ঐশ্বর্যের প্রতি তাঁহার প্রবল অনীহাও এই ঘটনায় প্রকাশিত।

অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনকালে ভরতের অনুরোধে রাম প্রতিনিধিস্বরূপ মণিভূষিত পাদুকা প্রদান করিয়াছেন শুনিয়া ভরতের প্রতি প্রশংসাপরায়ণ ভরদ্বাজ বলিয়াছেন—

জলাশয় প্রভৃতি যেমন পরিত্যক্ত জলসমূহ নিম্নভাগে ধারণ করে সেরূপ তোমার মত উৎকৃষ্ট চারিত্র্যযুক্ত নরশ্রেষ্ঠের মধ্যে আর্যজনোচিত গুণ থাকিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? তোমা হইতে তোমার পিতা মহাবাহু দশরথ ঋণমুক্ত হইলেন। তোমার ন্যায় ধর্মাত্মা ও ধর্মপ্রিয় যাঁহার পুত্র তাঁহার কখনও ঋণ থাকিতে পারে না।[১]

অযোধ্যায় ফিরিয়া ভরত নন্দিগ্রামে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বসিষ্ঠ ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ ভরতকে বলিলেন—

১। ২।১১৩।১৬-১৭

সুভৃশং শ্লাঘনীয়ঞ্চ যদুক্তং ভরত ত্বয়া।
বচনং ভ্রাতৃবৎসলাদনুরূপং তবৈব তৎ॥
নিত্যং তে বন্ধুলুব্ধস্য তিষ্ঠতো ভ্রাতৃসৌহৃদে।
মার্গমার্যং প্রপন্নস্য নানুমন্যেত কঃ পুমান্॥ ২।১১৫।৫-৬

ভরত পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত নন্দিগ্রামে গিয়া গুরুজনদিগকে বলিলেন—

এতদ্ রাজ্যং মম ভ্রাত্রা দত্তং সন্ন্যাসমুত্তমম্।
যোগক্ষেমবহে চেমে পাদুকে হেমভূষিতে॥ ২।১১৫।১৪

তিনি রামের পাদুকার উপর ছত্রধারণ করিতে আদেশ দিলেন। জটাবল্কলধারী ভরত মুনিজনোচিত বেশ ধারণ করিয়া সেনাবাহিনীর সহিত নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। ভরত স্বয়ং পাদুকাদ্বয়ের উপর ছত্র ও চামর ধারণ করিলেন ও রাজ্যশাসনবৃত্তান্তসমূহ পাদুকাদ্বয়ের উদ্দেশে নিবেদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় রাজ্যসংক্রান্ত কোন বিষয় উপস্থিত হইলে কিংবা মূল্যবান্ কোন উপঢৌকন আসিলে পাদুকাদ্বয়ে প্রথমে নিবেদন করিয়া পরে নিজে ব্যবহার করিতেন।

এরূপ ভ্রাতৃপ্রেম জগতে দুর্লভ। রামের পাদুকা ভরতের নিকট নির্জীব পদার্থ নহে। যেন স্বয়ং রামচন্দ্রের নিকট ভরত সকল কিছু নিবেদন করিতেছেন।

রাম সীতা ও লক্ষ্মণসহ ত্রয়োদশ বৎসর বনবাসে অতিক্রম করিয়াছেন। এমন সময় হেমন্তকালে গোদাবরী নদীতে স্নান করিবার কালে লক্ষ্মণ রামের নিকট ভরতের তপস্বীর ন্যায় ব্রহ্মচর্য পালনের সুপ্রচুর প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন—

জিতঃ স্বর্গস্তব ভ্রাত্রা ভরতেন মহাত্মনা।
বনস্থমপি তাপসো যস্ত্বামনুবিধীয়তে॥ ৩।১৬।৩৩

দেখা যাইতেছে লক্ষ্মণও শেষ পর্যন্ত ভরতের মহানুভবতার স্বীকৃতি না দিয়া পারেন নাই। যে-ভ্রাতাকে একদা লক্ষ্মণ হত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন, এখন তাঁহারই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বনে ব্রহ্মচর্য পালন অপেক্ষা নগরীর ভোগবিলাসের মধ্যে ব্রহ্মচর্য পালন যে অতি সুকঠিন তাহা লক্ষ্মণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন।

ইহার পরই দেখি মারীচ অনুসারী রামকে সাহায্য করিতে না যাওয়ায় লক্ষ্মণের প্রতি সীতার তিরস্কার—

সুদুষ্টস্ত্বং বনে রামমেকমেকোঽনুগচ্ছসি।
মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা ॥ ৩।৪৫।২৪

দুষ্ট স্বভাবসম্পন্ন তুই স্বয়ং অথবা ভরত কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া বনে রামকে একাকী অনুসরণ করিয়াছিস।

ইহার পূর্বে দেখিয়াছি রাম, কৌশল্যা, লক্ষ্মণ, ভরদ্বাজ ও গুহ সকলেরই সন্দেহভাজন ভরত। শেষ পর্যন্ত সীতাও ভরতকে অব্যাহতি দিলেন না।

সীতা, লক্ষ্মণ, হনুমান্ প্রভৃতি সহ রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। রাম হনুমান্‌কে ভরতের নিকট প্রেরণ করিয়া বলিলেন হনুমান্ যেন সকল বৃত্তান্ত শ্রবণের পর ভরতের মুখবর্ণ, আকার ও ইঙ্গিত লক্ষ্য করে। কিন্তু রামের আগমন সংবাদ শুনিবামাত্র ভরত আনন্দে সংজ্ঞা হারাইলেন। সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়া হনুমান্‌কে ব্যগ্রতার সহিত আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুবিন্দু দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন।

এখানে এতকাল পরেও দেখি ভরত রামের সন্দেহভাজন রহিয়াছেন। ইহাই যেন ভরতের ভাগ্যলিপি।

রাম অযোধ্যায় ফিরিবামাত্র ভরত রামকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন। রাম ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাম রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইলে ধর্মাত্মা ভরত নিষেধ করিলেন কারণ ইহাতে বহু রাজবংশের বিনাশ হইবে। ভরতের পরামর্শ রাম সানন্দে গ্রহণ করিলেন।

কালের নিকট প্রতিজ্ঞভঙ্গের নিমিত্ত ভ্রাতৃবৎসল রাম ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ভ্রাতৃবিরহে শোকাকুল রাম ভরতকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া বনে যাইতে চাহিলে ভরত জানাইলেন যে রাম ব্যতীত তিনি রাজ্যলাভ বা স্বর্গলাভ কোনটারই অভিলাষী নহেন।

সত্যেনাহং শপে রাজন্ স্বর্গভোগেন চৈব হি।
ন কাময়ে যথা রাজ্যং ত্বাং বিনা রঘুনন্দন ॥ ৭।১০৭।৬

তখন প্রজাবৃন্দের সহিত রাম ও ভরত সরযূর জলে প্রাণবিসর্জন দিলেন।

সুদুর্লভ ভ্রাতৃপ্রেম, ঐশ্বর্যের প্রতি চরম স্পৃহাহীনতা, অসাধারণ সহিষ্ণুতা, অভূতপূর্ব ধর্মবুদ্ধি ভরতচরিত্রকে এক অনন্যসাধারণ মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে।

লক্ষ্মণ

লক্ষ্মণচরিত্র চিন্তা করিলে আধুনিক যুগের সাধারণ ক্রোধী যুবার কথাই মনে উদিত হয়, যে সকলকিছুর বিরুদ্ধে সদা-সর্বদা বিদ্রোহ করিতে চায়। কিন্তু বর্তমান যুগের যুবকের সঙ্গে এই একটিমাত্র সাদৃশ্য ব্যতীত অন্য কোনরূপ একরূপতা লক্ষ্মণ চরিত্রে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কারণ লক্ষ্মণের সমস্ত কার্যাবলীর কেন্দ্রবিন্দু হইতেছে তাঁহার ভ্রাতৃপ্রেম। এই একটিমাত্র বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া লক্ষ্মণের জীবনে সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, তৃপ্তি-অতৃপ্তি, রাগ-বিরাগ, ক্রোধ-অক্রোধ সকল কিছুই প্রকাশিত হইয়াছে। রামকে বাদ দিয়া একক চরিত্র হিসাবে লক্ষ্মণ চরিত্রে যেন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। লক্ষ্মণ যেন রামে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন। আত্মসত্তা রামেতে বিলোপ করিয়াই লক্ষ্মণ তাঁহার জন্ম সার্থক মনে করিয়াছেন। লক্ষ্মণের ব্যক্তিগত বলিয়া কিছু ছিল না। লক্ষ্মণ রামের বহিশ্চর প্রাণমাত্র। এমন একটি চরিত্র পৃথিবীতে বিরল, যাহার নিকট পিতা, মাতা, স্ত্রী, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, পার্থিব সম্পদ্ কোন কিছুরই প্রাধান্য নাই। জ্যেষ্ঠভ্রাতাই একমাত্র ধ্যানজ্ঞানযথাসর্বস্ব। অগ্রজের দুঃখই অনুজের দুঃখ, অগ্রজের সুখই অনুজের সুখ। এই প্রেমের কোন বহিঃ-প্রকাশ নাই। এই অন্তর্লীন প্রীতি বিজ্ঞাপনের জন্য কখনও ব্যস্ত নহে। এই প্রীতি প্রীতিরই জন্য, অন্যকিছুর জন্য নহে।

লক্ষ্মণের নিকট রামের স্বার্থরক্ষা করিবার ব্যাপারে ধর্ম, সত্য ইত্যাদির স্থান অত্যন্ত গৌণ ছিল। দশরথ যখন রামকে বনে পাঠাইয়াছেন তখন লক্ষ্মণ এই ব্যাপারে দশরথকেই সম্পূর্ণ দায়ী মনে করিয়াছেন। সেজন্য তিনি দশরথকে বধ করিয়া রামকে সিংহাসন দিতে চাহিয়াছেন। পিতা দশরথ যে মাতা কৈকেয়ীর নিকট সত্যবদ্ধ এই কথা তিনি বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই। বননির্বাসনের প্রসঙ্গে রাম দৈবের দোহাই দিবামাত্র লক্ষ্মণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার মতে দুর্বলচিত্ত পুরুষেরাই একমাত্র দৈবের উপর নির্ভরশীল।

রাজপুত্র হইয়াও লক্ষ্মণ সকল প্রকার কর্মেই অভিজ্ঞ ছিলেন। বনবাসযাপনের জন্য যত প্রকার কায়িক-শ্রমসাধ্য কার্য ছিল সব কিছুই তিনি আনন্দিতচিত্তে সম্পন্ন করিয়াছেন। গৃহনির্মাণ করা, ঘুঁটে প্রস্তুত করা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার কার্যই রাজপুত্র লক্ষ্মণ অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। এই সকল কার্য সম্পন্ন করিতে গিয়া তিনি কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। কারণ এই সকল কার্য হইতেছে অগ্রজ রামের সুখ-বিধানের জন্য।

লক্ষ্মণ প্রথমাবধি সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, দশরথ, কৈকেয়ী ও ভরত তিনজন মিলিয়াই ষড়্যন্ত্র করিয়া রামকে বনবাসে পাঠাইয়াছেন। সেজন্য ভরত চিত্রকূটে আগমন করিলে তিনি তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাম জানাইলেন যে, লক্ষ্মণের যদি সিংহাসনলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে তিনি ভরতকে বলিয়া তাঁহাকে সিংহাসন দান করিবেন। লক্ষ্মণ তখন অতি লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। বস্তুতঃ নিজের জন্য সিংহাসনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার কোন কালেই ছিল না। তাঁহার সকল কিছু কামনা-বাসনা রামের জন্যই। অবশ্য লক্ষ্মণ পরে ভরতের আত্মত্যাগ বুঝিয়াছিলেন ও তাঁহার প্রশংসাও করিয়াছেন।

সীতাহরণের পর লক্ষ্মণের স্বভাবের পরিবর্তন আমাদের বিস্মিত করে। যে লক্ষ্মণ সর্বদা সামান্য ব্যাপারেই অধীরতা প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি পিতামাতা কাহাকেও সমালোচনা হইতে অব্যাহতি দেন নাই, সেই লক্ষ্মণই শান্ত-ধীর চিত্তে উন্মত্তপ্রায় ভ্রাতাকে শান্ত করিয়াছেন। যুক্তিসম্মত বাক্য বলিয়া ভ্রাতাকে ধৈর্যধারণ করিতে বলিয়াছেন। লক্ষ্মণ সঙ্গে না থাকিলে সীতাবিহীন রাম যে কি করিতেন তাহা বলা শক্ত। আর লক্ষ্মণ যদি সর্বদা সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে শান্ত না রাখিতেন ও তাঁহার কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে সচেতন না করিয়া দিতেন তবে রামকর্তৃক সীতা উদ্ধার হইত কিনা সন্দেহ।

প্রধান চরিত্রের ঘনিষ্ঠ সহচর হওয়ার ফলে লক্ষ্মণ রামায়ণের অন্যান্য বহু বিশিষ্ট চরিত্র অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। রামলক্ষ্মণ দুটি চরিত্র যেন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে। পৃথিবীতে কাহারও এরূপ শক্তি নাই যিনি এই শ্রেষ্ঠ চরিত্র দুটির মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিতে সক্ষম।

দশরথকর্তৃক যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বাদশ মাস পরে কর্কটলগ্নে অশ্লেষানক্ষত্রে মধ্যাহ্নকালে লক্ষ্মণের জন্ম। আর এই লক্ষ্মণ বাল্যকাল হইতেই দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামের 'বহিঃপ্রাণ ইবাপরঃ' ছিলেন। বাল্মীকি বলিয়াছেন—

লক্ষ্মণ রামকে নিজ শরীর হইতেও অতিপ্রিয় মনে করিতেন। শ্রীমান্ লক্ষ্মণ রামের বহিঃস্থিত প্রাণের ন্যায় ছিলেন। পুরুষোত্তম রামও লক্ষ্মণ ব্যতীত নিদ্রা যাইতে পারিতেন না এবং লক্ষ্মণ নিকটে না থাকিলে উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ করিতেন না।[১]

ইহাতে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় লক্ষ্মণ রামের নিকট কি ছিলেন। শুধু বাল্যকালেই নহে অন্তিম দিনটি পর্যন্ত লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে একইভাবে অনুসরণ করিয়াছেন, ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি চরম উদাসীন থাকিয়া। লক্ষ্মণের নিজস্ব বলিয়া কিছু ছিল না। না ছিল ব্যক্তিগত জীবনের সুখভোগ, না ছিল রাজৈশ্বর্যের প্রতি আসক্তি, না ধর্মের প্রতি কোন আকর্ষণ।

বিশ্বামিত্র রাক্ষসবধের নিমিত্ত দশরথের নিকট রামকে প্রার্থনা করিলে লক্ষ্মণও রামের অনুগামী হইয়াছিলেন। রাক্ষসবধের পর রাম সীতার পাণিগ্রহণ করিলেন, ঊর্মিলার সহিত লক্ষ্মণ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। লক্ষ্মণের দাম্পত্যজীবন আমাদের নিকট একেবারেই অজ্ঞাত। স্বামিরূপে লক্ষ্মণ কতদূর কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন তাহা সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণার অবকাশ নাই।

ইহার পরই আমরা লক্ষ্মণকে দেখি রামের রাজ্যাভিষেক মঙ্গলকামনায় কৌশল্যা, সুমিত্রা ও সীতার সহিত দেবার্চনায় রত। অতি আনন্দিত রাম প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে জানাইলেন—'হে লক্ষ্মণ। তুমি আমার সহিত এই পৃথিবী শাসন কর। তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা। এজন্য রাজলক্ষ্মী তোমাকে আশ্রয় করিতেছেন। আমি তোমারই জন্য জীবন ও রাজ্য প্রার্থনা করি।[২]

ভ্রাতৃস্নেহ কতদূর প্রগাঢ় হইলে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনিষ্ঠভ্রাতাকে এরূপ বাক্য বলিতে পারেন তাহা সহজেই অনুমেয়। নিঃসন্দেহে লক্ষ্মণ রামের ঐরূপ

১। সর্বপ্রিয়করস্তস্য রামস্যাপি শরীরতঃ ॥ ১।১৮।২৯
লক্ষ্মণো লক্ষ্মীসম্পন্নো বহিঃপ্রাণ ইবাপরঃ।
ন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ ॥ ১।১৮।৩০
মৃষ্টমন্নমুপানীতমশ্নাতি ন হি তং বিনা। ১।১৮।৩১

২। লক্ষ্মণেমাং ময়া সার্ধং প্রশাধি ত্বং বসুন্ধরাম্।
দ্বিতীয়ং মেঽন্তরাত্মানং ত্বামিয়ং শ্রীরুপস্থিতা ॥
সৌমিত্রে ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগাংস্ত্বমিষ্টান্ রাজ্যফলানি চ।
জীবিতং চাপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থমভিকাময়ে। ২।৪।৪৩-৪৪

স্নেহ পাইবার যোগ্য ছিলেন। কারণ পশ্চাতে দেখি লক্ষ্মণ শুধু রামের আনন্দের ভাগ নয়, দুঃখের ভাগও সমানভাবে ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত এবং তাহাতেই যেন তাঁহার আনন্দ বেশী।

কৌশল্যা রামকে বনে যাইতে নিষেধ করিলে লক্ষ্মণও তাঁহাকে সমর্থন করিয়া রামকে পরামর্শ দিলেন—জনগণ সকল বিষয়টি যতক্ষণ জানিতে না পারে তাহার মধ্যে আপনি আমার সহিত মিলিত হইয়া রাজ্য নিজের অধিকারে লইয়া আসুন। অযোধ্যাবাসী প্রতিকূলতা করিলে অযোধ্যা মনুষ্যহীন করিবেন, পিতা দশরথ বিরোধিতা করিলে তাঁহাকেও বধ করিবেন বলিয়া লক্ষ্মণ রামকে আশ্বাস দিলেন।[১] লক্ষ্মণ কৌশল্যাকে জানাইলেন যে রাম প্রদীপ্ত অগ্নি অথবা অরণ্য যেখানে প্রবেশ করিবেন, তাঁহার প্রবেশের পূর্বেই লক্ষ্মণ সেখানে প্রবেশ করিবেন।[২]

রামের সুখ-সম্পাদনের নিমিত্ত লক্ষ্মণ পিতাকেও হত্যা করিতে কুণ্ঠিত নহেন। পিতা সম্বন্ধে তিনি অশ্লীল বাক্যও প্রয়োগ করিয়াছেন। রামের জন্য অযোধ্যা জনশূন্য করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ নহেন। লক্ষ্মণের নিজের শৌর্যবীর্যের প্রতি যথেষ্ট আস্থা ছিল। তিনি তাঁহার নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়াই রামকে রাজ্য অধিকার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

রাম যখন দৈবের শপথ করিয়া লক্ষ্মণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, এই সকলকিছুই দৈবকৃত তখন লক্ষ্মণ আর ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না। রাম কেন যে অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন তাহা তিনি বুঝিতেছেন না। দশরথ ও কৈকেয়ী প্রভৃতি স্বার্থের জন্য ছলনা করিয়াই এরূপ শঠতা করিতেছেন নচেৎ সুযোগ বুঝিয়া দশরথ কৈকেয়ীকে এরূপ বরদান করিতেন না। আর এই বরদান বহুপূর্বেই হইতে পারিত। পিতামাতার বুদ্ধি দৈবের ফল হইলেও তিনি দৈবকে পছন্দ করিতেছেন না। আর যিনি পুরুষ ও বীর বলিয়া সংসারে খ্যাত তিনি কদাপি দৈবের উপাসনা করেন না। আর তাহা ছাড়া—পিতা দশরথ ত দূরের কথা, সমস্ত লোকপাল ও

১। প্রোৎসাহিতোঽয়ং কৈকয্যা সন্তুষ্টো যদি নঃ পিতা।
অমিত্রভূতো নিঃসঙ্গং বধ্যতাং বধ্যতামপি॥ ২।২১।১২

২। দীপ্তমগ্নিমরণ্যং বা যদি রামঃ প্রবেক্ষ্যতি।
প্রবিষ্টং তত্র মাং দেবি ত্বং পূর্বমবধারয়॥ ২।২১।১৭

ত্রিজগৎবাসী কেহই আপনার অভিষেকে বাধা প্রদান করিতে পারিবে না। আমি তীক্ষ্ণ অসিধার গ্রহণ করিলে ইন্দ্রকে তুচ্ছ মনে করি।[১]

এই শ্লোকগুলিতে লক্ষ্মণের যে তেজস্বিতা ও পৌরুষের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অনবদ্য। রামায়ণে কমবেশী সকলেই যখন দৈবের উপর নির্ভরশীল তখন লক্ষ্মণের এরূপ বীরত্বব্যঞ্জক বাক্য আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

এদিকে সীতাকে রামের অনুগমন করিতে দেখিয়া কিছুপূর্বের তেজস্বী লক্ষ্মণের মুখমণ্ডল বাষ্পাকুল হইয়া গেল। তিনি অগ্রজের চরণদ্বয় গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বনে যাইবার জন্য করুণ প্রার্থনা জানাইলেন—

ঐশ্বর্যং চাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা ॥ ২।৩১।৫

অন্যান্য গুরুজনদিগের অনুমতিসাপেক্ষে লক্ষ্মণ বনে যাইবার অনুমতি পাইলেন। রাম দশরথের নিকট নিজের বনগমনের অনুমতি চাহিবার সময় সীতা ও লক্ষ্মণের বনগমনের অনুমতিও চাহিয়া লইলেন।

রাম গুহের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃস্নেহ সাধারণত: অনুক্ত থাকিলেও মিত্র গুহকে লক্ষ্মণ নিজের মনের কথা না বলিয়া পারেন নাই।

ন হি রামাৎ প্রিয়তমো মমাস্তে ভুবি কশ্চন।
ব্রবীম্যেব চ তে সত্যং সত্যেনৈব চ তে শপে ॥ ২।৫১।৪

লক্ষ্মণের এই উক্তির সত্যতা অনস্বীকার্য। ইহা লক্ষ্মণের কথামাত্র নহে। ইহা তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই একটি মাত্র লক্ষ্য লইয়াই লক্ষ্মণ তাঁহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন।

রামকে ফিরাইয়া লইতে চিত্রকূটে আগত ভরতকে দেখিবামাত্র লক্ষ্মণ তাঁহাকে বধ করিতে চাহিলেন। রাম জানাইলেন, ভরতকে কোন অপ্রিয় কথা বলিলে রামকেই বলা হইবে। আর রাজ্যের জন্যই যদি লক্ষ্মণ এরূপ বলিয়া থাকেন তবে রাম ভরতকে বলিয়া লক্ষ্মণকে রাজ্য প্রদান করিবেন। রামের কথায় লক্ষ্মণ অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন।

১। ২।২৩।২১

ভরতের প্রতি লক্ষ্মণের এই বিষোদ্গারে আমরা স্তম্ভিত হই। বহুবার লক্ষ্মণ ভরতকে বধ করিবেন বলিয়া আস্ফালন করিয়াছেন। হয়তো কৈকেয়ীর পুত্র বলিয়াই লক্ষ্মণের ভরতের প্রতি এরূপ বিদ্বেষ জাত হইয়াছে। ভরতের জন্যই রামকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইতে হইতেছে বলিয়া ভরত লক্ষ্মণের নিকট ক্ষমার অযোগ্য।

দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিবার পর বিরাধ নামক ঘোরদর্শন রাক্ষস সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে রাম বিলাপ করিতে আরম্ভ করেন। বিলাপরত রামকে দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—আমার ন্যায় ভৃত্য থাকিতে ও সকল ভূতের ঈশ্বর হইয়াও আপনি কেন অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতেছেন ?

রাম মাঝে মাঝে নিজের বীর্যবত্তার কথা বিস্মৃত হইলেও লক্ষ্মণ কিন্তু কখনও নিজের বলবীর্যের কথা ভোলেন নাই বা বিপদে অধীর হইয়া বিলাপ করেন নাই। পৌরুষত্বের প্রতি আস্থাবান্ লক্ষ্মণ সর্বদাই পৌরুষ প্রকাশ করিয়াছেন।

হেমন্তকালে একদিন রাম লক্ষ্মণের সহিত কথোপকথনে ব্যস্ত এমন সময় আবির্ভাব হইল রাবণভগিনী শূর্পণখার। রামকে স্বামিরূপে কামনা করিলে তিনি হাসিয়া লক্ষ্মণকে পতিরূপে ভজনা করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ শূর্পণখার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিয়া বিরূপা করিয়া দিলেন। ক্রুদ্ধা শূর্পণখাকর্তৃক প্ররোচিত রাবণ সীতাকে হরণ করিবার জন্য মারীচকে মৃগরূপ ধারণ করিতে বলিলেন। এদিকে রজতবিন্দুশোভিত মৃগরূপী মারীচকে ধরিবার জন্য রাম আগ্রহ প্রকাশ করিলে লক্ষ্মণ জানাইলেন যে, মারীচই স্বেচ্ছারূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু রাম লক্ষ্মণের যুক্তিযুক্ত অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া সীতারক্ষার জন্য লক্ষ্মণকে নিযুক্ত করিয়া মায়ামৃগ বধ করিতে গেলেন।

এদিকে রাম সাহায্যের জন্য চীৎকার করিলে সীতা লক্ষ্মণকে রামের রক্ষার জন্য যাইতে অনুরোধ করিলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে বুঝাইতে বহু চেষ্টা করিলেন যে রামের কোন বিপদ্ হইতে পারে না। তখন সীতা তাঁহাকে ভরতকর্তৃক নিয়োজিত গুপ্তশত্রু বলিয়া অভিহিত করিলেন। অত্যন্ত বিরক্ত লক্ষ্মণ আর ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না। সীতাকে একাকী আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। যাওয়ার সময় বলিয়া

গেলেন যে গুরু রামের আদেশ পালনে রত লক্ষ্মণের প্রতি সন্দেহ পোষণ করায় অচিরেই সীতা বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন।

লক্ষ্মণের বাক্য সফল হইল। কারণ রাক্ষসরাজ রাবণ ইতিমধ্যে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। রজতবিন্দুশোভিত বিচিত্র মৃগ দেখিয়া লক্ষ্মণের সন্দেহ হইয়াছিল যে, ইহা মারীচ রাক্ষসের মায়ামাত্র। তাঁহার সন্দেহ সত্যে পরিণত হইয়াছিল। ইহা লক্ষ্মণের বাস্তববুদ্ধির পরিচয়ই জ্ঞাপন করে। আর লক্ষ্মণ কখনও তুচ্ছ বস্তুর প্রলোভনে ভোলেন না। তবুও আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগে? সীতাকে একাকী আশ্রমে রাখিয়া রামের নিকট যাওয়া লক্ষ্মণের পক্ষে সঙ্গত হইয়াছিল কি? কারণ রাম বারংবার লক্ষ্মণকে সাবধানতা অবলম্বনপূর্বক আশ্রমে থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তবে তাঁহার পক্ষে সীতার ব্যবহারে দুঃখিত ও ব্যথিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

রাম ও লক্ষ্মণ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিয়া সীতাকে না পাইয়া বন, পর্বত সর্বত্র সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। রাম উন্মত্তের ন্যায় বৃক্ষ, পর্বত, নদী ও আরণ্য প্রাণীদের সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কাহারও নিকট হইতে কোনও প্রত্যুত্তর না পাইয়া ক্রোধান্ধ রাম ত্রিলোক-ধ্বংসী বাণ নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন দুঃখিতচিত্ত লক্ষ্মণ অতি ধৈর্য সহকারে অগ্রজকে বুঝাইতে প্রয়াস করিলেন যে রামের মত জিতেন্দ্রিয়, সর্বপ্রাণীর হিতে রত ব্যক্তির পক্ষে এরূপ আচরণ সঙ্গত নহে। তাহা ছাড়া সামান্য দেহিগণের দূরের কথা, দেবগণেরও দৈবের হাত হইতে নিস্তার নাই।

এখানে লক্ষ্মণকর্তৃক দৈবের উল্লেখে মনে হয় দৈববিশ্বাসী রামকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই লক্ষ্মণ দৈবের উল্লেখ করিয়াছেন।

কবন্ধের নির্দেশ অনুযায়ী সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করিবার জন্য রামলক্ষ্মণ ঋষ্যমূক পর্বতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বিরহকাতর রামকে লক্ষ্মণ ধর্ম ও বলের দ্বারা রক্ষা করিতে লাগিলেন। সুগ্রীবকর্তৃক প্রেরিত হনুমান্ রামের বৃত্তান্ত জানিতে আসিলে লক্ষ্মণ রামের অনুমতি লইয়া রামের সকল বৃত্তান্ত হনুমান্‌কে জানাইলেন ও সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন দশরথপুত্র সকলের আশ্রয়স্বরূপ

হইয়াও এখন সুগ্রীবের সাহায্যপ্রার্থী। শোকাভিভূত রাম শরণাগত হইলে সুগ্রীব যেন তাঁহাকে অনুগ্রহ করেন।

যে-লক্ষ্মণকে পূর্বে আমরা সর্বদাই গর্বিত ও পৌরুষত্বের প্রতি আস্থাবান্ দেখিয়াছি সেই লক্ষ্মণই জ্যেষ্ঠভ্রাতার জন্য নম্র ও বিনীতভাবে সুগ্রীবের করুণাভিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

অগ্নি সাক্ষী করিয়া রাম ও সুগ্রীবের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। বর্ষা গত হইয়া শরৎ উপস্থিত। কিন্তু সুগ্রীবের পক্ষ হইতে কোন উদ্‌যোগ না দেখিয়া রাম লক্ষ্মণের নিকট বিলাপ করিতে লাগিলেন। রামকে দুঃখিত ও বিলাপরত দেখিয়া লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি গ্রাম্যসুখে আসক্ত সুগ্রীবকে সেদিনই বধ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। ক্রোধপরায়ণ লক্ষ্মণ সেই মুহূর্তেই সুগ্রীবকে বধ করিতে যাত্রা করিলে রাম নিজেকে সংযত করিয়া কনিষ্ঠভ্রাতাকে অনেক উপদেশপ্রদানপূর্বক ধীর ও শান্ত হইয়া সুগ্রীবের নিকট যাইতে বলিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণের পৌরুষ জাগিয়া উঠিয়াছে। ক্রোধে উন্মত্ত লক্ষ্মণ বল-পূর্বক পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষ ও শিলাসমূহ ভগ্ন করিয়া দ্রুতবেগে কিষ্কিন্ধার দিকে গমন করিতে লাগিলেন। মৃত্যু ও প্রলয়সদৃশ লক্ষ্মণকে দেখিয়া বানরগণ চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। বানরগণ আসিয়া সুগ্রীবকে সকল কিছু জানাইলেও তারার সহিত বিহারসুখে আসক্ত সুগ্রীব কিছুই শুনিতে পাইলেন না। লক্ষ্মণের নয়ন ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। মন্ত্রিগণের পরামর্শে সুগ্রীব লক্ষ্মণকে আসিতে অনুমতি দিলেন। লক্ষ্মণ সুগ্রীবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে গিয়া কাঞ্চী ও নূপুরের নিঃস্বন শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন ও প্রবেশ না করিয়া সেখানেই অবস্থান করিয়া কুপিত জ্যাশব্দে চতুর্দিক মুখরিত করিলেন। ভীত সুগ্রীব লক্ষ্মণের প্রসন্নতাবিধানের জন্য তারাকে প্রেরণ করিলেন। এদিকে তারাকে দেখিয়া লক্ষ্মণ কোপহীন হইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারা লক্ষ্মণকে অন্তঃপুরে লইয়া আসিলেন। কিন্তু প্রমদাগণকর্তৃক পরিবেষ্টিত সুগ্রীবকে দেখিয়া লক্ষ্মণের চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন সুগ্রীব নানা মধুরবাক্যে লক্ষ্মণকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। শান্ত হইয়া লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে লইয়া রামের নিকট আসিলেন।

ক্রোধপরায়ণ লক্ষ্মণের ক্রোধ প্রায় চতুর্দশ বৎসর চাপা থাকিবার পর এতদিনে প্রকাশিত হইল। অবশ্য তাঁহার এই ক্রোধ সুফলই

দান করিয়াছিল। লক্ষ্মণের ক্রুদ্ধ জ্যানিঃস্বন না শুনিলে ভোগে আসক্ত সুগ্রীবের এত শীঘ্র চৈতন্যোদয় হইত কিনা সন্দেহ। তবে সুগ্রীব ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের সম্মুখে নিজে না আসিয়া তারাকে প্রেরণ করিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। সুগ্রীবকে কাছে পাইলে তাঁহার কি দুর্দশা ঘটিত তাহা সহজেই অনুমেয়। লক্ষ্মণ ক্রোধপরায়ণ হইলেও নারীর নিকট নিজেকে সংযত রাখিতে ও নারীর সম্মান রাখিতে জানেন। তিনি তারাকে অতি সংযত ভাষায় সীতা উদ্ধারের জন্য রামের উদ্বেগের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নূপুর ও কাঞ্চীর শব্দ শুনিয়া লক্ষ্মণের লজ্জা তাঁহার জিতেন্দ্রিয়তারই প্রমাণই করে। সুগ্রীবের মধুরবাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ অতি সহজেই আশ্বস্ত হইয়াছেন। তাঁহার এত প্রচণ্ড ক্রোধ শান্ত হইতে বিন্দুমাত্র সময় লাগে নাই।

ইহার পর বানরসেনাসহ রামলক্ষ্মণ লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছেন রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে। লক্ষ্মণ ইতিপূর্বে নিজের বাহুবলের জন্য আস্ফালন করিয়াছেন। যুদ্ধকাণ্ডে দেখি তাঁহার বাহুবলের অহঙ্কার বৃথা নহে। প্রহস্তের মৃত্যুর পর যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণ আগমন করিয়াছেন। রাম রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলে লক্ষ্মণ জানাইয়াছেন, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার পক্ষে তিনিই যথেষ্ট। লক্ষ্মণ রাবণের সহিত প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা বধ করিলে রাম মূর্ছিত হইয়া পড়িলে লক্ষ্মণই রামকে সান্ত্বনা দিয়া যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বদা দেখা গিয়াছে, লক্ষ্মণের মনোবল কখনও নষ্ট হয় নাই।

আমরা কৌতুক অনুভব করি, ইন্দ্রজিৎ-নিধনকারী মাত্র দুই দিনের কনিষ্ঠভ্রাতা লক্ষ্মণকে রাম বলপূর্বক ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহ দৃষ্টিভরে বারংবার দেখিতেছেন ও মস্তক আঘ্রাণ করিতেছেন।

লঙ্কাজয়ের পর রাম বিভীষণকে আদেশ দিয়াছেন সীতাকে আনয়ন করিতে। কিন্তু সীতা আসিবামাত্র রাম তাঁহাকে যে দিকে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। কারণ রাবণগৃহবাসিনী সীতাকে রাম আর গ্রহণ করিবেন না।

লক্ষ্মণ সর্বত্র অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন ও অন্যায়কারীকে নিধন করিবেন বলিয়া সর্বদা আস্ফালন করিয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামের এই অন্যায়কার্যের কোন প্রতিবাদ করেন নাই। অগ্রজের প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই তিনি তাঁহার কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন মাত্র। সীতা অগ্নিপ্রবেশের জন্য লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলে রামের অভিপ্রায় বুঝিয়া নিরপরাধা সীতার জন্য চিতা প্রস্তুত করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। অন্যায়ের প্রতি যাঁহার এত বিরাগ, যিনি সর্বদা অন্যায়কারীর শাস্তিবিধানে প্রস্তুত, তিনি কিন্তু এখানে একান্তই অসহায়। অগ্রজের কোন কার্যের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা লক্ষ্মণের ছিল না।

অগ্নিদেব সীতাকে প্রত্যর্পণ করিলে রাম সীতাসহ অযোধ্যায় ফিরিয়াছেন। অযোধ্যায় ফিরিয়া রাম লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাহিলে লক্ষ্মণ কিন্তু তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। রাজ্যভোগের প্রতি তিনি একেবারেই নিস্পৃহ ইহা তাহারই প্রমাণ।

রাজ্যাভিষেকের পর কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পরই রামের জীবনে আবার দুর্দিন ঘনাইয়া আসিল। প্রজাবৃন্দ এবার রাবণ গৃহবাসিনী সীতাচরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিল। প্রজারঞ্জক রাম সীতাকে তপোবনে নির্বাসন দিতে মনস্থ করিলেন। এই অনভিপ্রেত কার্যটি রাম লক্ষ্মণকেই দিয়াই করাইয়াছেন।

লক্ষ্মণ সীতাত্যাগের ব্যাপারে জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশ সমর্থন করেন নাই। কিন্তু তাহা লঙ্ঘনও করেন নাই। তিনি আন্তরিক দুঃখিত হওয়া সত্ত্বেও সীতাকে তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন।

তিনি সীতাকে বলিয়াছেন—

> হৃদগতং মে মহচ্ছল্যং যস্মাদার্যেণ ধীমতা।
> অস্মিন্নিমিত্তে বৈদেহি লোকস্য বচনীকৃতঃ॥
> শ্রেয়ো হি মরণং মেঽদ্য মৃত্যুর্বা যৎপরং ভবেৎ।
> ন চাস্মিন্নীদৃশে কার্যে নিযোজ্যো লোকনিন্দিতে॥ ৭।৪৭।৪-৫

লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভ্রাতার ব্যবহারে দুঃখ পাইয়াছেন, নিজের মৃত্যু কামনা করিয়াছেন। কিন্তু অগ্রজের কোন নিন্দা কখনও করেন নাই।

সীতা লক্ষ্মণকে অনুরোধ জানাইয়াছেন—

নিরীক্ষ্য মাদ্য গচ্ছ ত্বমৃতুকালাতিবর্তিনীম্ । ৭।৪৮।১৯

কিন্তু যে-লক্ষ্মণ পূর্বে সীতার চরণযুগল ব্যতীত কিছু দেখেন নাই। তিনি কিরূপে অদ্য সীতাকে রামের অসাক্ষাতে দর্শন করিবেন? দুঃখিত লক্ষ্মণ ক্রন্দন করিতে করিতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। অযোধ্যায় ফিরিয়া লক্ষ্মণ রামকে অত্যন্ত শোকাকুল ও অশ্রুপূর্ণনয়ন দেখিতে পাইলেন। লক্ষ্মণ তখন রামকে সময়োচিত উপদেশ দান করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি রামকে বলিলেন—

তস্মাৎ পুত্রেষু দারেষু মিত্রেষু চ ধনেষু চ ।
নাতিপ্রসঙ্গঃ কর্তব্যো বিপ্রয়োগো হি তৈর্ধ্রুবম্ ॥ ৭।৫২।১২

পুত্র, দারা, মিত্র ও ধনে অতি আসক্ত হওয়া উচিত নহে, কারণ ইহাদের সহিত বিচ্ছেদ নিশ্চিতভাবে হইয়া থাকে।

এরূপে লক্ষ্মণ নানা তত্ত্বপূর্ণ কথা বলিলে রামের শোক দূরীভূত হইল। রাম চারিদিবস কোন পৌরজনের কার্য করেন নাই বলিয়া দুঃখিত হইলেন ও সকল কার্যার্থীকে আহ্বান করিতে আদেশ দিলেন।

আমরা পূর্বেও বহুবার দেখিয়াছি রামচন্দ্র যতবারই বিষাদগ্রস্ত ও ধৈর্যহীন হইয়া পড়িয়াছেন ততবারই এই অনুজ ভ্রাতাটি অগ্রজকে আশ্বস্ত করিয়া কর্তব্যকার্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। এই স্থানেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়াছেন, সীতার পাতাল প্রবেশ সংঘটিত হইয়াছে। ইহার কিছুকাল পরে ব্রহ্মাকর্তৃক প্রেরিত দূত কাল আগমন করিলেন। রামের সহিত কাল গোপনে বাক্যালাপ করিতে চাহিলেন ও রামচন্দ্রকে বলিলেন যে যদি কেহ তাঁহাদের সংবাদ শ্রবণ করে বা তাঁহাদিগকে নির্জনে দর্শন করে তবে সে রামের বধ্য হইবে। রাম স্বীকৃত হইয়া লক্ষ্মণকে দ্বারে নিযুক্ত করিলেন। এমন সময় দুর্বাসার আগমন হইল। তিনি তাঁহার আগমনবার্তা তৎক্ষণাৎ রামকে নিবেদন করিবার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন। অন্যথায় চারি ভ্রাতাসহ অযোধ্যাপুরী ধ্বংস করিয়া দিবেন। সকল কিছুর বিনাশ অপেক্ষা নিজের বিনাশ ভাল মনে করিয়া লক্ষ্মণ রামকে দুর্বাসার আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিলেন। সুতরাং লক্ষ্মণ রামের বধ্য হইলেন। লক্ষ্মণ নিজেকে বধ

করিবার জন্য রামকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মন্ত্রিগণের পরামর্শে রাম লক্ষ্মণকে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। অশ্রুপূর্ণনেত্রে লক্ষ্মণ নিজগৃহে প্রবেশ না করিয়াই সরযূতীরে গেলেন ও যোগযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

যে-লক্ষ্মণ সুখে-দুঃখে-সম্পদে-বিপদে অনুক্ষণ অগ্রজকে অনুসরণ করিয়াছেন। বিধির বিধানে তিনি সেই প্রাণপ্রতিম ভ্রাতাকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন ইহা হইতে দুঃখজনক আর কি হইতে পারে? সেজন্য লক্ষ্মণ প্রিয়তম ভ্রাতাকর্তৃক পরিত্যক্ত হইবামাত্র গৃহে প্রবেশ না করিয়াই সরযূতীরে গমন করিয়াছেন প্রাণত্যাগ করিবার জন্য। অবশ্য সংসারের প্রতি আসক্তিহীন লক্ষ্মণ কখনই বা গৃহের প্রতি আকর্ষণ বোধ করিয়াছেন? এই দুই ভ্রাতার মধ্যে বিচ্ছেদ সত্যই মর্মান্তিক ব্যাপার। তাই দেখি অনুজের মৃত্যুর পর রামও বেশী দিন প্রাণধারণ করেন নাই। এই দুই ভ্রাতার ভ্রাতৃপ্রেম ভারতবাসীর হৃদয়ে শাশ্বত স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

বিভীষণ

লঙ্কাধিপতি রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ তাঁহার ধর্মশীলতা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, বিবেচনাবোধ, বিচারশক্তি, ভবিষ্যদৃষ্টি, বাস্তববুদ্ধি প্রভৃতি গুণের দ্বারা রাক্ষসকুলে এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্তরূপে নিজেকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। বিশ্রবামুনি ও সুমালী-কন্যা কৈকসীর চারিসন্তানের মধ্যে তিনি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। স্বভাবসাদৃশ্যে তিনি অনেকটা রাক্ষসগণের প্রধান শত্রু রামলক্ষ্মণের নিকটবর্তী।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিসাবে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের গুণাবলীকে শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তাঁহার অধার্মিকোচিত প্রবৃত্তি ও ভ্রান্ত মতাদর্শ বিভীষণকে সর্বদা বিচলিত করিয়াছে। রাবণ যাহাতে জানকীকে রামের হস্তে প্রত্যর্পণ করেন তিনি তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু রাবণ তাঁহার যুক্তিসম্মত ও ন্যায়সম্মত কথায় কোন কর্ণপাতই করেন নাই। বিভীষণের প্রস্তাবকে রাবণ শত্রুতুল্য আচরণ মনে করিয়াছেন। এবং অন্য কেহ এরূপ প্রস্তাব করিলে তাহার প্রাণদণ্ড অবধারিত একথাও সদর্পে ঘোষণা করিয়াছেন।

ধার্মিক বিভীষণ অন্যায়কারী ভ্রাতাকে কিছুতেই সুপথে আনা যাইবে না দেখিয়া ভ্রাতাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তাঁহার পক্ষে ভ্রাতার কার্যকলাপ সমর্থন করা একেবারেই সম্ভব ছিল না। তাঁহার উপদেশের সারবত্তার কথা রাবণের পত্নী মন্দোদরীও পতির মৃত্যুর পর উল্লেখ করিয়াছেন। অধর্মের প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মার্জিত। তপস্যায় সন্তুষ্ট ব্রহ্মার নিকটও তিনি চিরকাল ধর্মপথে থাকিবার বর কামনা করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁহার চারিজন অনুচরসহ রামের পক্ষে যোগদানই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। ধর্মের নিকট অধর্মের পরাজয়ই তাঁহার নিকট বাঞ্ছনীয় মনে হইয়াছিল।

রামের পক্ষে যোগদান করিতে গিয়া তিনি অনুমান করিয়াছিলে যে, রামের সেনাদল তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষেই দেখিবে। তাই তিনি অতি সুকৌশলে অন্তরিক্ষ হইতে তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে চাহিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত হনুমান্ ও রামের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া রামের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের বুদ্ধি, শক্তিসামর্থ্য সকল কিছুই রামের জয়ের স্বার্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বিভীষণ না থাকিলে রামের পক্ষে রাক্ষসদলের গোপন খবর জানা সম্ভব ছিল না। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুরহস্য না জানিতে পারিলে রামের পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ খুবই কষ্টসাধ্য হইত।

রাবণের কার্যকলাপের প্রতি বিভীষণের সমর্থন না থাকিলেও অগ্রজকে তিনি ভালবাসিতেন। রাবণের মৃত্যুর পর তিনি বহু বিলাপ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করিয়াছিলেন।

রাম তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, রাজ্যও দিয়াছেন। তিনি রামের এই উপকারের প্রতিদান দিয়াছিলেন রামের সকল প্রকার আদেশ নির্দ্বিধায় পালন করিয়া। তিনি রামের এতদূর স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন যে সুদূর লঙ্কা হইতে কয়েকবারই তিনি অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন।

বিভীষণের জন্মের পূর্বেই বিশ্রবামুনি পত্নী কৈকেসীকে বলিয়াছেন—

> পশ্চিমো যস্তব সুতো ভবিষ্যতি শুভাননে।
> মম বংশানুরূপঃ স ধর্মাত্মা চ ন সংশয়ঃ॥ ৭।৯।২৭

যথার্থই রাক্ষসীকন্যা কৈকেসীর কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্রবামুনির বংশানুরূপই হইয়াছিলেন—

বিভীষণের বাল্যকাল সম্বন্ধে মহাকবি বলিয়াছিলেন—

বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা নিত্যং ধর্মব্যবস্থিত: ।
স্বাধ্যায়নিয়তাহার উবাস বিজিতেন্দ্রিয়: ॥ ৭।৯।৩৯

বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিবার পর পিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলে বিভীষণ বর প্রার্থনা করেন—

প্রীতেন যদি দাতব্যো বরো মে শৃণু সুব্রত ।
পরমাপদ্‌গতস্যাপি ধর্মে মম মতির্ভবেৎ ॥
অশিক্ষিতঞ্চ ব্রহ্মাস্ত্রং ভগবন্‌ প্রতিভাতু মে ।
যা যা মে জায়তে বুদ্ধির্যেষু যেষ্বাশ্রমেষু চ ॥
সা সা ভবতু ধর্মিষ্ঠা তং তং ধর্মঞ্চ পালয়ে ।
এষ মে পরমোদারো বর: পরমকো মত: ॥ ৭।১০।৩০-৩২

ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্তির ফলে বিভীষণ কখনও অধর্মকে সমর্থন করেন নাই, যথাশক্তি অধর্মের বিরোধিতাই করিয়াছেন চিরকাল ।

সুন্দরকাণ্ডে রাবণ যখন হনুমান্‌কে বধাদেশ দিয়াছেন তখনই আমরা বিভীষণের প্রথম সাক্ষাৎ পাই । বিভীষণ রাবণকে বুঝাইতে সচেষ্ট ছিলেন যে দূত অবধ্য । সুতরাং হনুমান্‌কে বধ করা রাবণের পক্ষে অনুচিত । তবে দূতের অন্যান্য বহুপ্রকার শাস্তির পক্ষে একটা প্রদান করা যাইতে পারে । হনুমান্‌কে বধ করিলে নররাজপুত্র রাম-লক্ষ্মণকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিবার কেহ থাকিবে না । কারণ এই মহাসাগর অতিক্রম করিয়া আর কেহ নিশ্চয়ই লঙ্কায় আসিবে না এবং রামের পক্ষে লঙ্কার খবর জানা সম্ভব হইবে না । বিভীষণের যুক্তিযুক্তবাক্যে রাবণ সন্তুষ্ট হইয়া হনুমানের পুচ্ছে অগ্নিসংযোগ করিয়া তাঁহার শাস্তিবিধানের আদেশ দিলেন ।

প্রথম দর্শনেই বিভীষণকে আমরা সুবিবেচক ও বাস্তববোধসম্পন্ন পুরুষ হিসাবে দেখিতে পাই । তাঁহার ধর্মবুদ্ধি প্রখর ছিল বলিয়াই দূতের বধের আদেশ কিছুতেই সমর্থন করিতে পারেন নাই । রাম-লক্ষ্মণের সহিত যোগাযোগের একমাত্র সেতু যে হনুমান্‌ই হইতে পারেন সেই বোধ তাঁহার ছিল বলিয়াই শেষপর্যন্ত রাম-রাবণের যুদ্ধ হইতে পারিয়াছে ও রামের পক্ষে সীতা উদ্ধারও সম্ভব হইয়াছে ।

রাবণের উপর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণের যথেষ্ট প্রভাব ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। দুরাচারী রাবণও কনিষ্ঠ ভ্রাতার যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব সমর্থন না করিয়া পারেন নাই।

হনুমানের নিকট রাবণ ও লঙ্কাপুরী সম্বন্ধে সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়া রাম লঙ্কা আক্রমণের নিমিত্ত সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রধান প্রধান রাক্ষসবৃন্দ রাবণের পক্ষে মানুষ রামকে পরাজিত করা অনায়াসসাধ্য হইবে বলিয়া রাবণকে উৎসাহ প্রদান করিলেন। একমাত্র বিভীষণই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি সকল রাক্ষসবীরগণকে নিবারিত করিয়া বিনা যুদ্ধে মৈথিলীকে প্রত্যর্পণ করিতে রাবণকে অনুরোধ জানাইলেন কারণ শ্রীরাম জয়েচ্ছু, দৈবসহায়, জিতরোষ ও দুরাধর্ষ। রামের সহিত যুদ্ধের ফলে লঙ্কাপুরী ও রাক্ষসগণের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বিভীষণ বোধ করি রাত্রে নিদ্রাও যাইতে পারেন নাই। কারণ পরদিন প্রত্যুষে জাগরিত হইয়াই পুনরায় তিনি রাবণগৃহে উপস্থিত হইয়াছেন ও অগ্রজকে যুক্তিপূর্ণ ও হিতকর বাক্যে সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সীতাকে হরণ করিয়া আনিবার পর হইতেই লঙ্কায় অনেক দুর্নিমিত্ত লক্ষিত হইতেছে। সীতাকে প্রত্যর্পণ করাই ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। আর মন্ত্রিগণও ভয়বশতঃ রাবণকে কিছু বলিতে সাহস করিতেছেন না। সেজন্যই—

অবশ্যঞ্চ ময়া বাচ্যং যদ্দৃষ্টমথবা শ্রুতম্।
সম্প্রধার্য যথান্যায়ং তদ্ভবান্ কর্তুমর্হতি॥ ৬।১০।২৫

বিভীষণের বাক্যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাবণ তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বিদায় দিলেন। রামের সেনাবাহিনী দেখিয়া রাবণ রাক্ষসপ্রধানদের সহিত নানারূপ মন্ত্রণা করিতেছেন। কুম্ভকর্ণও উপস্থিত। কুম্ভকর্ণ প্রথমে রাবণের কার্যাবলীর নিন্দা করিলেও পরে রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে সম্মত হইলেন। বিভীষণ কিন্তু নিজবাক্যে অবিচল। তিনি পুনরায় দৃঢ়প্রত্যয়ের সহিত নিবেদন করিলেন যে, রাম অজেয়, তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ বিভীষণের বাক্যে কোপান্বিত হইয়া বলিলেন, রাবণ পূর্বে যুদ্ধে দেবগণকেই ভীত করিয়া তুলিয়াছিলেন, আর রামলক্ষ্মণ ত সামান্য মানুষমাত্র। বিভীষণ ভীত ও কাপুরুষ বলিয়াই রামের সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক। তদুত্তরে

বিভীষণও জানাইলেন যে ইন্দ্রজিৎ বালকবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়াই এরূপ কথা বলিতেছেন। রঘুনাথের যমদণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর বাণ কেহ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। এবার রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অনুজের প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন—

> বসেৎ সহ সপত্নেন ক্রুদ্ধেনাশীবিষেণ চ।
> ন তু মিত্রপ্রবাদেন সংবশেচ্ছত্রুসেবিনা ।। ৬।১৬।২
> যথা মধুকরস্তর্ষাদ রসং বিন্দন্ন তিষ্ঠতি।
> তথা ত্বমপি তত্রৈব তথানার্যেষু সৌহৃদম্ ।। ৬।১৬।১৩

বিভীষণ ব্যতীত অন্য কেহ এরূপ পরামর্শ দিলে তাহার প্রাণ থাকিত না একথা জানাইতেও রাবণ ভুলিলেন না। অত্যন্ত নিরুপায় বিভীষণ ধর্মভ্রষ্ট ভ্রাতাকে ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়া অনুগত চারিজন অনুচরসহ অন্তরিক্ষগত হইয়া বলিলেন—

> স ত্বং ভ্রান্তোঽসি মে রাজন্ ব্রূহি মাং যদ্ যদিচ্ছসি।
> জ্যেষ্ঠো মান্যঃ পিতৃসমো ন চ ধর্মপথে স্থিতঃ।
> ইদং হি পরুষং বাক্যং ন ক্ষমাম্যগ্রজস্য তে ।। ৬।১৬।১৯

বিভীষণ অতি অভিজ্ঞ ও ভবিষ্যদ্রষ্টা। তিনি হনুমানের প্রতাপ দেখিয়া রামের শক্তি সম্বন্ধে ধারণা করিয়াছিলেন এবং একথাও বুঝিয়াছিলেন যে, রাম আপন লক্ষ্যে স্থির থাকিয়া রাবণকে পরাজিত করিবেনই। রাক্ষসগণের হিতকামী বিভীষণ লঙ্কার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুবই চিন্তান্বিত ছিলেন। জানকীহরণের পর নানা দুর্নিমিত্ত দেখিয়া তাঁহার মনে যথেষ্ট দুর্ভাবনার সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি রাবণকে যুদ্ধ হইতে নিবারিত করিবার বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রতুল্য ইন্দ্রজিতের নিকট কাপুরুষ প্রভৃতি তিরস্কারে বিভীষণ অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন। তারপর রাবণও তাঁহাকে তিরস্কার করিলে তিনি দেখিলেন যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কল্যাণকামী হইয়াও তিনি ঐরূপ তিরস্কৃত হইতেছেন। তিনি রাবণের পক্ষে থাকা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তিনি অবশ্য যথাকালে তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

পর্বতসদৃশ আকারবিশিষ্ট মেঘবর্ণ বিভীষণ রামের সেনামধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুগ্রীব ও বানরগণকে দেখিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে জ্ঞাপন করিলেন যে তিনি দুরাচারী রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি অগ্রজকে সীতা প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়া শ্রীরঘুনাথের চরণে আশ্রয় লইতে আসিয়াছেন। সুগ্রীব প্রভৃতির আপত্তি সত্ত্বেও রাম শরণাগতকে আশ্রয় দিলেন ও তাঁহার নিকট হইতে রাবণের বলবীর্য সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিলেন। বিভীষণ রাক্ষসগণের বধ ও লঙ্কার প্রধর্ষণ বিষয়ে যথাশক্তি সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণ বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সুগ্রীব ও হনুমান্ সমুদ্র পারাপারের উপায় সম্বন্ধে বিভীষণের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। বিভীষণ বলিলেন যে, এ বিষয়ে রামের সমুদ্রের শরণ লওয়াই কর্তব্য। রামও বিভীষণের পরামর্শ গ্রহণীয় বলিয়া মনে করিলেন।

এদিকে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রহস্ত যুদ্ধে হত। তখন রাবণ স্বয়ং যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন। রাবণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন ও পুত্র ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে রামলক্ষ্মণ হতচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। বানরকুলে বিষাদ দেখা দিল। বিভীষণ সুগ্রীব প্রভৃতিকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে, রামলক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মানরক্ষার্থে ভূপতিত হইয়াছেন মাত্র। এখন বিষাদ না করিয়া প্রতিবিধানই কর্তব্য। হনুমান্ ও বিভীষণ উল্কাহস্তে রণক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া জাম্ববানের নিকট গেলে জাম্ববান্ ওষধিপতি হইতে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানকরণী চারিটি ওষধি আনিতে আদেশ দিলেন। হনুমান্ সেইসকল ওষধি লইয়া আসিলে ওষধি-প্রভাবে বানরগণসহ রামলক্ষ্মণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

দেখা যাইতেছে, বিপদাপন্ন হইয়াও বিভীষণ কখনও অধীরতা প্রকাশ করেন নাই। সবাই যেখানে বিচলিত ও বিষাদগ্রস্ত সেখানে বিভীষণই একমাত্র অবিচলিত থাকিয়া যথোচিত কর্তব্যপালনে রত। সুগ্রীব হনুমান্ প্রভৃতি প্রধান বানরগণ যখন কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত ও বিষণ্ণ তখন একমাত্র বিভীষণই উদ্‌যোগী হইয়া সকল বানরগণকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। রামলক্ষ্মণের সুস্থতার জন্য ব্যবস্থাপনাও তিনিই করিয়াছেন।

ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা বধ করিলে বিভীষণ শোকাকুল রামকে জ্ঞাপন করিলেন যে, ইন্দ্রজিৎ আসল সীতাকে কখনও বধ করিতে পারেন না। ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা বধপূর্বক বানরসেনামধ্যে সন্তাপ সৃষ্টিকরতঃ নিকুম্ভিলা মন্দিরে যজ্ঞ করিতে গিয়াছেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলেই ইন্দ্রজিৎ অজেয় হইবেন। সুতরাং লক্ষ্মণের উচিত হোমসমাপ্তির পূর্বেই ইন্দ্রজিৎকে বধ করা। বিভীষণ লক্ষ্মণের অনুগমন করিলেন। কিছুদূর গমনপূর্বক এক বিশাল বনে বিভীষণ ইন্দ্রজিতের কর্মানুষ্ঠানের স্থান দেখাইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, এই বৃক্ষতলে ইন্দ্রজিৎ ভূতগণকে উপহার দিয়া যুদ্ধে গমন করেন। ইহার ফলে তিনি সকল জীবের অদৃশ্য হইয়া শত্রু বধ ও বন্ধন করেন। বটস্থানে প্রবেশের পূর্বেই ইন্দ্রজিৎকে বধ করা লক্ষ্মণের কর্তব্য।

এমন সময় ইন্দ্রজিৎ খড়্গ ও ধ্বজাসহ অগ্নিবর্ণ রথে আরোহণ করিয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। বিভীষণকে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ নানা তিরস্কার করিতে লাগিলেন—পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা ও তাঁহার পিতৃব্য হইয়াও কেন তিনি পুত্রের প্রতি দ্রোহাচরণ করিতেছেন। ধর্মজ্ঞানহীন বলিয়াই তিনি শত্রুর ভৃত্যত্ব বরণ করিয়াছেন। সেজন্য তিনি শোকার্হ ও নিন্দনীয়।

তদুত্তরে বিভীষণ জানাইয়াছেন যে—

> কুলে যদ্যপ্যহং জাতো রক্ষসাং ক্রূরকর্মণাম্।
> গুণো যঃ প্রথমো নৃণাং তন্মে শীলমরাক্ষসম্ ॥
> ন রমে দারুণেনাহং ন চাধর্মেণ বৈ রমে।
> ভ্রাত্রা বিষমশীলোঽপি কথং ভ্রাতা নিরস্যতে॥ ৬।৮৭।১৯-২০
> পরস্বহরণে যুক্তং পরদারাভিমর্শনম্।
> ত্যাজ্যমাহুর্দুরাত্মানং বেশ্ম প্রজ্বলিতং যথা॥ ৬।৮৭।২২

বিভীষণের পরামর্শমত লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করিলেন। কালজ্ঞ বিভীষণ রাবণের শেষ অবলম্বন ইন্দ্রজিৎকে দ্রুত বধ করিবার জন্য বানরগণকে আদেশ দিলেন। পিতৃব্য হইয়া পুত্রতুল্য ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করা অনুচিত হইলেও তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বধ করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু বাষ্পবারি তাঁহার নয়ন আচ্ছন্ন করায় তিনি তাহা পারিতেছেন না। সুতরাং লক্ষ্মণই তাঁহাকে বধ করুন এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও বিভীষণ ইন্দ্রজিতের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

লক্ষণীয় ইন্দ্রজিৎকর্তৃক মায়াসীতা বধে রামলক্ষ্মণসহ সকলেই প্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র বিভীষণই ইন্দ্রজিতের শঠতা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ও রাম প্রভৃতিকে আশ্বস্ত করিয়া যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিভীষণ যথার্থই কালজ্ঞ ছিলেন। যদি তিনি যথাসময়ে ইন্দ্রজিতের মৃত্যুরহস্য রামকে না জানাইতেন তবে হয়তো ইন্দ্রজিৎ বধ সম্ভব হইত না। আর ইন্দ্রজিৎকে বধ করিতে না পারিলে যুদ্ধে কোন-পক্ষের জয় হইত তাহা বলা শক্ত। বিভীষণ ভ্রাতুষ্পুত্রকর্তৃক অপমানে কথা বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু তাঁহাকে হত্যা করিতে গিয়া তাঁহার নয়ন বাষ্পাছন্ন হইয়াছে। এখানে বিভীষণ প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগিয়াছেন।

বিভীষণ সহোদর ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষে যোগ দেওয়ায় বহু সমালোচিত হইয়াছেন। কিন্তু ইন্দ্রজিতের সহিত তাঁহার উত্তর প্রত্যুত্তর হইতে বোঝা যায় তাঁহার রামপক্ষে যোগ না দিয়া উপায় ছিল না। কারণ তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন তিনি রাক্ষসবংশে জন্মিলেও তাঁহার স্বভাব রাক্ষসোচিত নহে। তাহা ছাড়া তিনি অধর্ম সহ্য করিতেও অপারগ। প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায় পরস্বাপহারী ও পরদারাভিলাষী ভ্রাতাকে ত্যাগ না করিয়া তিনি পারেন নাই।

যুদ্ধ শেষ হইবার পর আমরা শোকগ্রস্ত বিভীষণকে দেখিতে পাই যিনি ভ্রাতার গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া বিলাপ করিতেছেন। অগ্নিহোত্রী, মহা-তপস্বী ও বেদান্তশাস্ত্রে অভিজ্ঞ রাবণের প্রেতকার্যের জন্য বিভীষণ রামের অনুমতি চাহিয়াছেন।[১] 'মরণ পর্যন্তই শত্রুতা'—ইহা বলিয়া রাম

১। অনেন দত্তানি বর্ণীপকেষু
ভুক্তাশ্চ ভোগা নিভৃতাশ্চ ভৃত্যাঃ
ধনানি মিত্রেষু সমর্পিতানি
বৈরাণ্যমিত্রেষু চ যাপিতানি ॥
এষোহহিতাগ্নিশ্চ মহাতপাশ্চ
বেদান্তগঃ কর্মসু চাগ্র্যশূরঃ। ৬।১০৯।২২-২৩

তাঁহাকে অনুমতিও দিয়াছেন। পরক্ষণেই দেখি বিভীষণ ভ্রাতার কুকার্যের নিন্দা করিয়া তাঁহার সৎকার করিতে চাহিলেন না। কিন্তু রাম বলিলেন যে, রাবণ অধার্মিক, দুষ্কর্মরত, স্বেচ্ছাচারী হইলেও রণভূমিতে তেজ, বল, শৌর্য প্রকাশ করায় তিনি মহাত্মা। সুতরাং রাবণের যথোচিত সৎকার করাই কর্তব্য। রামের বাক্যে সন্তুষ্ট বিভীষণ মাল্যবানের সহিত যথোচিত মর্যাদা সহকারে রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

রাবণের মৃত্যুর পরও দেখি বিভীষণ মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগিয়াছেন। অগ্রজের মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য একবার অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও ভ্রাতার নিন্দা করিয়া রামের মনোভাব ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন। ইহা মানবের মনোরাজ্য সম্বন্ধে তাঁহার সুগভীর অভিজ্ঞতারই পরিচয়ই বহন করে।

যুদ্ধশেষে বিভীষণের উপর ভার পড়িল সীতাকে রামচন্দ্রের নিকট আনয়নের। বিভীষণ সীতাকে দেখিতে সমাগত জনসমাজকে অপসারিত করিতে আদেশ দিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাম জনসংঘের মধ্য দিয়াই সীতাকে আসিতে বলিলেন। রামের ব্যবহারে বিভীষণ খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

অগ্নিপরীক্ষা হইয়া যাইবার পর রামসীতার সহিত বিভীষণও অযোধ্যায় গমন করিয়াছিলেন। রামের অভিষেককালে বিভীষণ চামরদ্বারা রামকে ব্যজন করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত বিভীষণের সহিত রামের আন্তরিকতা বিদ্যমান ছিল। তাই দেখি রামচন্দ্রের দেহত্যাগ কালে বিভীষণ অযোধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রামচন্দ্রও আশীর্বাদ করিয়াছেন—

যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী।
যাবচ্চ মৎকথা লোকে তাবৎ রাজ্যং তবাস্ত্বিহ ॥ ৭।১০৮।২৮

রামচন্দ্রের আশীর্বাদ সার্থক হইয়াছে। রামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুচর বিভীষণও তাঁহার ভক্তি, প্রীতি, ধর্মশীলতার দ্বারা পৃথিবীতে চিরজীবী হইয়া রহিয়াছেন।

কৌশল্যা

নৃপতি দশরথের প্রধানা মহিষী কৌশল্যা। তিনি সর্বোপরি রাজা দশরথের নয়নমণি, প্রকৃতিপুঞ্জের আনন্দবিধায়ক, রামায়ণ মহাকাব্যের নায়ক রামচন্দ্রের জননী। রামের মত পুত্র পাইবার জন্য নিশ্চয়ই কৌশল্যাকে অনেক তপস্যা করিতে হইয়াছে। অথবা ধর্মজ্ঞা, ধৈর্যশীলা কৌশল্যার পুত্র বলিয়াই হয়তো রাম এত গুণের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন। দাক্ষিণ্যশালিনী, ধর্মপরায়ণা এই নারী জীবনে সুখ পাইয়াছেন অল্পই। স্বামীর প্রতি ও সপত্নী কৈকেয়ীর প্রতি তাঁহার অভিমান অভিযোগ দুই-ই ছিল। কৈকেয়ীর জন্যই রাজা দশরথের নিকট তিনি প্রাপ্য সমাদর লাভ করিতে পারেন নাই। বর্ষীয়ান্ রাজা কনিষ্ঠা মহিষীকেই বেশী স্নেহ করিতেন। অবশ্য কৈকেয়ী-পুত্র ভরত অপেক্ষা কৌশল্যা-পুত্র রামই তাঁহার অধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই দিক্ দিয়া অন্ততঃ কৌশল্যা কৈকেয়ী অপেক্ষা ভাগ্যবতী। রাজা দশরথ তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়াছিলেন জ্যেষ্ঠা মহিষীরই সহিত। পুত্রেষ্টিযজ্ঞের চরুর অর্ধভাগ কৌশল্যাই পাইয়াছেন। সুতরাং মহিষী হিসাবে গৌরবের স্থান কৌশল্যাই লাভ করিয়াছিলেন।

যতদূর মনে হয় কৈকেয়ীর বিবাহের পূর্বে দশরথের নিকট কৌশল্যা যথেষ্ট আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কৈকেয়ীর বিবাহের পর হইতেই তিনি দশরথের মনোযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ইহাতেই তিনি এত ক্ষুব্ধবোধ করিতেন। তাঁহার সুখদুঃখের সঙ্গিনী ছিলেন লক্ষ্মণ-জননী সুমিত্রা। সুমিত্রাকে সকল কিছু বলিয়া তিনি কিছুটা দুঃখের ভার লাঘব করিতেন।

অশ্বমেধ ও পুত্রেষ্টিযজ্ঞ উপলক্ষ্যে আদিকাণ্ডে আমরা প্রধানা মহিষী কৌশল্যার উল্লেখ পাইয়াছি। কিন্তু অরণ্যকাণ্ডেই কৌশল্যাচরিত্র যথোচিত প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আগামীকল্য পুষ্যানক্ষত্রে রামের অভিষেক হইবে—এই সংবাদ শ্রবণমাত্র কৌশল্যা পুত্রবধূ সীতা, সুমিত্রা ও লক্ষ্মণসহ জনার্দনের ধ্যানে নিরত হইয়াছেন। প্রিয়ংবদ দূতগণকে তিনি হিরণ্য, বিবিধ ধনবস্ত্র ও প্রচুর গরু দান করিয়াছেন। রাম জননীর নিকট আসিয়া জানাইলেন, তিনি পিতাকর্তৃক আগামীকল্য প্রভাতে রাজপদে অভিষিক্ত হইবেন। অতি আনন্দিত কৌশল্যা পুত্রের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া বলিলেন, রাম নিজের গুণাবলী দ্বারা পিতৃদেবকে তুষ্ট করিয়াছেন বলিয়া এই সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে চলিয়াছেন।

পরদিবস প্রাতে রাম বননির্বাসনের আদেশ প্রাপ্তির পর জননী কৌশল্যার গৃহে প্রবেশ করিলেন। কৌশল্যা তখন সংযতভাবে রাত্রি-যাপন করিয়া পট্টবস্ত্র ধারণ করিয়া বিষ্ণুপূজা করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক ঋত্বিকগণকর্তৃক আহুতি প্রদান করাইতেছিলেন। উপবাসকৃশা জননী কৌশল্যা জলদ্বারা দেবতাকে তর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বহুক্ষণ পরে রামকে দেখিয়া কৌশল্যা—অভিচক্রাম সংহৃষ্টা কিশোরং বড়বা যথা ॥ ২-২০।২০)। রাম জননীর চরণবন্দনা করিলে জননীও পুত্রকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া মস্তকে আঘ্রাণ করিলেন ও দুরাধর্ষ পুত্রকে প্রিয় ও হিতকর বাক্যসমূহ বলিতে লাগিলেন। কৌশল্যা রামকে বসিবার আসন দিয়া কিঞ্চিৎ ভোজন করিতে বলিলে স্বভাববিনীত রাম আসনটি স্পর্শ করিয়া জননীকে দণ্ডকারণ্য নির্বাসনের সংবাদ দিলেন। তাহা শুনিবামাত্র কৌশল্যা স্বর্গচ্যুতা দেবীর ন্যায় সহসা ভূপাতিত হইলেন।[১]

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি রামায়ণের অধিকাংশ চরিত্রই কমবেশী ধর্মপরায়ণ। কিন্তু সর্বদা পূজার্চনায়, ব্রত উপবাসে রত একমাত্র কৌশল্যাকেই দেখিতে পাই। মনে হয় কৌশল্যা সর্বদা দশরথ ও কৈকেয়ীর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ করিতেন। ক্ষোভ হইতে মুক্তি পাইবার আগ্রহ হয়তো পূজার্চনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখিবার অন্যতম কারণ।

শোকপীড়িতা কৌশল্যা লক্ষ্মণের সম্মুখেই রামকে বলিতে লাগিলেন যে, যদি তিনি বন্ধ্যা থাকিতেন তবে তিনি এত দুঃখ পাইতেন না। পতির অনুরাগ হইতে বঞ্চিত হইয়া যে-সুখলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন সেই সুখ তিনি পুত্রদ্বারা লাভ করিবেন আশা করিয়াছিলেন। আজ তিনি জ্যেষ্ঠা রাজমহিষী হইয়াও কনিষ্ঠা সপত্নীদের কর্কশবাক্য শ্রবণ করিতে বাধ্য হইবেন। কারণ তাঁহারা সর্বদা কৌশল্যাকে হৃদয়বিদারক বাক্য বলিতে অভ্যস্ত। আর ইহা হইতে 'দুঃখতরং কিন্নু প্রমদানাং ভবিষ্যতি'। রাম বনে চলিয়া গেলে কৌশল্যা অতি শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইবেন। কারণ—পতির আনুকূল্যবঞ্চিতা আমি অতিশয় নিগ্রহভোগ করিয়া থাকি। আমি কৈকেয়ীর পরিচারিকাতুল্য কিংবা তদপেক্ষাও হীন হইয়া

১। সা নিকৃত্তেব শালস্য যষ্টিঃ পরশুনা বনে।
পপাত সহসা দেবী দেবতেব দিবশ্চ্যুতা ॥ ২।২০।৩২

রহিয়াছি।[১] রামের উপনয়নের পর সপ্তদশ বৎসর দুঃখের অবসান কামনা করিয়া তিনি অপেক্ষা করিয়াছেন। রামকে তিনি অনেক কষ্টে বর্ধন করিয়াছেন—হতভাগিনী আমি বহু উপবাস ও বহু দেবতার পূজা করিয়া, বহু পরিশ্রমের দ্বারা অনেক কষ্টে তোমাকে বর্ধিত করিয়াছি কিন্তু তাহা সকল ব্যর্থ হইল।[২] রাম বনে গমন করিলে কৌশল্যা অনশনব্রত পালন করিবেন। তাহাতে কৌশল্যার মৃত্যু হইলে রামের নরকগমনই হইবে। রাম বহু প্রকার যুক্তিসম্মত বাক্য বলিয়া কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিতে চাহিলে কৌশল্যা বলিতে লাগিলেন—

শ্রেয়ো মুহূর্তং তব সন্নিধানং
মমৈব কৃৎস্নাদপি জীবলোকাৎ॥ ২।২১।৫৩

রাম কৌশল্যার একমাত্র আশ্রয় ও ধর্মস্বরূপ দশরথকে পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। যযাতির মত সত্যরক্ষা করিয়া রাম যাহাতে ফিরিয়া আসিতে পারেন তাহার জন্য জননী যেন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করেন। নরশ্রেষ্ঠ রাম এভাবে জননীর প্রসন্নতা উৎপাদন করিলেন।

রাজা দশরথের সাড়ে তিনশত মহিষী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবলমাত্র কৌশল্যাকেই কৈকেয়ী এত গঞ্জনা দিতেন কেন আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কারণ সুমিত্রাকে কৈকেয়ীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পোষণ করিতে দেখি নাই। কৈকেয়ী যে সুমিত্রার প্রতি কোন প্রকার কর্কশ আচরণ করিতেন তাহার কোন ইঙ্গিত সুমিত্রা কোথায়ও দেন নাই। কৌশল্যা বলিয়াছেন—সপত্নীরা তাঁহার সহিত দুর্ব্যবহার করিতেন। ইহাতে প্রশ্ন জাগে অন্যান্য মহিষীরা কি দশরথের প্রধানা মহিষীকে গঞ্জনা দিতে সাহস করিতেন? মনে হয় একা কৈকেয়ীকে তিনি সপত্নীরা বলিয়াছেন। কারণ কৈকেয়ী তাঁহার প্রতি এত দুর্বাক্য প্রয়োগ করিতেন যে, তাঁহার নিকট কৈকেয়ী একাই অনেক সপত্নীর তুল্য বিবেচিত হইয়াছেন।

১। অত্যন্তং নিগৃহীতাস্মি ভর্তুর্নিত্যমসম্মতা।
পরিবারেণ কৈকয্যাঃ সমা বাপ্যথবাবরা॥ ২।২০।৪২

২। ২।২০।৪৮

পতির অনুরাগবঞ্চিত, সপত্নীকর্তৃক অত্যাচারিত এই নারীর জন্য সত্যই আমরা সমবেদনা বোধ করি। রাম অযোধ্যায় থাকাকালীন কৈকেয়ী কৌশল্যার প্রতি ঐরূপ দুর্ব্যবহার করিতেন। রাম নির্বাসনে গেলে ও ভরত অযোধ্যার রাজা হইলে ত কৌশল্যার প্রতি কৈকেয়ীর অত্যাচারের সীমা থাকিবে না। এখনই দশরথ কৌশল্যাকে অবহেলা করেন তখন ত কৈকেয়ীর ভয়ে তিনি কিছু বলিতে সাহস করিবেন না। সেজন্যই রামের সহিত বনগমনের জন্য কৌশল্যা ভীষণ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

রামের সান্ত্বনাবাক্যে কৌশল্যা কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে সংযত করিলেও তাঁহার হৃদয় আবার শোকে উদ্বেলিত হইয়া পড়িল। কৌশল্যা অশ্রুপূর্ণ নয়নে পুত্রকে বলিলেন যে, তিনি যেহেতু রামকে বনগমনরূপ দৃঢ়-সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না তাহাতে মনে হয় দৈবকে অতিক্রম করা কঠিন।

কৌশল্যা রামের পুনরাগমন করিয়া কামনা বলিলেন—পুত্র। ইদানীং তুমি গমন কর, পুনরায় মঙ্গলের সহিত আগমন কর, মধুর সান্ত্বনাবাক্যে আমাকে পুনরায় আনন্দিত করিও।[১]

এই কথা বলিয়া কৌশল্যা রামের জন্য মাঙ্গলিক কর্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি এখন ধর্ম, দেবতা, মহর্ষি হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্র বৃক্ষ, সর্প, হ্রদ প্রভৃতি পৃথিবীর সকল বস্তুই যাহাতে রামকে রক্ষা করে তাহা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাম যখন ভ্রমণ করিবেন তখন যেন বনচারী কেহ তাঁহার হিংসাকারী না হয় কৌশল্যা তাহা কামনা করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা রামের হস্তে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ওষধি ও শুভকরী বিশল্যকরণী রক্ষাবন্ধন করিলেন।[২] অন্তরে দুঃখিত হওয়া সত্ত্বেও বাহিরে আনন্দপ্রকাশপূর্বক বলিলেন—তুমি সুস্থ দেহে সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া পুনরায় অযোধ্যায় আসিয়া রাজকার্যে মন দিবে। আমি তোমাকে দেখিয়া সুখলাভ করিব।

১। গচ্ছেদানীং মহাবাহো ক্ষেমেণ পুনরাগতঃ।
নন্দয়িষ্যসি মাং পুত্র সাম্না শ্লক্ষ্ণেন চারুণা ॥ ২।২৪।৩৬

২। ঔষধীঞ্চ সুসিদ্ধার্থাং বিশল্যকরণীং শুভাম্।
চকার রক্ষাং কৌসল্যা মন্ত্রৈরভিজজাপ চ ॥ ২।২৫।৩৮

কৌশল্যার মধ্যে চিরন্তন মাতাকে দেখিতেছি। রামজননী কৌশল্যা ত্রিভুবনের অপরাজেয় বীর রামকে রক্ষা করিবার জন্য দেবতা মহর্ষি হইতে ক্ষুদ্র সর্প কিংবা বৃক্ষ কাহারও নিকট দয়াভিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রাম যত বীর হউন না কেন জননীর নিকট ক্ষুদ্র বালকই রহিয়া গিয়াছেন। রামের মঙ্গলকামনায় তিনি ঔষধি ও বিশল্যকরণীর রক্ষাকবচ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত পুত্রের অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া নিজের দুঃখ অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া আনন্দ প্রকাশও করিয়াছেন। সুস্থদেহে পুত্রের পুনরাগমন কামনা করিয়া প্রিয়পুত্রকে বিদায় দিয়াছেন।

রাম সীতা ও লক্ষ্মণসহ সুমন্ত্রচালিত রথে করিয়া বনবাসে গমন করিতেছেন। অযোধ্যাবাসীদের সঙ্গে সঙ্গে দশরথ ও কৌশল্যাও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। মহাকবি অতি করুণ ও সুন্দর উপমার সাহায্যে কৌশল্যার মর্মস্পর্শী অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন—

সন্তানবৎসলা ধেনু যেরূপ রাখালকর্তৃক গৃহাভিমুখী চালিত হইয়াও বৎসের দিকে ধাবিত হয়, সেরূপ রামমাতাও রামের দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন।[১]

এদিকে দশরথ রামের রথোত্থিত ধূলিও যখন আর দেখিতে পাইলেন না তখন অতি কাতরভাবে ভূতলে পতিত হইলেন। এই সময় কৌশল্যা দশরথকে উত্থাপিত করিবার জন্য দক্ষিণবাহু ধারণ করিলেন। কৈকেয়ীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ দশরথ কৌশল্যার ভবনে নিয়া যাইতে গৃহভৃত্যদিগকে আদেশ দিলেন। অর্ধরাত্রে দশরথ কৌশল্যাকে হাত দিয়া স্পর্শ করিতে বলিলেন। কারণ রামের অনুগামী দশরথের দৃষ্টি তখনও ফিরিয়া আসে নাই। কৌশল্যা দশরথের নিকট বসিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন—

কৈকেয়ীকে আনুকূল্য দেখাইতে গিয়া দশরথ কৌশল্যাকে অবহেলা করিতেন। সেই অবজ্ঞাতা কৌশল্যার গৃহেই দশরথ পুনরায় আশ্রয় লইয়াছেন। এখানেই কৌশল্যার জয় সূচিত হইল। কৈকেয়ীর

১। প্রত্যগারমিবায়ান্তী সবৎসা বৎসকারণাৎ।
বদ্ধবৎসা যথা ধেনু রামমাতামভ্যধাবত॥ ২।৪০।৪৩

প্ররোচনায় কৌশল্যা পুত্রকে হারাইলেন। কিন্তু স্বামীকে ফিরিয়া পাইলেন।

সুমন্ত্র রামসীতাকে বনে রাখিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়া রামসীতার সংবাদ দশরথকে জানাইলে তিনি বারংবার চৈতন্য হারাইতে লাগিলেন। সুমন্ত্রকে দেখিয়া দশরথ বাক্যহীন থাকিলে কৌশল্যা স্বামীকে বলিতে লাগিলেন—তিনি কেন সুমন্ত্রের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না? রামের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের পর তিনি কেন এখন লজ্জিত হইতেছেন? মহারাজ সত্যপালনের পুণ্যলাভ করিয়াছেন। তিনি এখন শোক করিলে রামের কি লাভ হইবে? আর যাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া দশরথ রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পান না সেই কৈকেয়ী এখানে নাই। সুতরাং সারথির সহিত কথা বলিতে তাঁহার বাধা কোথায়?

রাজা দশরথ যে মহিষীকে প্রিয়ংবদা, প্রিয়কামা, সখী প্রভৃতি বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। সেই পতিপরায়ণা কৌশল্যার পুত্র-শোকাকুল নৃপতির প্রতি এরূপ বিদ্রূপ আমাদের নিকট বিসদৃশ মনে হয়। রামকে বনে প্রেরণ করিয়া দশরথও কম লজ্জিত ও শোকাকুল নহেন। শোকে দুঃখে কৌশল্যা অপ্রাকৃতস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়াই হয়তো এরূপ উক্তি করিয়াছেন।

বিলাপপরায়ণা কৌশল্যা শোক সহ্য করিতে না পারিয়া পুনরায় দশরথের প্রতি কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সর্বদা রাজসুখে পালিত পুত্রদ্বয় ও রাজবধূ সীতাকে দশরথ কিভাবে এরূপ দুঃখপ্রদান করিতে সমর্থ হইলেন? রাম যদি চতুর্দশ বৎসর পরে অযোধ্যায় ফিরিয়াও আসেন তখন ভরত রাজ্য ছাড়িয়া দিবেন কিনা সন্দেহ। আর ভরতকর্তৃক উপভুক্ত রাজ্য রাম গ্রহণ করিবেন কিনা তাহাও বলা যায় না। কারণ রাম প্রতাপশালী। কৌশল্যা বলিতে লাগিলেন: মৎস্য যেরূপ নিজ সন্তানকে ভক্ষণ করে সেরূপ দশরথও সিংহতুল্য পরাক্রমশালী বৃষভতুল্য বলবান্ ও নরশ্রেষ্ঠ রামকে হত্যা করিয়াছেন।[১] দশরথ কৌশল্যার প্রথম আশ্রয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি সপত্নীর বশীভূত। দশরথ এই কার্যদ্বারা রাষ্ট্র ও মন্ত্রিসহ প্রজাবর্গ ও পুত্রসহ

১। স তাদৃশঃ সিংহবলো বৃষভাক্ষো নরর্ষভঃ।
স্বয়মেব হতঃ পিত্রা জলজেনাত্মজো যথা॥ ২।৬১।২২

কৌশল্যাকে নিহত করিয়াছেন। কৌশল্যার মুখে নিদারুণ অভিযোগ শ্রবণ করিয়া দশরথ চৈতন্যহীন হইয়া পড়িলেন।

দশরথের প্রতি কৌশল্যার কর্কশবাক্য প্রয়োগ প্রায় সর্বত্র সমালোচিত হইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া তিনি যেখানে মৎসভক্ষণকারী মৎস্যের সঙ্গে দশরথের তুলনা করিয়াছে। কৌশল্যা এই ব্যাপারে কতদূর সমালোচনার যোগ্য তাহা আলোচ্য। আমরা প্রথম হইতে দেখিয়াছি অগ্রজা মহিষী হইয়াও দশরথের নিকট কৌশল্যার কোন স্থান ছিল না। বরঞ্চ দশরথের প্রিয়তমা পত্নী কনিষ্ঠা মহিষীর নিকট কৌশল্যাকে সর্বদা গঞ্জনা শুনিতে হইয়াছে। কৌশল্যা একটি-মাত্র আশায় বুক বাঁধিয়াছিলে যে রাম একদিন রাজা হইবেন। তখন কৌশল্যা অন্ততঃ রাজমাতারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দশরথ ও কৈকেয়ীকর্তৃক অবমাননার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারিবেন। কিন্তু তাহাতেও বাদ সাধিলেন দশরথ। কৈকেয়ীর ইচ্ছায় প্রিয়তম পুত্রকে বনবাসে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন। তবুও কৌশল্যা প্রথমে দশরথকে কিছু বলেন নাই। তাঁহার নিজভবনে সাদরেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুমন্ত্রকর্তৃক বর্ণিত বনবাসে প্রিয়পুত্র রাম ও পুত্রবধূর দুর্দশার কথা শুনিয়া তিনি নিজেকে আর সংযত রাখিতে পারিলেন না। স্বামীকে কঠোরতম ভাষায় তিরস্কার করিলেন।

চৈতন্য পাইয়া দশরথ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন কৌশল্যা পরের প্রতি কখনও নির্দয় নহেন আর দশরথ হইতেছেন তাঁহার স্বামী। দুঃখে পতিত স্বামীর প্রতি এরূপ নিদারুণ বাক্য তিনি প্রয়োগ করিতে পারেন না। একথা শুনিবামাত্র বর্ষাকালের প্রণালীর মত কৌশল্যার নয়ন হইতে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। তিনি দশরথের পদ্মতুল্য হস্তযুগল সসম্ভ্রমে মস্তকে ধারণ করিয়া ত্রস্ত হইয়া দ্রুত বলিলেন যে—

প্রসীদ শিরসা যাচে ভূমৌ নিপতিতাস্মি তে।
যাচিতাস্মি হতা দেব ক্ষন্তব্যাহং নহি ত্বয়া ॥ ২।৬২।১২

দশরথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কৌশল্যা বলিলেন যে, তিনি পুত্রশোকে বিহ্বল বলিয়াই এরূপ আচরণ করিয়াছেন। রামের বনবাসের পঞ্চরাত্রি তাঁহার নিকট পঞ্চবর্ষতুল্য মনে হইতেছে। কৌশল্যার বাক্যে আনন্দিত হইয়া দশরথ নিদ্রাভিভূত হইলেন ও সেই রাত্রেই পুত্র-শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন।

ভরত কেকেয়প্রদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে কৌশল্যা ভরতকে বলিলেন, রাজ্যকামনাকারী ভরত এখন কৈকেয়ীর ক্রূর কার্যের দ্বারা নিষ্কণ্টক রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেন। এখন যেন ভরত রামের নিকট কৌশল্যাকে পেঁৗছাইয়া দেন। ভরত নানারূপ শপথ করিয়া নিজের দোষহীনতার প্রমাণ করিতে করিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। কৌশল্যা বুঝিতে পারিলেন যে, বন নির্বাসনের ব্যাপারে ভরত সত্যসত্যই নির্দোষ। তিনি ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

আমরা লক্ষ্য করি বাক্যবাণে কৌশল্যা দশরথকে আহত করিয়াছেন ঠিকই। কিন্তু যে মুহূর্তে দশরথ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, সেই ক্ষণেই কৌশল্যা লজ্জিত ও ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। স্বামীর হস্ত মস্তকে রাখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কৈকেয়ীর প্রতি কৌশল্যার বিদ্বেষের অন্ত ছিল না এবং সেটা সঙ্গতও। দশরথের মৃত্যুর পর তাঁহার ভবনে কৈকেয়ী প্রবেশ করিলে নৃশংসা দুষ্টচারিণী বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিতে কৌশল্যা দ্বিধাবোধ করেন নাই। মনে হয় কৌশল্যা কৈকেয়ীকে এই প্রথম এরূপ তিরস্কার করিতে সাহস করিয়াছিলেন। পুত্রশোক ও স্বামিশোক তাঁহাকে সাহসী করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি নির্দোষ ভরতকে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝিতে পারিলেন ভরত এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ তখন ভরতকে নিজপুত্রের ন্যায় ক্রোড়ে লইয়াছেন।

চিত্রকূটে যাইবার পথে শৃঙ্গবেরপুরে ভরত রামের জটাধারণের কথা শুনিয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে কৌশল্যা নিজপুত্রের ন্যায় ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

পুত্র! তোমার শরীর কোন ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হয় নাই ত? এই

রাজবংশের অস্তিত্ব এখন তোমারই অধীন। কেবলমাত্র তোমাকে দেখিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি। এখন তুমিই আমাদের একমাত্র গতি।[১]

আমরা দেখিতেছি কৌশল্যার নিকট ভরত এখন স্বপুত্রের স্থান অধিকার করিয়াছেন। অযোধ্যা রাজ্য সম্বন্ধেও কৌশল্যার যথেষ্ট চিন্তা ছিল। কারণ তিনি জানিতেন, রাজাহীন রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। রামলক্ষ্মণ বনে নির্বাসিত। এমন সময় ভরত যদি অসুস্থ হইয়া পড়েন তবে অযোধ্যারাজ্যের সমূহ বিপদ্ উপস্থিত হইবে।

চতুর্দশ বৎসর পরে রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে প্রিয়পুত্রকে দেখিবার জন্য কৌশল্যা নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে—

রামো মাতরমাসাদ্য বিবর্ণাং শোককর্শিতাম্।
জগ্রাহ প্রণতঃ পাদৌ মনো মাতুঃ প্রহর্ষয়ন্॥ ৬।১২৭।৪৯

ইহার পর বহুকাল বাঁচিয়া থাকিয়া পুত্রপৌত্র পরিবৃত হইয়া কৌশল্যা কালধর্ম লাভ করিলেন। এই ধর্মচারিণী নারী সারা জীবন ধরিয়া যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা ভোগ করিয়াই স্বামীর সহিত পরলোকে মিলিত হইলেন।

কৈকেয়ী

রামায়ণের চরিত্রগুলির মধ্যে কৈকেয়ীর মত অবজ্ঞাত ধিক্কৃত চরিত্র আর একটিও নাই। এই নারীর জীবনে সাময়িকভাবে কি মতিচ্ছন্নতা আসিয়াছিল জানি না তাহার প্রতিফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল সারা জীবন ধরিয়া। এমন কি সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীর নিকট কৈকেয়ী ক্রূর প্রকৃতি, কুটিলচরিত্রা নারীর প্রতীক। ভারতের কাব্যপুরাণে এমন আর একটি সর্বজননিন্দিত চরিত্রের উল্লেখ আছে কিনা সন্দেহ। প্রভূত গুণের অধিকারিণী হইয়াও দশরথের কনিষ্ঠা মহিষী কৈকেয়ী সকলের নিকট ঘৃণিত চরিত্ররূপেই প্রকাশিত।

দশরথের সাড়ে তিনশত মহিষীর মধ্যে কৈকেয়ীই হইতেছেন দশরথের প্রিয়তমা মহিষী। দশরথ এই মহিষীটিকে সহজে লাভ করিতে পারেন

১। পুত্র ব্যাধির্ন তে কশ্চিচ্ছরীরং প্রতিবাধতে।
অস্য রাজকুলস্যাদ্য ত্বদধীনং হি জীবিতম্॥ ২।৮৭।৯

নাই। কৈকেয়ীর পিতার নিকট কৈকেয়ীর পুত্রই অযোধ্যার সিংহাসন লাভ করিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া দশরথ কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই প্রতিজ্ঞার ফল যে কি বিষময় হইতে পারে তাহা চিন্তা করিবার মানসিক অবস্থা দশরথের ছিল না। সুতরাং পণবন্ধলভ্যা এই কনিষ্ঠা মহিষীই দশরথের বিশেষ আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। এই মহিষীর কোন ইচ্ছা পূরণ না করিবার মত ক্ষমতা নৃপতির ছিল না। কৈকেয়ীকর্তৃক অনুষ্ঠিত অন্যায়কার্যও দশরথ নির্দ্বিধায় মানিয়া লইতেন। স্বামীর এই অতিরিক্ত আদরই কৈকেয়ীকে অভিমানিনী স্পর্ধিতা নারীতে পরিণত করিয়াছিল। ইহার জন্য দশরথকে মূল্য দিতে হইয়াছিল। কৈকেয়ীকেও কম নয়। এই স্পর্ধিতা আত্মাভি-মানিনী নারীর সকল অহঙ্কার ধূলায় মিশিয়া গিয়াছিল।

আদিকাণ্ডে পুত্রেষ্টিযজ্ঞের অবসানে পায়েস বিভাগের সময়ই আমরা কৈকেয়ীর প্রথম উল্লেখ পাই। যজ্ঞানুষ্ঠানের পর দ্বাদশ মাস অতিক্রান্ত হইলে কৈকেয়ীর গর্ভে দশরথের দ্বিতীয় পুত্র ভরতের জন্ম হয়।

দশরথের অন্যান্য পুত্রদের সহিত দ্বাদশ বৎসর বয়সে মিথিলায় মাণ্ডবীর সহিত ভরতের বিবাহ হয়। বিবাহান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর ভরত দ্বাদশ বৎসর মাতুলালয়ে অতিবাহিত করেন। এমন সময় দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্র রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করেন। রাম রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন সেকথা কিন্তু দশরথ তাঁহার পত্নীদের জানান নাই। অভিষেকের পূর্বদিন কৈকেয়ীর পিতৃগৃহের ধাত্রী মন্থরা প্রাসাদ শিখরে উঠিয়া অযোধ্যার গৃহ ও জনসাধারণকে সজ্জিত দেখিয়া ও প্রজাগণকে আনন্দ উৎসবে মগ্ন দেখিতে পাইয়া রামধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারে যে আগামীকাল রামের রাজ্যাভিষেক হইবে। শুনিবামাত্র ক্রুদ্ধা মন্থরা কৈকেয়ীর গৃহে গিয়া শয়ানা কৈকেয়ীকে বলিল—তুমি কিরূপে শয়ন করিয়া আছ? তোমার সম্মুখে যে ভয় উপস্থিত হইয়াছে।

কৈকেয়ীকে মন্থরা জানাইল যে, আগামীকল্য রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতে চলিয়াছেন। দশরথ মুখে ধর্মকথা বলেন। কিন্তু কার্যকালে অতি শঠ। তিনি কৈকেয়ীকে মুখে প্রিয় কথা বলেন অথচ রামকে রাজ্য দিয়া রামজননী কৌশল্যার মনোবাসনা পূর্ণ করিতে চলিয়াছেন। মন্থরার কথা শুনিবামাত্র শারদী চন্দ্রলেখার ন্যায় বিস্ময়ান্বিতা ও আনন্দিতা কৈকেয়ী শয্যা হইতে উঠিয়া কুব্জাকে দিব্য আভরণ প্রদান করিয়া বলিলেন—মন্থরে! তুমি আমাকে অতি প্রিয় সংবাদ শুনাইলে। তোমার

জন্য আমি কি করিতে পারি? রাজা রামকে অভিষিক্ত করিতেছেন। ইহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহা হইতে প্রীতিকর সংবাদ আমার নিকট আর কিছুই হইতে পারে না। তুমি যে প্রিয়সংবাদ দিয়াছ সেজন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু তোমাকে দান করিব।[১]

ক্রুদ্ধা ও দুঃখান্বিতা মন্থরা সকল আভরণ ফেলিয়া দিয়া অসূয়াপূর্বক বলিল, শোকসাগরে পতিত হইয়াও কৈকেয়ী কেন আনন্দ অনুভব করিতেছেন তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে না। ভরত দশরথের দ্বিতীয় পুত্র বলিয়াই ভরত হইতে রামের ভয়। সুতরাং রাজা হইয়া রাম ভরতের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করিবেন। দশরথের প্রিয়তমা পত্নী কৈকেয়ীকেও সপত্নী কৌশল্যার সেবা করিতে হইবে। মন্থরাকে এতাদৃশ বিদ্বেষভাবাপন্ন দেখিয়া কৈকেয়ী রামের গুণাবলীর প্রশংসা করিয়া বলিলেন—মন্থরে! রাম গুণবান্, ধর্মজ্ঞ, সুশিক্ষিত, কৃতজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ ও অতি পবিত্রচেতা। রাম দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র সুতরাং যৌবরাজ্যের অধিকারী। দীর্ঘায়ু রাম ভ্রাতা ও ভৃত্যদিগকে পিতার ন্যায় পালন করিবেন। সুতরাং রামের অভিষেক শুনিয়া তোমার সন্তাপের কারণ কি? আমি ভরতের যেরূপ শুভাকাঙ্ক্ষীণী, সেরূপ রামেরও। আর রাম স্বীয়জননী অপেক্ষা আমাকেই বেশী শুশ্রূষা করেন। রামের রাজ্যপ্রাপ্তি ত ভরতেরই রাজ্যপ্রাপ্তি। ভ্রাতাদিগকে রাম নিজতুল্যই মনে করেন।[২]

আমরা এখন পর্যন্ত কৈকেয়ীর চরিত্রের যে প্রকাশ দেখিতে পাই তাহা উজ্জ্বলতম মহিমায় দ্যুতিমান্। রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ শুনিবামাত্র আনন্দে উদ্বেলিতা কৈকেয়ী মন্থরাকে শ্রেষ্ঠ উপহার দান করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন। মন্থরা দশরথের দুষ্ট অভিপ্রায় সম্বন্ধে ও কৌশল্যা রাজমাতা হইবেন বলিয়া কৈকেয়ীকে সচেতন করিতে চাহিলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অভূতপূর্ব

১। ন মে পরং কিঞ্চিদিতো বরং পুনঃ
প্রিয়ং প্রেয়ার্হে সুবচং বচোঽমৃতম্।
তথা হ্যবোচস্ত্বমতঃ প্রিয়োত্তরং
বরং পরং তে প্রদদামি তং বৃণু॥ ২।৭।৩৬

২। রাজ্যং যদি হি রামস্য ভরতস্যাপি তত্তদা।
মন্যতে হি যথাত্মানং তথা ভ্রাতৃংস্তু রাঘবঃ॥ ২।৮।১৯

প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে রাম জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া যৌবরাজ্যের অধিকারী। এরূপ উদারতা আমরা দশরথ বা কৌশল্যা কাহারও চরিত্রে দেখিতে পাই না।

এদিকে মন্থরা কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কৈকেয়ীকে বুঝাইতে সচেষ্ট হইল যে কৈকেয়ী মূর্খের ন্যায় স্বস্বার্থ বুঝিতেছেন না। রাম রাজা হইলে ভরতের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যাহাতে ভরতের রাজ্যলাভ হয় ও রামের নির্বাসন অনুষ্ঠিত হয় তাহা যেন কৈকেয়ী চিন্তা করেন। এবার মন্থরা কৈকেয়ীকে যথেষ্ট উত্তেজিত করিতে সফল হইয়াছে। মন্থরা স্মরণ করাইয়া দিল বহুপূর্বে দশরথ শম্বর নামক অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আনিয়া কৈকেয়ী তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া দশরথ কৈকেয়ীকে দুটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন। কৈকেয়ী তখন সেই বরদ্বয় পরে চাহিয়া লইবেন বলিয়াছিলেন। এখন যেন কৈকেয়ী সেই বরদ্বয় প্রার্থনা করেন। একটিতে রামের বননির্বাসন ও অপর বরে ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি। দশরথ গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্বে কৈকেয়ী যেন ক্রোধাগারে গমন করিয়া আভরণ পরিত্যাগপূর্বক মলিনবসন পরিধান করিয়া শয়ন করিয়া থাকেন। মহারাজ যখন কৈকেয়ীকে তুষ্ট করিতে চাহিবেন তখন যেন কৈকেয়ী বরদুটি প্রার্থনা করেন। দশরথের পক্ষে প্রিয়তমা পত্নী কৈকেয়ীর কোন কথা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। রাম চতুর্দশ বৎসর বনে থাকিলে ক্রমে প্রজাগণের প্রীতি হইতে বঞ্চিত হইবেন (রামোহরামো ভবিষ্যতি)। ততদিনে ভরত প্রজাগণের অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতে পারিবেন।

মন্থরার পরামর্শমত কৈকেয়ী ক্রোধাগারে গমন করিয়া বলিলেন—বনং তু রাঘবে প্রাপ্তে ভরতে প্রাপ্স্যতে ক্ষিতিম্ (২।৯।৫৮)—এই সংবাদ আমাকে জানাইবে অথবা আমার মৃত্যু সংবাদ দশরথকে প্রদান করিবে। এমন সময় কৈকেয়ীকে রাম সম্বন্ধে প্রীতিজনক সংবাদ জানাইবার জন্য দশরথ কৈকেয়ীর গৃহে প্রবেশ করিয়া উত্তম শয্যায় কৈকেয়ীকে দেখিতে না পাইয়া বিষণ্ণ হইলেন। দ্বাররক্ষিণীর নিকট রাজা জানিতে পারিলেন যে কৈকেয়ী ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। দশরথ ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া ভূমিতে শয়ানা কৈকেয়ীকে দেখিয়া অতি উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। কৈকেয়ীর কোন ব্যাধি হয় নাই ত? অথবা কাহার প্রিয়কার্য করা কৈকেয়ীর অভিপ্রেত অথবা কে তাঁহার

অনভিপ্রেত কার্য করিয়াছে, তাহা জানিতে চাহিলেন। সুযোগ সন্ধানী কৈকেয়ী এবার দশরথকে নিদারুণ বাক্য বলিতে লাগিলেন, তাঁহার একটি অভিপ্রায় আছে তাহা রাজা পূর্ণ করিবেন ইহাই কৈকেয়ীর ইচ্ছা। মহারাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রিয়তম পুত্র নরোত্তম রামের শপথ লইয়া বলিলেন যে তিনি কৈকেয়ীর বাক্য রক্ষা করিবেন। কৈকেয়ী অভীষ্ট-সাধনে দশরথের আগ্রহ দেখিয়া সকল দেবতাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিলেন দেবতাগণ যেন শ্রবণ করেন—

সত্যসন্ধঃ মহাতেজা ধর্মজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ।
বরং মম দদাত্যেব সর্বে শৃণ্বন্তু দেবতাঃ॥ ২।১১।১৬

দেবগণকে সাক্ষী রাখিয়া কৈকেয়ী দশরথের নিকট দুটি বর প্রার্থনা করিলেন। দশরথ যদি ঐ দুটি বর প্রদান না করেন তবে কৈকেয়ী এখনই বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলেন। কৈকেয়ীর সেই কুলিশকঠোর বাক্য শ্রবণমাত্র দশরথ চৈতন্য হারাইলেন। চৈতন্য ফিরিয়া পাইয়া দশরথ বলিতে লাগিলেন যে, তিনি কৈকেয়ীর প্রার্থনায় বিশ্বাস করিতেছেন না। কারণ পূর্বে কৈকেয়ী বহুবার বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট ভরত যেরূপ প্রিয়, রামও সেরূপ। রাম ভরত অপেক্ষা কৈকেয়ীর শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। আর দশরথও কৈকেয়ীর প্রতি ব্যবহারে রাম অপেক্ষা ভরতের কোন বিশেষত্ব লক্ষ্য করেন নাই। দশরথ কৃতাঞ্জলিহস্তে কৈকেয়ীর পাদদ্বয় স্পর্শ করিয়া রামকে রক্ষা করিতে বলিলেন।

দশরথের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া অতি ভীষণা ও বিকারহীনা কৈকেয়ী বলিলেন যে দশরথ যদি প্রতিশ্রুত বর তাঁহাকে না দেন তবে পৃথিবীতে ধার্মিকরূপে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন? নানা প্রকার যুক্তিপূর্ণ বাক্য দ্বারা দশরথ কৈকেয়ীকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইলেন। কৈকেয়ী কিন্তু অনড়, অটল। দশরথ কৈকেয়ীর পাদদ্বয় স্পর্শ করিতে গেলেন। নির্লজ্জা কৈকেয়ীর চেতনা ফিরিল না। তিনি দশরথকে নানাভাবে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। দশরথ রামকে পরিত্যাগ না করিলে কৈকেয়ী প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া জানাইলে দশরথ বলিলেন—"আমি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তোমার যে পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা পরিত্যাগ করিলাম ও এইসঙ্গে তোমার ঔরসজাত পুত্রকে পরিত্যাগ করিলাম"।[১] কৈকেয়ী কিন্তু

১। যস্তে মন্ত্রকৃতং পাণিরগ্নৌ পাপে ময়া ধৃতঃ।
সংত্যজামি স্বজঞ্চৈব তব পুত্রং সহ ত্বয়া॥ ২।১৪।১৪

তাহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিতা বা লজ্জিতা হইলেন না। ভরত রাজা হইবেন আর তিনি রাজমাতা হইবেন এই চিন্তায়ই তিনি বিভোর।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, মন্থরার পরামর্শ কৈকেয়ী দুইবার প্রত্যাখ্যান করিলেও শেষপর্যন্ত তিনি কুটিলা মন্থরার কুমন্ত্রণাতেই ভুলিলেন। তিনি তাঁহার নিজস্ব যুক্তিবুদ্ধি, ঔদার্য, ধর্মবুদ্ধি হারাইয়া সম্পূর্ণভাবে মন্থরার শরণাগতা হইলেন। মন্থরা তাঁহাকে যুক্তি দিয়া বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছে, দশরথ কৈকেয়ীপুত্রকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার জন্যই দূরদেশে রাখিয়া দিয়াছেন ও যুবরাজ রামকর্তৃক তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ভরতের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। মন্থরা তাঁহাকে একথা বুঝাইতেও সক্ষম হইয়াছে, কামপরায়ণ দশরথের পক্ষে কৈকেয়ীর বাক্য অবহেলা করিবার কোন শক্তিই নাই। কৈকেয়ী দশরথের এই দুর্বলতার সুযোগ পূর্ণভাবেই নিয়াছেন। পূর্বের উদারস্বভাবা কৈকেয়ীর এরূপ নীচতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। কৈকেয়ী জানেন যে, দশরথ ধার্মিক। সুতরাং পূর্ব হইতেই তিনি সকল দেবতাকে সাক্ষী করিয়া তাঁহার প্রার্থিত বরদ্বয় দান করিতে দশরথকে বাধ্য করিয়াছেন। তিনি বারংবার বলিয়াছেন, কৈকেয়ী পূর্বে এরূপ ব্যবহার কখনও করেন নাই। সুতরাং কৈকেয়ীর এই মানসিকতা তাঁহার স্বভাবজাত নয়। মন্থরাকর্তৃক রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ প্রথম জ্ঞাপনের সময় যে-সহৃদয়া কৈকেয়ীর সাক্ষাৎ আমরা পাইয়াছিলাম সেই কৈকেয়ী এখন অতি নীচচরিত্রা কুটিলমনা কৈকেয়ীতে রূপান্তরিতা। দশরথের অতিপ্রিয়া উদারস্বভাবা কৈকেয়ীর অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল। তাঁহার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে অতি খল ও জঘন্য চরিত্রের নারী।

প্রাতঃকালে রাম কৈকেয়ীভবনে প্রবেশ করিয়া দীনভাবে শুষ্কবদনে পিতাকে কৈকেয়ীর সহিত উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। দশরথ 'রাম' এই কথা উচ্চারণ ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারিলেন না। পিতাকে তদবস্থায় দেখিয়া রাম উৎকণ্ঠিত হইয়া কৈকেয়ীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নির্লজ্জা কৈকেয়ী বলিলেন—

মহারাজ কুপিত বা দুঃখিত হয়েন নাই। তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় আছে তাহা তোমার ভয়ে বলিতে পারিতেছেন না।[১] তোমার জন্য আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি যেন সত্য পরিত্যাগ না করেন। আর মহারাজের কথা শুভই হউক বা অশুভই হউক তাহা যদি তুমি অঙ্গীকার কর, তাহা হইলেই আমি সকল বলিতে পারি।

একথা শুনিয়া রাম ব্যথিত দশরথের অভিলষিত জানিতে চাহিলে কৈকেয়ী অম্লানবদনে বরদ্বয়ের কথা রামকে বলিলেন। রাম সত্বর বনে গমন না করিলে দশরথ স্নানও করিবেন না, ভোজনও করিবেন না বলিয়া জানাইলেন।

রামের বিদায়কালে সারথি সুমন্ত্রও মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্ছা-ভঙ্গে সুমন্ত্র অতি ভয়ঙ্কর বজ্রতুল্য বাক্যসমূহ বলিতে লাগিলেন। কৈকেয়ীকে পতিঘ্নী ও কুলঘ্নী বলিয়া তিরস্কার করিলেন। দশরথের বরদ্বয়দ্বারা কৈকেয়ী বাঞ্ছিত অন্য কিছুও পাইতে পারেন। সুমন্ত্রের এই উপদেশ অরণ্যে রোদনমাত্র হইল। কৈকেয়ীর মধ্যে কোন বিকার দেখা গেল না।

দশরথ সৈন্যবাহিনীসহ ধনরাশি ও ধান্যরাশি রামকে দান করিতে চাহিলে বিষণ্ণা সন্ত্রস্তা কৈকেয়ী বলিলেন, সারশূন্য সুরার ন্যায় সম্পদ্‌হীন রাজ্য ভরত গ্রহণ করিবেন না। দশরথ কৈকেয়ীকে অনার্যা বলিয়া তিরস্কার করিলে তিনি জানাইলেন, দশরথের পূর্বপুরুষ সগর জ্যেষ্ঠ-পুত্র অসমঞ্জকে নির্বাসন দিয়াছিলেন। সুতরাং পূর্বপুরুষের ন্যায় দশরথেরও জ্যেষ্ঠপুত্রকে নির্বাসিত করা উচিত।

রাম বনোবাসোপযোগী বল্কল চাহিলে কৈকেয়ী স্বয়ং রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে বল্কল আনিয়া দিলেন। সীতাকে চীর পরিধান করিতে দেখিয়া সজলনয়ন বসিষ্ঠ কৈকেয়ীকে বলিলেন যে, তিনি নিজের মর্যাদা লঙ্ঘন করিতেছেন। আর কৈকেয়ী যদি মৃত্যুবরণও করেন তথাপি পিতৃবংশের আচরণে অভিজ্ঞ ভরত কখনও বিপরীত আচরণ করিবেন না।

রামসীতা বনে গমন করিলে রাজ্যময় হাহাকার পড়িয়া গেল। প্রকৃতিতেও নানারূপ বিপর্যয় দেখা দিল। কৈকেয়ীই কেবলমাত্র আনন্দিতা। আমরা আবার কৈকেয়ীর সাক্ষাৎ পাই দশরথের মৃত্যুর পর। তিনি অন্যান্য মহিষীদের সহিত দশরথের মৃত্যুশোকে ক্রন্দন করিতেছেন।

১। ন রাজা কুপিতো রাম ব্যসনং নাস্য কিঞ্চন।
কিঞ্চিন্মনোগতং ত্বস্য তত্ত্বয়াম্নানুভাষতে॥ ২।১৮।২০

লক্ষণীয় রামকে নির্বাসনে প্রেরণ করিতে দশরথকে কাতর ও ব্যথিত দেখিয়া কুটিলস্বভাবা কৈকেয়ী শপথ করিয়া পুত্রতুল্য রামকে দিয়া পূর্বেই অঙ্গীকার করাইয়া লইয়াছেন ও দশরথের মত রামকেও স্বপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়াছেন। বননির্বাসনের আদেশ পাইয়া রাম তৎক্ষণাৎ বনে যাইতে সম্মত হইলেও কৈকেয়ীর বিশ্বাস জন্মিল না। রাম যাহাতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিতে পারেন সেজন্য তিনি রামকে বলিলেন যে, রাম বনে না যাওয়া পর্যন্ত দশরথ স্নান ভোজন কিছুই করিবেন না। স্বস্বার্থসাধনের জন্য কৈকেয়ীর এরূপ মিথ্যাচরণ ও নীচতা দেখিয়া আমরা বিস্ময়াহত হই। রঘুবংশের অতি বিশ্বস্ত ও প্রবীণ সারথি সুমন্ত্র বা প্রবীণ সিদ্ধার্থ কাহারও তিরস্কারে কৈকেয়ীর চেতনা ফিরিল না। সগররাজার দুর্বিনীত পুত্র অসমঞ্জের সহিত রামের তুলনা করিতে কৈকেয়ী দ্বিধাগ্রস্তা নহেন। অথচ রাম হইতেই কৈকেয়ী সমধিক শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। রাম বল্কল চাহিবামাত্র রামকে স্বয়ং বল্কলদান ও সীতাকে বনবাসে প্রেরণের প্রতিজ্ঞা না থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে বল্কলপ্রদান প্রভৃতি কার্য কৈকেয়ীর নির্লজ্জতার ও নীচতার চরম প্রকাশ। তাঁহার মানসিক বিকৃতি এরূপ চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল যে, রঘুবংশের গুরু মুনি বসিষ্ঠের তিরস্কারেও কৈকেয়ী বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ ও লজ্জিত নহেন। এই স্বার্থপরা নারী পুত্রের জন্য সকল ন্যায় ও ধর্মের পথ পরিহার করিয়া পৃথিবীর সকলের ধিক্কার লাভ করিয়াও উচ্চমস্তকে অম্লানবদনে স্বপ্রতিজ্ঞায় অটল রহিলেন।

দশরথের মৃত্যুর পর কৈকেয়ীকে আমরা ক্রন্দন করিতে দেখিয়াছি। তাহা মনে হয় স্বামীর মৃত্যুশোকের জন্য নহে। অন্তঃপুরের সকল মহিষী-গণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তিনিও ক্রন্দন করিয়াছেন মাত্র। কারণ দশরথের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নী স্বামীর মৃত্যুতে একটি শোকবাক্যও উচ্চারণ করেন নাই। স্বামীর মৃত্যুর জন্য তিনি যে সম্পূর্ণরূপে দায়ী ইহাতেও তাঁহার কোন অনুতাপ ছিল না। এই মুহূর্তে এই নারীকে ভয়ঙ্করা ব্যাঘ্রীর মতই মনে হয়।

ভরত অযোধ্যায় ফিরিয়া পিতার অন্বেষণে কৈকেয়ীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। পিতার কথা জিজ্ঞাসা করায় রাজ্যলোভহেতু কৈকেয়ী ঘোর অপ্রিয় পিতার মৃত্যুসংবাদ শুভসংবাদের ন্যায় প্রদান করিলেন ও নির্বিবাদে বলিলেন—এই সংসারে সকল প্রাণীর যা গতি হয় দশরথেরও তাহা হইয়াছে। পিতার মরণ ও ভ্রাতাদের নির্বাসনে দুঃখিত ভরত মাতাকে কালরাত্রি, বংশনাশিনী, পাপদর্শিনী, অতি নৃশংসা প্রভৃতি সম্বোধন করিয়া নানারূপে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পুত্রের তিরস্কারে আশাভঙ্গ হওয়ায় কৈকেয়ী দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভরদ্বাজের নিকট জননীদের পরিচয় প্রসঙ্গে ভরত স্বজননীর পরিচয় দিয়াছেন—

মমৈতাং মাতরং বিদ্ধি নৃশংসাং পাপনিশ্চয়াম্।
যতো মূলং হি পশ্যামি ব্যসনং মহদাত্মনঃ ।। ২।৯২।২৭

দশরথের মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র আশ্রয় ও একমাত্র পুত্রের নিকট হইতে এরূপ অবমাননাকর তিরস্কার শুনিয়া কৈকেয়ী পুত্রের পার্শ্বেই মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চিত্রকূটে গিয়া ভরত রামকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ জানাইলে কৈকেয়ীসহ জননীরা সকলেই ভরতের প্রশংসা করিয়াছেন। অযোধ্যায় ফিরিবার কালেও দেখি কৌশল্যা, সুমিত্রার ন্যায় কৈকেয়ীর চক্ষ বাষ্পরুদ্ধ হইয়াছে।

ভরত অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া জননীকে অযোধ্যায় রাখিয়া নন্দিগ্রামে গিয়া রাজ্য পরিচালনা করিয়াছেন। জানিনা সকলের অবজ্ঞা ও অবহেলার পাত্র হইয়া গর্বিতা অভিমানিনী কৈকেয়ী কিরূপে চতুর্দশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন। চতুর্দশ বৎসর পরে রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে অন্যান্য জননীদের সহিত কৈকেয়ীও রামের মাঙ্গলিক কার্যে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পরেও বহুকাল বাঁচিয়াছিলেন কৈকেয়ী। কৌশল্যার মৃত্যুর পর কৈকেয়ীও পরলোক গমন করিয়াছেন।

আমরা একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি, কৈকেয়ী স্বপুত্রের অন্তরে কখনও খুব সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। দশরথের আনুকূল্যে প্রজ্ঞাভিমানিনী জননীকে ভরত খুব একটা শ্রদ্ধা করিতেন না জননী কৈকেয়ী সম্বন্ধে সর্বদা ভরত অতি কটু ও কঠোর মন্তব্য

করিয়াছেন। অবশ্য অযোধ্যায় ফিরিয়া জননীকে কঠোর তিরস্কার করা অথবা ভরদ্বাজের নিকট অতি বিরূপ মন্তব্য করা ভরতের পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ মাতার অন্যায়ের ভার পুত্রকেও বহন করিতে হইয়াছে। কিন্তু দ্বাদশ বৎসর পর দূতগণ ভরতকে ফিরাইয়া লইতে আসিয়াছেন। তখন মাতা সম্বন্ধে দূতগণের নিকট আত্মকামা, সদা চণ্ডী, ক্রোধনা প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ পুত্রের পক্ষে উচিত কিনা বিবেচ্য। আর এই পুত্রের জন্যই কৈকেয়ী পৃথিবীর সকলের নিকট নীতিহীনা, লজ্জাহীনা, স্পর্ধিতা নারীরূপে পরিচিত হইয়াছেন। অথচ রামের নিকটই কৈকেয়ী সমধিক শ্রদ্ধা ভক্তি ও শুশ্রূষা লাভ করিয়াছেন। সেই রামকেই তিনি নির্বাসন দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন।

কৈকেয়ী দশরথের নিকট অত্যধিক আদরের পাত্র ছিলেন যাঁহার জন্য দশরথ সকল কিছু এমন কি প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। অথচ দশরথের মৃত্যু যেন কৈকেয়ীর নিকট আশীর্বাদস্বরূপ। কারণ তিনি পুত্রকে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শুভসংবাদের ন্যায় প্রদান করিয়াছিলেন। মনে হয় কৈকেয়ী ভাবিয়াছিলেন যে, দশরথ বাঁচিয়া থাকিলে ভরতের সিংহাসনলাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবেন। কারণ ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি দশরথ কোন মতেই স্বাভাবিকভাবে মানিয়া লইবেন না। তাহাতে ভরতের মত ধার্মিক পুত্র পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিংহাসন লাভ করিতে আগ্রহবোধ করিতেন না। আর সেই কারণেই বোধ হয় কৈকেয়ীর নিকট দশরথের মৃত্যু এত আনন্দজনক সংবাদ।

যে পুত্রের জন্য কৈকেয়ী এত কাণ্ড করিলেন সেই পুত্র হইতেই তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী আঘাত পাইলেন। সপ্তাহ তিনেক ধরিয়া যে-মতিচ্ছন্নতায় তিনি ভুগিতেছিলেন তাহা হইতে মুহূর্তেই মুক্তিলাভ করিলেন।

আমরা কৈকেয়ীর জন্য তখনই প্রচণ্ড দুঃখ অনুভব করি যখন দেখি নিজের সম্বন্ধে পুত্রের মুখে অতি নির্মম বিশেষণ শুনিয়াও তিনি সেই পুত্রের পার্শ্বেই নতমস্তকে দাঁড়াইয়া থাকেন। কৈকেয়ীর জন্য

সহানুভূতি প্রকাশ করিবার একটি লোকও পৃথিবীতে ছিল না। যে পুত্র তাঁহার একমাত্র আশ্রয় হইতে পারিত সেও সেই মুহূর্তে তাঁহার পরম শত্রু। তবে এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই কৈকেয়ী তাঁহার মানসিক দীনতা অতিক্রম করিয়াছেন। কারণ আমরা দেখি যে, চিত্রকূটে ভরত রামকে অযোধ্যায় ফিরিবার অনুরোধ জানাইলে অন্যান্য জননীদের মত কৈকেয়ীও ভরতের প্রশংসা করিয়াছেন। রামের নিকট বিদায় লইয়া চিত্রকূট হইতে প্রত্যাবর্তনকালেও কৈকেয়ীর নয়ন বাষ্পরুদ্ধ ও কণ্ঠ নির্বাক হইয়াছে। তখনও যদি রামের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র বিদ্বেষবোধ অবশিষ্ট থাকিত তবে নিশ্চয়ই এরূপ ঘটিত না। সহজাত উদারতাবোধ না থাকিলে মানুষ এত সহজে এত দ্রুত তাহার মানসিক নীচতা, শঠতা, নিষ্ঠুরতাকে পরিহার করিতে পারে না। সেই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে কৈকেয়ী সকলের অবজ্ঞা, ধিক্কার ও অবহেলার পাত্র নহেন। আর অলৌকিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে রামের মর্ত্যে আগমনের যে প্রধান উদ্দেশ্য রাবণবধ তাহা কৈকেয়ীকর্তৃক রামের বননির্বাসন প্রার্থনা ব্যতীত সফল হইত না।

সুমিত্রা

অযোধ্যাপতি দশরথের তিন মহিষীর মধ্যে সততপ্রসন্না, অনসূয়া ও বুদ্ধিশালিনী দ্বিতীয়া পত্নী সুমিত্রা স্বভাবমাধুর্যে নিজেকে এক অসামান্যা নারীরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। মহাকবি বাল্মীকি এই মহিষীর কথা সামান্যই উল্লেখ করিয়াছেন। তথাপি এই স্বল্প পরিসরেই তিনি চরিত্র-সৌন্দর্যে, মননশীলতায়, স্বাতন্ত্র্যবোধে, ধর্মপরায়ণতায় স্বীয় বৈশিষ্ট্য নিয়া উদ্ভাসিতা। দশরথের চারিপুত্রের মধ্যে দুটি পুত্রের জননী হইতেছেন সুমিত্রাদেবী। তবুও পুত্রসুখ বলিতে যাহা বুঝায়, এই জননীটি তাহা পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। লক্ষ্মণ সর্বদা রামকে, শত্রুঘ্ন ভরতকে ছায়ার মত অনুগমন করিয়াছেন। লক্ষ্মণের সহিত বাক্যালাপ করিতে আমরা তাঁহাকে দুইবার দেখিয়াছি। শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহার কোন যোগাযোগ হইতেই দেখি

নাই। হয়তো পুত্রদের নিকটে পাইবার আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা দূর হইতে তাঁহাদের সুখী দেখিয়াই তিনি তৃপ্ত ছিলেন।

কৌশল্যা কৈকেয়ীর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করিয়াছেন। দশরথকে কটূক্তি করিতেও ছাড়েন নাই। আর কৈকেয়ীর আচরণও সর্বজনবিদিত। কিন্তু সুমিত্রার যেন কাহারও প্রতি কোনও অভিযোগ নাই। কাহারও নিকট কিছু চাহিবারও নাই। নিজ সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে তাঁহার কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। স্বামীর আনুকূল্য পান নাই বলিয়া কৌশল্যা বহু আক্ষেপ করিয়াছেন। রাজা দশরথ সুমিত্রার প্রতি আরও কম আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সেজন্য সুমিত্রার কোন অভিযোগ নাই। তিনি সুখে-দুঃখে সর্বদা কৌশল্যাকে ছায়ার মত অনুগমন করিয়াছেন। কৌশল্যার সুখেই তিনি সুখী। সেজন্য দেখি রাম রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন শুনিয়া তিনি রামের মঙ্গলকামনায় কৌশল্যা, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত জনার্দনের ধ্যানে নিরত। তাঁহার নিজের দুইপুত্র রহিয়াছে। তাঁহাদের রাজ্যলাভ হইল বা না হইল সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন চিন্তাই নাই। কৌশল্যার পুত্র রাম রাজা হইবেন জানিয়াই তিনি পরম তৃপ্ত।

রামের সহিত বনানুগমনের অনুমতি দিয়া সুমিত্রা লক্ষ্মণকে যে-উপদেশ দিয়াছেন, এই ধরিত্রীর ক্রোড়ে আর এরূপ জননী আবির্ভূতা হইবেন কিনা সন্দেহ যিনি পুত্রকে অকাতরে এরূপ উপদেশবাক্য প্রদান করিতে পারেন।

কেকেয়প্রদেশস্থ ভরত দূতগণকে সুমিত্রাকে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিবার সময় বলিয়াছিলেন—

> কচ্চিৎ সুমিত্রা ধর্মজ্ঞা জননী লক্ষ্মণস্য যা।
> শত্রুঘ্নস্য চ বীরস্য অরোগা চাপি মধ্যমা ॥ ২।৭০।৯

ভরতের এই উক্তিই সুমিত্রার ধর্মপরায়ণতার ইঙ্গিত বহন করে।

রামের সহিত লক্ষ্মণ বনে গমন করিয়াছেন। বনগমনকারী পুত্রের জন্য রামজননী কৌশল্যা উন্মাদপ্রায় হইয়া গিয়াছেন। আমরা বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করি, লক্ষ্মণজননী সুমিত্রা কিন্তু পুত্রের জন্য বিলাপ করিতেছেন না। তিনি রামের জন্য অধীরা কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিতেই ব্যস্ত।

লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী সুমিত্রার প্রথম দর্শন আমরা কৌশল্যার সাহচর্যেই পাই। কৌশল্যার সহিত সুমিত্রাও জনার্দনের নিকট রামের

মঙ্গলকামনা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সুমিত্রার যে কোন আত্মপর ভেদ ছিল না ইহাই তাহার প্রমাণ।

কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রাম বনে গমন করিতে উদ্যত। লক্ষ্মণ তাহার সঙ্গী হইবেন। বিদায়ের প্রাক্‌কালে লক্ষ্মণ জননীকে প্রণাম করিতে আসিলে সুমিত্রা ক্রন্দন করিতে করিতে পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বনগমনে অনুমতি দিয়া বলিলেন—

> সৃষ্টস্ত্বং বনবাসায় স্বনরক্তং সুহৃজ্জনে।
> রামে প্রমাদং মা কার্ষীঃ পুত্র ভ্রাতরি গচ্ছতি॥
> ব্যসনো বা সমৃদ্ধো বা গতিরেষ তবানঘ।
> এষ লোকে সতাং ধর্মো যজ্জ্যেষ্ঠবশগো ভবেৎ॥ ২।৪০।৫-৬
> রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
> অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্॥ ২।৪০।৯

রামকে দশরথতুল্য মনে করিও। আর জনকনন্দিনী সীতাকে আমার আমার তুল্য অর্থাৎ মাতৃতুল্য দেখিও। অরণ্যকে মনে করিবে অযোধ্যা-সদৃশ। হে পুত্র। তুমি স্বচ্ছন্দে রামের সহিত গমন কর।

সুমিত্রাকর্তৃক পুত্রকে উপদেশদান হইতে তাঁহার চরিত্রমাহাত্ম্য ও ঔদার্য সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা জন্মে। পুত্রের জন্য সুমিত্রার নয়ন হইতে বাষ্পবারি নির্গত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া কোন বিলাপবাক্য উচ্চারিত হইল না। বরঞ্চ পুত্রকে জানাইলেন যে, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার অনুসরণ করিয়া তিনি সজ্জনসম্মত কার্যই করিতেছেন। আর লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার শেষ উপদেশটি পুত্রের প্রতি জননীর উপদেশের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। পৃথিবীর আর কোন জননী তাঁহার সন্তানকে এরূপ স্বার্থহীন, পবিত্র, অভূতপূর্ব, মূল্যবান্ উপদেশ দিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। শুধুমাত্র এই একটি অমূল্য উপদেশ-বাক্যের দ্বারা সুমিত্রা রামায়ণের চরিত্রগুলির মধ্যে এক উজ্জ্বলতম স্থান লাভ করিয়াছেন।

রাম বনে গমন করিলে শোকাকুল দশরথের নিকট কৌশল্যা বিলাপ করিতে থাকিলে সুমিত্রাই কৌশল্যাকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। তিনি রামের

নানারূপ প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন, পুরুষোত্তম ও সর্বগুণান্বিত পুত্রের জন্য অতি দীনভাবে বিলাপ করা উচিত নহে। রাম পিতাকে সত্যবাদী করিবার জন্য সজ্জনদিগের আচরিত ধর্মপথেই অবস্থান করিয়াছেন। নিষ্পাপ লক্ষ্মণ ও সীতা যখন রামের অনুগমন করিয়াছেন তখন আর রামের জন্য চিন্তার কি আবশ্যক। রামের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা অনুভব করিয়া প্রকৃতিও রামের সুখসম্পাদনে রত থাকিবে। আর রামের মত শৌর্যশালী ব্যক্তির অরণ্যে ভীত হইবার মত কিছুই নাই। রামের মধ্যে যে শ্রী, সৌন্দর্য ও সামর্থ্য রহিয়াছে তাহা দ্বারা তিনি বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইয়া ভূমণ্ডল শাসন করিতে সমর্থ হইবেন। কৌশল্যা শীঘ্রই বন্ধুজনের সহিত রামকে দেখিতে পাইবেন। আর রামের মত পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নহে কারণ—

ন হি রামাৎ পরো লোকে বিদ্যতে সৎপথে স্থিতঃ ॥ ২।৪৪।২৬

এরূপে সুমিত্রার বাক্যে কৌশল্যার শোক দূরীভূত হইল।

দেখা যাইতেছে, নিজের দুঃখ অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া অপরের শোকে কিভাবে সান্ত্বনা দিতে হয় তাহা সুমিত্রা জানেন। সুমিত্রা যদি সাধারণ নারী হইতেন তবে কৌশল্যার সহিত গলা মিলাইয়া নিজেও বিলাপ করিতে আরম্ভ করিতেন। নিজেকে সংযত রাখিয়া অপূর্ব বাক্যবিন্যাসের দ্বারা তিনি কৌশল্যার শোক অপনোদন করিয়াছেন। সুমিত্রার উপদেশাবলী হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, রামের প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ও স্নেহ দুইই ছিল। রাম ধর্মপথে স্থিত। সুতরাং ধর্মপথের অনুসরণকারী রামের কোন কষ্টভোগ করিতে হইবে না বলিয়া তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। পুত্রতুল্য রাম ও স্বপুত্র লক্ষ্মণ দুই জনই অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন। রাজা দশরথসহ সমস্ত অযোধ্যানগরী যখন শোকমগ্ন তখন কেবলমাত্র সুমিত্রাই অবিচল ধৈর্য ধরিয়া কৌশল্যাকে শান্ত করিতে সচেষ্ট রহিয়াছেন। পুত্র লক্ষ্মণের কথা একবারও উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার শোকের বহিঃপ্রকাশ কোথাও নাই। এত বড় বিপদে স্থিরমস্তিষ্কে তাঁহার কর্তব্যকার্য সমাধা করিয়াছেন। রামায়ণের এই

চরিত্রটি নারী চরিত্রের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসাবে শাশ্বত হইয়া থাকিবে।

সীতা

যে নারী বহু সহস্র বর্ষ ধরিয়া ভারতীয় নারীসমাজে তাঁহার অননুকরণীয় গুণরাশির দ্বারা অগ্রগণ্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন তিনি হইতেছেন রামায়ণের শ্রেষ্ঠা নারী রামপত্নী সীতাদেবী। সতী-সাধ্বী সীতা তাঁহার পতিপ্রেম, পূজনীয়দের প্রতি ভক্তি, কর্তব্যবোধ, তেজস্বিতা, সাহসিকতা, অসাধারণ মনোবল, সম্পদের প্রতি প্রবল অনীহা, বিপদে স্থিরচিত্ততা, বুদ্ধিমত্তা, অপরিমেয় ধৈর্য প্রভৃতি চারিত্রিক সম্পদ্ দ্বারা ভারতীয় নারীসমাজে অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্তরূপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সীতার চরিত্র বহুবার অপমানের কালোছায়া দ্বারা কালিমালিপ্ত হইয়াছে। বহুবার বহুভাবে লাঞ্ছিতা হইয়াও তিনি দুর্ভাগ্যের নিকট কখনও নতিস্বীকার করেন নাই। সমস্ত দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হইয়াছেন অতিশয় দৃঢ়তার সহিত। কোমলহৃদয়া সীতা কখনও কখনও বজ্রসমান কঠিনহৃদয়া নারীরূপেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। মানুষ একবারমাত্র বিপদের সম্মুখীন হইলেই তাহার কর্তব্যাকর্তব্য বিস্মৃত হয়। কিন্তু অষ্টাদশ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের অন্তিম দিনটি পর্যন্ত সীতাকে একটার পর একটা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং প্রতিবারেই তিনি সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সসম্মানে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। জীবনের প্রতিটি আঘাত তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, অপরিসীম দুঃখও তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু কখনও মানসিক স্থৈর্য হারান নাই। সীতাকে যে বারংবার দুর্ভাগ্য বরণ করিতে হইয়াছিল তাঁহার জন্য তিনি কোনবারই দায়ী ছিলেন না। কখনও মধ্যমা শ্বশ্রূ কৈকেয়ী ও শ্বশুর দশরথ, কখনও রামচন্দ্র, কখনও বা প্রজাবৃন্দ, কখনও বা রাবণ প্রত্যেকেই তাঁহার দুর্দশাভোগের কারণরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহারও প্রতি সীতার বিন্দুমাত্র অভিযোগ ছিল না। তিনি সকলকিছুর জন্য নিজের ভাগ্যকেই দায়ী করিয়াছেন। সহনশীলতা সীতাচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ধরিত্রীর কন্যা সীতা ধরিত্রীর মত সহনশীলা। বহু দুঃখ, বহু বেদনা, বহু অত্যাচার তিনি সীমাহীন ধৈর্যসহকারে সহ্য করিয়াছেন। প্রতিবাদ হয়তো করিয়াছেন। কিন্তু কখনও সংহারমূর্তি ধারণ করেন নাই।

আত্মবিশ্বাসে বলীয়সী সীতা অসাধারণ মানসিক শক্তিবলে সমস্ত দুঃখদৈন্যকে তুচ্ছ করিয়া স্বমহিমায় দেদীপ্যমানা হইয়া ভারতবাসীর অন্তরলোকে চিরস্থায়ী আসন করিয়া লইয়াছেন।

মিথিলায় আগত রামচন্দ্র সকলের পক্ষে যে কার্য অসম্ভব, সেই হরধনুর্ভঙ্গরূপ কার্য অবহেলায় সম্পাদন করিলে মিথিলাধীশ জনক অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহার কন্যা বীর্যশুল্কা সীতাকে রামের হস্তে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অযোধ্যা হইতে দশরথ, বসিষ্ঠ মুনি প্রভৃতি মিথিলায় আগমন করিলে জনক অগ্নি সাক্ষী করিয়া সীতাকে রামের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন।

প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্নীষ্ব পাণিনা।
পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা॥ ১।৭৩।২৭

পিতার ইচ্ছানুযায়ী সীতা ছায়ার ন্যায়ই স্বামীর অনুগমন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অদৃষ্ট তাঁহাকে বারংবার বঞ্চনা করিয়াছে। তিনি বনবাসে রামের অনুগমন করিয়া অরণ্যজীবনের দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু বিধির বিধানে শেষজীবনে তাঁহাকে স্বামিসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল।

বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, অষ্টাদশী সীতাকে আমরা পুনরায় দেখিতে পাইলাম অযোধ্যাকাণ্ডের চতুর্থ সর্গে যিনি শ্বশ্রূমাতার সহিত রামের সফল অভিষেকের জন্য জনার্দনের ধ্যানে নিরত। পরদিবস প্রাতে মঙ্গলানুষ্ঠান সমাপ্ত করিয়া রাম নিজভবনে সীতার সহিত বসিয়া আছেন। এমন সময় দশরথ ও কৈকেয়ীর নিকট হইতে বার্তা লইয়া সুমন্ত্রের আগমন। সীতার অনুমতি লইয়া রাম কৈকেয়ীভবনে গমন করিলেন। বননির্বাসনের সংবাদে সীতার কি প্রতিক্রিয়া হইবে তাহা ভাবিয়া রামের আনন বিবর্ণ ও শুষ্ক হইয়াছিল। রামকে ঐরূপ বিশুষ্কমুখে গৃহে আগমন করিতে দেখিয়া সীতা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাম সীতাকে বননির্বাসনের সংবাদ জানাইয়া তাঁহার বনগমনের পর গুরুজন ও অন্যান্যদের প্রতি সীতার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। রামের সকল প্রকার উপদেশবাক্য তুচ্ছ করিয়া সীতা জানাইলেন যে, তিনিও রামের সহিত বনগমনে কৃতসঙ্কল্পা। কারণ—

ভর্তুর্ভাগ্যন্তু নার্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ।
অতশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বস্তব্যমিত্যপি ॥ ২।২৭।৫

আর তাহা ছাড়া—আমি তোমা বিনা স্বর্গও কামনা করিব না। আর তমি সঙ্গে থাকিলে অরণ্যবাসও আমার নিকট পিতৃগৃহবাসের আনন্দ দান করিবে।[১]

সীতাকে কোনভাবে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া রাম বনবাসের ভয়াবহতা সম্বন্ধে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন যে, বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ, এমন কি নদীগুলিও মকর প্রভৃতি জন্তুতে পূর্ণ ও পঙ্কময়, বনে তৃণশয্যায় শয়ন করিতে হয়, যৎকিঞ্চিৎ ফলমূলদ্বারা আহার নির্বাহ করিতে হয়। বন সর্বদা অন্ধকারাচ্ছন্ন, সর্বদা প্রবলবায়ু প্রবাহিত হয়। সেখানে নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিতে হয়। সুতরাং দুঃখভোগের কারণস্বরূপ বনে না যাওয়াই সীতার পক্ষে সঙ্গত। রামের বাক্য নিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা জনকনন্দিনী জানাইলেন যে রাম সঙ্গে থাকিলে বনবাসের দোষসমূহও তাঁহার নিকট গুণ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। আর পিতৃগৃহে থাকাকালীন তিনি শুনিয়াছেন তাঁহাকে অতি অবশ্যই বনবাস করিতে হইবে। সুতরাং বাল্যকাল হইতেই বনবাস করিবার মানসিক প্রস্তুতি তাঁহার আছে। অসহায়া সীতা জানাইলেন—'সেবাব্রতা, পতিব্রতা, দীনা আমার নিকট সুখ দুঃখ সমান। হে কাকুৎস্থ। তোমার দুঃখই আমার দুঃখ, তোমার সুখই আমার সুখ। সুতরাং আমাকে বনে লইয়া যাওয়া তোমার একান্ত কর্তব্য।[২] কিন্তু ইহাতেও রামের মন টলিল না দেখিয়া সীতা রামের প্রতি তাঁহার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তিনি এবার রামের পৌরুষে আঘাত দিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে চাহিলেন। যাহাতে অপমানিত বোধ করিয়া রাম সীতাকে বনে লইয়া যাইতে বাধ্য হন। তিনি রামকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—'আমার পিতা মিথিলাপতি জনক কি তোমাকে পুরুষের আকৃতিবিশিষ্ট নারী জানিয়াই আমাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন?'[৩] তাহা ছাড়া—

১। সুখং বনে নিবৎস্যামি যথৈব ভবনে পিতুঃ।
অচিন্তয়ন্তী ত্রীংল্লোকাংশ্চিন্তয়ন্তী পতিব্রতম্ ॥ ২।২৭।১২

২। ভক্তাং পতিব্রতাং দীনাং মাং সমাং সুখ-দুঃখয়োঃ।
নেতুমর্হসি কাকুৎস্থ সমানসুখদুঃখিনীম্ ॥ ২।২৯।২০

৩। কিং ত্বামমন্যত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
রাম জামাতরং প্রাপ্য স্ত্রিয়ং পুরুষবিগ্রহম্ ॥ ২।৩০।৩

ন মামনাদায় বনং ন ত্বং প্রস্থাতুমর্হসি ।
তপো বা যদি বাহরণ্যং স্বর্গো বা স্যাত্বয়া সহ ॥ ২।৩০।১০

আমাকে ফেলিয়া রাখিয়া তুমি কিছুতেই বনে যাইতে পারিবে না। তপস্যা, অরণ্যবাস বা স্বর্গবাস যাহাই আমাকে করিতে হয় না কেন তাহা তোমার সহিতই হইবে। তুমি সঙ্গে থাকিলে বনবাসের সকল দুঃখ সুখে পরিণত হইবে। বনে যাইতে আমার কিছু ভয় নাই। আমাকে সঙ্গে না লইয়া গেলে অদ্যই বিষপানে প্রাণত্যাগ করিব। কারণ তোমার বিরহে আমার মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই হইবে।

উপায়ন্তর না দেখিয়া অসহায়া সীতা এবার রামকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দনরতা প্রায় মূর্ছিতা সীতাকে রাম এখন বনগমনে সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন।

প্রণিধানযোগ্য যে, মাতা কৈকেয়ীর গৃহ হইতে রাম কোন শুভ সংবাদ লইয়া আসিবেন বলিয়া সীতা অপেক্ষা করিতেছেন। এমন সময় রাম সম্পূর্ণ বিপরীত সংবাদ লইয়া নিজগৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি রাজমহিষী হইতে গিয়া বনবাসিনী হইতে যাইতেছেন। তাহা জানিয়াও তিনি কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না বা ভাগ্যের উপর কোনরূপ দোষারোপ করিলেন না। তিনি যেভাবে রামের অভিষেকবার্তা গ্রহণ করিয়াছেন ঠিক সেভাবেই রামের নির্বাসনের সংবাদ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার একমাত্র কাম্য হইল তিনিও বনবাসে রামের অনুগমন করিবেন। অষ্টাদশবর্ষীয়া সীতা তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টি বনবাসে কাটাইতে হইবে বলিয়া বিন্দুমাত্রও ব্যথিতা নন। সাধারণ নারী হইলে সহসা এরূপ বিপর্যয় উপস্থিত হইবার জন্য যাহারা দায়ী তাহাদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন। কিন্তু সীতার স্বভাব অন্যরূপ। তিনি তাঁহার জীবনের এই প্রথম ও অভাবিত দুর্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন অতি শান্তচিত্তে কাহারও প্রতি কোন অভিযোগ পোষণ না করিয়াই। ইহা ধনসম্পদের প্রতি সীতার আসক্তিহীনতাই সূচিত করে। তাঁহার ভোগ্যবস্তুর প্রতি এই বৈরাগ্যবোধ ছিল বলিয়াই হয়তো পরবর্তী জীবনে যে কোন পরিবেশের সহিত মানাইয়া লইতে পারিয়াছেন। কারণ

লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কতিপয় দিন ব্যতীত সীতার জীবনে আর কোনদিনই রাজপ্রসাদের সুখ জোটে নাই। তাঁহার জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাঁহাকে তপস্বিনীর জীবনযাপন করিতে হইয়াছে।

বিদায়ের প্রাক্কালে কৌশল্যা সীতাকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন। রাজসুখ ভোগ করিবার পর ভাগ্যের উপহাসে রাম আজ সন্ন্যাসব্রত ধারণ করিতেছেন। সীতা চরম ঐশ্বর্যভোগ করিবার পর তপস্বিব্রতধারী স্বামীকে শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন কিনা সে সম্বন্ধে কৌশল্যার মনে যথেষ্ট দুর্ভাবনার সঞ্চার হইয়াছিল। সেজন্য তিনি সীতাকে বলিতেছেন—

স ত্বয়া নাবমন্তব্যঃ পুত্রঃ প্রব্রাজিতো বনম্ ।
তব দেবসমস্ত্বেষ নির্ধনঃ সধনোঽপি বা ॥ ২।৩৯।২৫

কিন্তু সীতা শ্বশ্রূমাতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন—

সাহমেবং গতা শ্রেষ্ঠা শ্রুতধর্মপরা বরা ।
আর্যে কিমবমন্যেয়ং স্ত্রীণাং ভর্তা হি দৈবতম্ ॥ ২।৩৯।৩১

সীতার বাক্য শুনিয়া কৌশল্যা আশ্বস্ত হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন তাঁহার পুত্রের প্রতি সীতা কোন বিসদৃশ আচরণ করিবেন না।

গঙ্গা উত্তরণকালে পতির ব্রতপালনের সাফল্য কামনা করিয়া দেবী ত্রিপথগামিনীর নিকট প্রার্থনা জানাইলেন—

সা ত্বাং দেবি নমস্যামি প্রশংসামি চ শোভনে ।
প্রাপ্তরাজ্যে নরব্যাঘ্রে শিবেন পুনরাগতে চ ॥
গবাং শতসহস্রঞ্চ বস্ত্রাণ্যন্নঞ্চ পেশলম্ ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাস্যামি তব প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ২।৫২।৮৭-৮৮

এই শ্লোকগুলিতে ভরতের চিরন্তন গৃহস্থবধূর কল্যাণময়ী মূর্তি আমরা খুঁজিয়া পাই। এখানে যে-সীতাকে পাই যিনি অতি সাধারণ নারীর ন্যায় লাজনম্রশিরে মা গঙ্গার নিকট স্বামীর মঙ্গল ও সৌভাগ্য কামনা করিতেছেন। এই সীতা যে, তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়া নারী এই সত্য আমরা ক্ষণেকের তরে ভুলিয়া যাই।

যমুনা পারাপারের পরও দেখি সীতা বটবৃক্ষের নিকট পতির ব্রতপালনের সাফল্য কামনা করিতেছেন।

অযোধ্যানগরী ত্যাগ করিবার পর আমরা রামকে বিলাপ করিতে দেখিয়াছি। লক্ষ্মণও নিষাদরাজ গুহের নিকট রামের জন্য বিলাপ করিয়াছেন। একমাত্র সীতাকেই আমরা ব্যতিক্রম হিসাবে দেখিতে পাই যিনি বনবাসকে প্রথম হইতেই অতি শান্তচিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন। বনে প্রবেশ করিবার পরও আমরা তাঁহার মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাই না। নূতন পরিবেশ, নূতন বৃক্ষপুষ্প বরং তাঁহার আনন্দের ও কৌতূহলের খোরাকই যোগাইয়াছে। বনের অসুবিধা ও কষ্ট সম্বন্ধে তিনি একবারও কোন অভিযোগ করেন নাই।

বনবাসকালে রাম অত্রিমুনির আশ্রমে গমন করিলে অত্রিমুনি তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্মচারিণী তপস্বিনী অনসূয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ও পতির প্রতি নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে নানা উপদেশ প্রদান করিলেন। উত্তরে সীতা অনসূয়ার নিকট রামচন্দ্রের প্রশংসা করিলেন ও জানাইলেন যে, বিবাহকালে মাতা যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা তিনি এখনও পালন করিতেছেন। সীতার সহিত কথোপকথনে অনসূয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি সীতাকে বহু অলঙ্কার, অঙ্গরাগ ও মহামূল্য অনুলেপন প্রভৃতি প্রদান করিলেন।

এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, সীতা নিজ-স্বভাবগুণে যে কোন লোককে আপন করিয়া নিতে জানিতেন। তপস্বিনী, জরাজীর্ণ দেহবিশিষ্টা ও শুভ্রকেশযুক্তা অনসূয়াকে সীতা স্বভাবমাধুর্যে আপন করিয়া লইয়াছেন।

ইহার পর সীতাসহিত রাম দণ্ডকবনে প্রবেশ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে সীতার জীবনে দুর্যোগ আরম্ভ হইল। এখানে রাক্ষস বিরাধ সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া হরণ করিতে উদ্যত হইল। (এই ঘটনা যেন রাবণকর্তৃক সীতাহরণের ভবিষ্যৎ ইঙ্গিতই বহন করিতেছে)। শরভঙ্গমুনির আশ্রমের ঋষিগণ রামের নিকট রাক্ষসগণ হইতে অভয়প্রার্থনা করিলে রাম রাক্ষস-বধ করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। সীতা শত্রুতা ব্যতিরেকে রামচন্দ্রের রাক্ষসবধের ইচ্ছাকে সমর্থন করিলেন না। তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন—

বুদ্ধিবৈরং বিনা হন্তুং রাক্ষসান্ দণ্ডকাশ্রিতান্।
অপরাধং বিনা হন্তুং লোকো বীর ন মংস্যতে॥ ৩।৯।২৫

সীতা এই প্রসঙ্গে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা তাঁহার ধর্ম ও অধর্ম সম্বন্ধে প্রকৃষ্টজ্ঞানের পরিচয় বহন করে। তাঁহার মত অনুসরণ করিবার জন্য তিনি রামচন্দ্রকে বাধ্য করেন নাই। কেবল তাঁহার কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছেন মাত্র।

তাই তিনি বলিয়াছেন—

বিচার্য বুদ্ধ্যা তু সহানুজেন
যদ্ রোচতে তৎ কুরু মাচিরেণ ॥ ৩।৯।৩৩

রাম সীতাসহ অগস্ত্যমুনির আশ্রমে আসিলে অগস্ত্য সীতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি রামকে উপদেশ দিয়াছেন—

যথৈষা রমতে রাম ইহ সীতা তথা কুরু।
দুষ্করং কৃতবত্যেষা বনে ত্বামভিগচ্ছতী ॥ ৩।১৩।৪

পঞ্চবটী বনে বাসকালে একদিন সীতাহরণ করিতে অভিলাষী রাবণ-কর্তৃক প্রেরিত মারীচ বিবিধরত্নসমন্বিত এক মৃগে পরিণত হয়। সেই বিচিত্র মৃগ সীতাকে প্রলোভিত করিয়া আশ্রমের চারিপার্শ্বে ঘুরিতে থাকিলে সীতা রামকে অনুরোধ করিলেন—

আনয়ৈনং মহাবাহো ক্রীড়ার্থং নো ভবিষ্যতি ॥ ৩।৪৩।১০

সীতা অবশ্য রামের নিকট এরূপ প্রার্থনা করা যে অনুচিত তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন—নারীদিগের এতাদৃশ ভয়ঙ্কর স্বেচ্ছাচারিত্ব অনুচিত—ইহা জ্ঞানিগণের অভিমত। তথাপি এই প্রাণীর দেহসৌন্দর্য আমার বিস্ময় জন্মাইয়াছে।[১]

এদিকে রামের দ্বারা শরাহত মারীচের চীৎকারকে রামের আর্তনাদ মনে করিয়া ব্যাকুলা সীতা রামকে সাহায্য করিবার জন্য লক্ষ্মণকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রামের আদেশ স্মরণ করিয়া লক্ষ্মণ কিছুতেই আশ্রম পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত না হইলে স্বামীর বিপদাশঙ্কায় অত্যন্ত বিচলিতা সীতা লক্ষ্মণকে কঠোর তিরস্কার করিয়া বলিলেন—'লক্ষ্মণ! তোর মত সদা ক্রূরভাব গুপ্তশত্রুর মনে যে কদর্য অভিপ্রায় থাকিবে, ইহা বিচিত্র নহে। তুই অত্যন্ত দুষ্ট স্বভাব। তুই ভরতকর্তৃক নিয়োজিত

১। কামবৃত্তমিদং রৌদ্রং স্ত্রীণামসদৃশং মতম্।
বপুষা ত্বস্য সত্ত্বস্য বিস্ময়ো জনিতো মম ॥ ৩।৪৩।২১

হইয়া কিংবা স্বয়ং আমাকে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় গোপন করিয়া একাকীই বনে রামের অনুগমন করিয়াছিস।

লক্ষ্মণের মত অনুগত বিশ্বস্তচিত্ত দেবরকে এরূপ কঠোর বাক্যপ্রয়োগ করায় সীতা সমালোচিত হইয়াছেন। সীতার তদানীন্তন মানসিক অবস্থা চিন্তা করিলে হয়তো তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

লক্ষ্মণ রামের উদ্দেশ্যে গমন করিবামাত্র সুযোগ বুঝিয়া সন্ন্যাস-ব্রতধারী রাবণ তৃণাবৃত কূপের ন্যায় সীতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া সীতার সৌন্দর্যরাশির প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। সীতা পাদ্যঅর্ঘ দিয়া অতিথির পূজা করিয়া সবিস্তারে স্বপরিচয় প্রদান করিলেন ও রাবণের পরিচয় জানিতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সুযোগ বুঝিয়া রাবণ তাঁহার আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন—হে সীতে! তুমি যদি আমার ভার্যা হও, তবে সমস্ত আভরণে ভূষিতা পঞ্চসহস্র দাসী তোমার সেবা করিবে।[১]

সীতা রাবণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া রাবণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—তুই শৃগাল, আমি সিংহী, আমাকে লাভ করিবার যোগ্যতা তোর নাই, তথাপি আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছিস। সূর্যপ্রভা যেমন কেহ স্পর্শ করিতে পারে না তুইও সেরূপ আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবি না।[২]

তাঁহাকে ভীতা দেখিয়া সুযোগ বুঝিয়া রাবণ তাঁহার কুল, বল, নাম ও কর্ম সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। রাবণ স্পর্ধা করিয়া বলিলেন—

অঙ্গুল্যা ন সমো রামো মম যুদ্ধে স মানুষঃ।
তব ভাগ্যেন সম্প্রাপ্তং ভজস্ব বরবর্ণিনি॥ ৩।৪৮।১৯

আরক্তলোচনা ক্রুদ্ধা সীতা অত্যন্ত কঠোরভাষায় রাবণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—ইন্দ্রমহিষী শচীকে অপহরণ করিয়া জীবিত থাকা যাইতে পারে, কিন্তু আমি রামের ভার্যা, আমাকে অপহরণ করিয়া তুই জীবিত থাকিতে পারিবি না।[৩]

১। পঞ্চ দাস্যঃ সহস্রাণি সর্বাভরণভূষিতাঃ।
সীতে পরিচরিষ্যন্তি ভার্যা ভবসি মে যদি॥ ৩।৪৭।৩১

২। ত্বং পুনর্জম্বুকঃ সিংহীং মামিচ্ছসি দুর্লভাম্।
নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা॥ ৩।৪৭।৩৭

৩। অপহৃত্য শচীং ভার্যাং শক্যমিন্দ্রস্য জীবিতুম্।
নহি রামস্য ভার্যাং মামানীয় স্বস্তিমান্ ভবেৎ॥ ৩।৪৮।২৩

সীতার বাক্যশ্রবণে রক্তনয়ন রাবণ বিশালকায় স্বীয়রূপ ধারণ করিয়া সীতাকে তাঁহার ভজনা করিতে বলিয়া হস্তদ্বারা গ্রহণ করিলেন। সীতা জনস্থানের পুষ্পিতবৃক্ষসমূহকে, মৃগবিহঙ্গ প্রভৃতিকে, বৃক্ষদেবতাগণকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন—তাহারা যেন রামকে জানায় রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছেন। করুণবিলাপরতা ও রাবণক্রোড়স্থিতা সীতা হঠাৎ গৃধ্ররাজ জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন ও রাবণের হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। হঠাৎ জাগরিত হইয়া জটায়ু রাবণকে আক্রমণ করিলে রাবণ জটায়ুকে আহত করিলেন।

মৃতপ্রায় জটায়ুকে রাখিয়া রাবণ আকাশপথে সীতাকে নিয়া চলিলে সীতা পর্বতশৃঙ্গে অবস্থিত পাঁচটি বানর দেখিতে পাইলেন। তাহাদের দেখিয়া সীতা তাঁহার উত্তরীয়, কৌশেয় বস্ত্র ও অলঙ্কারসমূহ নিক্ষেপ করিলেন, যাহাতে রাম উহাদের নিকট হইতে সীতার সংবাদ জানিতে পারেন। এদিকে রাবণ সীতাকে লইয়া লঙ্কাপুরীতে স্থাপন করিলেন।

এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, সীতার নিকট উপস্থিত হইয়াই রাবণ সীতার রূপের প্রশংসা করিতেছিলেন। সীতা কেন বুঝিলেন না রাবণের আগমন অসদুদ্দেশ্যেই হইয়াছিল। রাবণকে আতিথ্য প্রদর্শন করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। হয়তো রামের জন্য সীতার মন এত উদ্বিগ্ন ছিল যে, সীতা রাবণের বেশ দেখিয়াই তাঁহাকে আতিথ্যপ্রদান করিয়াছেন, রাবণ কি বলিতেছেন তাহা সেরূপ লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু যে মুহূর্তে রাবণ তাঁহার আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া দিলেন তখনই সীতা স্বীয়রূপ ধারণ করিলেন। নিজের অসহায়ত্ব জানিয়াও সীতা রাবণকে ভর্ৎসনা করিতে ছাড়েন নাই, রাবণকে বাধাপ্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন প্রাণপন। অপহৃতা হইবার পর সীতার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও কৌশল আমাদের বিস্ময় জন্মায়। রামকে নিজের অপহরণবার্তা জানাইবার জন্য তিনি কোন প্রচেষ্টাই বাদ দেন নাই। তিনি রোদন করিয়া জনস্থানের সকল পশুপক্ষীকে তাঁহার অপহরণবার্তা জানাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি যদি চীৎকার করিয়া জটায়ুকে না জাগরিত করিতেন অথবা পর্বতস্থিত পাঁচটি বানরকে তাঁহার অলঙ্কার-

সমূহ ও উত্তরীয় প্রভৃতি নিক্ষেপ না করিতেন, তবে রামের পক্ষে সীতার সন্ধান লাভ কখনই সম্ভবপর হইত না। রামের পক্ষে সীতা উদ্ধারের কল্পনা করাও অসম্ভব হইত। কারণ সীতা কোথায় আছেন তাহা তিনি জানিতেও পারিতেন না। সীতা চরম বিপদে ধৈর্যহারা না হইয়া তাঁহার পক্ষে যাহা কিছু করা সম্ভব তাহাই করিয়াছেন। ভয়ে আত্মহারা হইয়া বুদ্ধিভ্রষ্টা হন নাই।

সীতা যে পাঁচটি বানরকে দেখিয়াছিলেন তাঁহারা হইতেছেন কিষ্কিন্ধাপতি সুগ্রীব ও হনুমান্‌সহ তাঁহার অন্যান্য মন্ত্রিগণ। রাম সীতা উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হনুমান্ নিযুক্ত হইলেন সীতা অন্বেষণের নিমিত্ত। বহু অন্বেষণের পর হনুমান্ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া লঙ্কাপুরীতে আসিয়া অশোকবনে উপবাসকৃশা, সনিঃশ্বাসা, পীতবস্ত্রধারিণী, মলিনবেশা, দুঃখসন্তপ্তা, এক-বেণীধারিণী অগ্নিশিখার ন্যায় এক রমণী দেখিয়া তাঁহাকে সীতা বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিলেন। সেই অনলঙ্কৃতা স্নানাদিসংস্কারবিহীনা সীতাকে দর্শন করিয়া হনুমান্ মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, সীতাদেবী শ্রীযুক্ত রামলক্ষ্মণের পরাক্রম জানেন বলিয়াই বর্ষাকালের গঙ্গার ন্যায় অত্যন্ত ক্ষোভিতা হন নাই। সূর্যাস্তের পর বিকটাকৃতি রাক্ষসীপরিবৃতা সীতাকে দেখিয়া হনুমান্ বৃক্ষশাখায় লুকাইয়া রহিলেন। রজনীর অবসানে সুন্দরী রমণীগণ পরিবৃত হইয়া সীতার দর্শনকামনায় রাবণ আগমন করিলেন। কদলী পত্রের ন্যায় কম্পিতা সীতার নিকট রাবণের প্রার্থনা—হে বিশালাক্ষি। আমি তোমাকে কামনা করি, তুমি আমাকে তোমার অভিপ্রেত বলিয়া গ্রহণ কর। আমি ত্রিভুবন মন্থন করিয়া যে সকল রত্ন লাভ করিয়াছি, সে সবকিছুই, এমন কি স্বর্ণলঙ্কাও তোমার অধিগত হইবে। আমার অন্তঃপুরে সর্বগুণান্বিত রমণীরত্ন আছে, তাহাদের সকলের উপর তুমি আধিপত্য কর। সীতা রাবণের সেই ঘৃণ্য প্রস্তাব শুনিয়া মাঝখানে তৃণ রাখিয়া ও রামের ধ্যান করিয়া রাক্ষসকে বলিলেন—'আমা হইতে তোমার মনকে নিবর্তিত কর। স্বজনে তোমার চিত্ত প্রীতিলাভ করুক। আমি মহাকুলজাতা ও একপত্নী। নিজ ভার্যার ন্যায় অন্যের ভার্যাকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। যে পরদারাতে আসক্ত হয় তাহার দ্রুত অমঙ্গল হয়। লঙ্কা রক্ষার ইচ্ছা থাকিলে তোমার পুরুষশ্রেষ্ঠ রামের সহিত মিত্রতাস্থাপন করাই উচিত। ইহার বিপরীত কার্য করিলে তুমি

বিপদে পতিত হইবে। রামলক্ষ্মণ তোমাকে শীঘ্রই বধ করিবেন। কুবেরের বাসস্থানে গেলেও তুমি রক্ষা পাইবে না।' সীতার বাক্য শুনিয়া রাবণ ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে আর মাত্র দুইমাস সময় দিলেন। দুইমাস অতিক্রম হইলেই পাচকদ্বারা সীতাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রাতরাশের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া জানাইলেন। কারণ রাবণ সীতাকে দ্বাদশ মাস সময় দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে দশ মাস অতিক্রান্ত হইয়াছে। সীতা যাহাতে রাবণের বশবর্তিনী হন সেজন্য রাবণ একাক্ষী, লম্বকর্ণা, বিগতকর্ণা, হস্তিপদা, পদবিহীনা প্রভৃতি বিকটাকৃতি রাক্ষসীদের আদেশ দিলেন, তাহারা যেন যে-কোন উপায়ে সীতাকে রাবণের অনুবর্তিনী হইতে সাহায্য করে। রাক্ষসীগণ সীতাকে নানাভাবে ভয়প্রদর্শন করিতে থাকিলে তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাম তাঁহাকে এখনও উদ্ধার করিতে আসিতেছেন না দেখিয়া তিনি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তখন ত্রিজটা নামক রাক্ষসী রাক্ষসগণের অমঙ্গলজনক ও রামের অভ্যুদয়জনক স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া অন্যান্য রাক্ষসীগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সীতাকে সান্ত্বনা দিল। সীতা ত্রিজটাকে বলিলেন যে, তাহার স্বপ্ন সত্য হইলে তিনি ভবিষ্যতে তাহাকে রক্ষা করিবেন।

রাবণকর্তৃক অপহৃতা স্বর্ণলঙ্কাস্থিতা সীতা যেন বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি। যে সুবর্ণপুরীর চতুর্দিকে এত সম্পদ্, এত সমারোহ তাহার মধ্যে উপবাসকৃশা, পীতবস্ত্রধারিণী নারী যেন সমস্ত সম্পদ্‌রাশিকে ব্যঙ্গ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। যদিও সীতা দুঃখসন্তপ্তা ও সনিঃশ্বাসা তবুও তিনি আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণা। তিনি যেন নিশ্চিতরূপে জানেন রামলক্ষ্মণ তাঁহাকে উদ্ধার করিবেনই। অথচ রামলক্ষ্মণ সীতার অপহরণকারীর পরিচয়ই জানেন না। সীতার আত্মবিশ্বাসের উৎস কোথায় তাহা আমরা ভাবিয়া বিস্মিত হই। লঙ্কাধিপতি রাবণ অতি দীনভাবে আসিয়া সীতার নিকট করুণা ভিক্ষা করিতেছেন। সীতা তাঁহাকে নানা উপদেশ দিয়া ধর্মপথে চলিতে অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ব্যর্থ হওয়ামাত্র স্বামীর পরাক্রমের অহঙ্কারে গর্বিতা সীতা দর্পভরে বলিয়াছেন যে, রাবণ রামকর্তৃক অচিরেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু রাবণ যখন আর দুইমাসমাত্র অপেক্ষা

করিয়া প্রাতরাশের সঙ্গে সীতাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিবেন বলিয়াছেন, তখন আবার সেই সীতাই শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছেন।

এদিকে হনুমান্ এতক্ষণ ধরিয়া শিশংপাবৃক্ষে বসিয়া সকলকিছু নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার সমস্যা হইল, কিভাবে সীতার নিকট নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করিবেন। তিনি অনেক চিন্তা করিয়া শিশংপাবৃক্ষে অবস্থান করিয়াই রামসীতার বনাগমনের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। অনন্তর সীতা ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া হনুমানকে দেখিয়া ইহাকে কামরূপধারী রাবণ বলিয়াই মনে করিলেন। তখন হনুমান্ রামলক্ষ্মণের যথাযথ রূপ বর্ণনা করিয়া ও রামের অঙ্গুরীয়ক দেখাইয়া সীতার বিশ্বাস উৎপাদন করিলেন। সীতা রাম সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞাতব্য জানিয়া রামকে সেখানে লইয়া আসিবার জন্য হনুমান্‌কে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু হনুমান্ সীতাকে লইয়াই রামের নিকট উপস্থিত হইতে চাহিলেন। হনুমানের পৃষ্ঠে চড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া সীতা তাহাতে স্বীকৃতা হইলেন না। কারণ তিনি স্বেচ্ছায় পরপুরুষ স্পর্শ করিতে চাহেন না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সীতা শত্রুপুরী হইতে পলায়ন করিবার এই পরম সুযোগ অবহেলায় ছাড়িয়া দিলেন কেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে—প্রথমতঃ সীতা মহাবীর্যশালী রামের পত্নী। তিনি তেজস্বিনী ও ক্ষত্রিয়া, স্বামীর বীর্যবত্তার প্রতি তাঁহার গভীর আস্থা। রাবণ তস্করের ন্যায় সীতাকে হরণ করায় রাম তাঁহার বাহুবল প্রদর্শনের সুযোগ পান নাই। সেজন্য সীতা চাহেন রাম যেন স্বীয় বিক্রম দেখাইয়াই রাবণের হস্ত হইতে সীতাকে উদ্ধার করেন। যদি সীতা হনুমানের সহিত গোপনে রামের নিকট চলিয়া যান তবে রাবণ রামের বিক্রম সম্বন্ধে জানিতে পারিবেন না। তাহাতে এই চরম অপমানের প্রতিশোধও লওয়া হইবে না। আর উদ্ধার পাইবার জন্য সীতা রাবণের মত ঘৃণ্যপথ অনুসরণ করিতে চাহেন না। তিনি সর্বসমক্ষে বিজয়িনীর মত লঙ্কা হইতে প্রত্যাগমন করিতে চাহেন। দ্বিতীয়তঃ—সীতার পলায়নকালে যদি হনুমানের গাত্রসংস্পর্শ ঘটিত তাহা হইলে কি এমন ক্ষতি হইত? কারণ বিপদকালে মানুষকে অনেক

অসঙ্গত আচরণ করিতে হয়। আত্মরক্ষার্থে নিয়মভঙ্গ দোষাবহ নহে। তবুও সীতা কেন হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে স্বীকৃতা হইলেন না। উত্তরে বলা যাইতে পারে—নারীরূপে সীতা অনন্যা। সাধারণ নারীর কার্যকলাপের মানদণ্ডে সীতার বিচার কখনও করা যাইতে পারে না। সেজন্য চরম বিপদেও তিনি আদর্শ হইতে বিচ্যুতা হন নাই। আর তাহা ছাড়া হনুমানের পৃষ্ঠে চড়িয়া বিশাল সমুদ্র পার হইতে তিনি ভরসাও পান নাই। কারণ হনুমান্ লম্ফ দিয়াই সমুদ্র পারাপার করিবেন। সীতা হয়তো সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে পারেন। তাহাতে সীতার উদ্ধার ত হইবেই না। রামের অযশও থাকিয়া যাইবে। কারণ হনুমান্ ত রামেরই দূত।

রাবণবধের পর সীতার মনোগত অভিপ্রায় জানিবার জন্য রাম হনুমান্‌কে পুনরায় সীতার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। রাম বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ কেবলমাত্র সীতার প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে। সীতা যেন এখন সকল দুঃখ ভুলিয়া যান। কারণ রাবণ নিহত, লঙ্কাপুরীও রামের বশীভূত। সীতার দর্শন অভিলাষে রাক্ষসরাজ বিভীষণ শীঘ্রই আগমন করিবেন। আনন্দে সীতার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

সীতা রামকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক জানিয়া সীতাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত রাম বিভীষণকে প্রেরণ করিলেন। সীতা অসংস্কৃতা ও অনলঙ্কৃতা থাকিয়াই রামের দর্শন প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিভীষণ জানাইলেন যে, সীতা যেন অলঙ্কৃতা ও সংস্কৃতা হইয়াই রামের নিকট উপস্থিত হন। কারণ ইহাই রামের আদেশ। শিবিকায় আরোহণ করিয়া সীতা রামের নিকট আগমন করিতেছেন। বিভীষণ রামকে সীতার আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিলেন। সীতাদর্শনের জন্য রাক্ষস, বানর ও ভল্লুক প্রভৃতির মধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। বেত্রধারী পুরুষগণ তাহাদিগকে উৎসারিত করিতে লাগিল। ইহাতে রাম মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—ইহারা তাঁহার স্বজন। সুতরাং ইহাদের কষ্ট দেওয়া কোন-মতেই উচিত নয়। সীতা যেন পদব্রজেই রামের নিকট আগমন করেন। উৎফুল্লা সীতা রামের নিকট আসিয়া স্বামীর সুন্দর মুখ দর্শন করিতে থাকিলে রাম জানাইলেন যে, তিনি সীতাকে উদ্ধার করিয়াছেন তাঁহার বংশগৌরবরক্ষা ও পৌরুষত্ব প্রদর্শনের জন্য। সীতাকে পুনরায়

লাভ করিবার তাঁহার নাকি বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল না। (যদিও যুদ্ধ চলাকালীন পর্যন্ত রামকে অন্যরূপ বলিতেই শোনা যায়।) সীতা এখন শত্রুঘ্ন কিংবা বিভীষণের নিকট থাকিতে পারেন। আর দশদিক্ ত পড়িয়াই আছে, যেদিকে ইচ্ছা সেইদিকেই তিনি যাইতে পারেন। কারণ রাবণ নিশ্চয়ই সীতার মনোহর রূপ দেখিবার পর তাঁহাকে অব্যাহতি দেন নাই।

রামের সেই অভূতপূর্ব বাক্য শুনিয়া সীতা অত্যন্ত ব্যথিতা ও লজ্জিতা হইলেন। তিনি বাষ্পবারিপূর্ণ নয়নে রামের নিকট জানিতে চাহিলেন—হে বীর। প্রাকৃত ব্যক্তি যেরূপ প্রাকৃতা নারীকে কঠোর, অনুচিত ও রুক্ষ কর্ণকটু বাক্য বলিয়া থাকে সেরূপ বাক্য আপনি আমাকে শুনাইতেছেন কেন?[১]

রাবণের সহিত তাঁহার যে গাত্রসংস্পর্শ ঘটিয়াছে সেখানে দৈবই অপরাধী। কারণ তাহা সীতার ইচ্ছাকৃত নহে। আর তাহা ছাড়া—আমার অধীন যে-হৃদয় তাহা ত আপনারই অনুবর্তন করিতেছে। আমি সাধারণ নারী, আমার গাত্র পরাধীন, সেজন্যই রাবণের সহিত আমার গাত্র-সংস্পর্শ ঘটিয়াছে।[২]

অতি বাল্যকালেই রাম সীতার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। বিবাহের পর বহুবর্ষ ধরিয়া দেখিয়াও কি রাম সীতার চরিত্র ও স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞাত নহেন? এভাবে অন্যায় অপবাদ লইয়া সীতা বাঁচিতে চাহেন না। তিনি সৌমিত্রিকে অনল প্রস্তুত করিতে বলিলেন। সীতা যদি শুদ্ধা হন তবে অনলদেবই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। রামের মনোভাব জানিয়া লক্ষ্মণ অগ্নি প্রস্তুত করিলে সীতা তাহাতে প্রবেশ করিলেন। ইত্যবসরে অগ্নিদেব তপ্তকাঞ্চন-ভূষণা সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া রামকে প্রদান করিলেন ও বলিলেন—'সীতার মধ্যে বিন্দুমাত্র পাপ নাই। সীতা বাক্য, মন, বুদ্ধি, এমনকি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারাও কখনও তোমাকে অতিক্রম করেন নাই।' রাম তখন বলিলেন, তিনি সীতাকে পবিত্রা জানিয়াও পরীক্ষা করিয়াছেন কারণ রাবণগৃহে বাসকারিণী সীতা সম্বন্ধে লোকে নানা কথা বলিত।

১। কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্।
রুক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব॥ ৬।১১৬।৫

২। মদধীনন্তু যৎ তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ত্ততে।
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরী॥ ৬।১১৬।৯

এবার রাম অযোধ্যায় ফিরিবার জন্য উন্মুখ। অযোধ্যায় ফিরিবার কালে রাম পুষ্পকবিমান হইতে সীতাকে বিবিধস্থান দেখাইতে থাকেন। কিষ্কিন্ধায় পৌঁছিলে সীতা সপত্নীক বানরদের লইয়া অযোধ্যায় যাইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। সীতার ইচ্ছানুসারে সস্ত্রীক বানরগণও মহোৎসাহে রাম সীতার সহিত পুষ্পকবিমানে আরোহণ অযোধ্যায় গমন করিলেন।

দীর্ঘ এক বৎসর দুঃসহ কষ্ট সহিবার পর স্বামীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সীতার চিত্ত উদ্বেলিত। হনুমানের মাধ্যমে রাম জানিতে চাহিয়াছেন সীতার মনোগত অভিপ্রায়। স্বামি-সন্দর্শনের জন্য লজ্জাবনতা সীতা উপস্থিত। সহসা বিনামেঘে বজ্রপাতের ন্যায় রামচন্দ্রের কি নিদারুণ আদেশ। দশদিক্ পড়িয়া আছে, সীতা যে দিকে খুশী যাইতে পারেন। যাঁহার জন্য রাম এত কাণ্ড করিলেন, এত রক্তক্ষয় হইল, সেই সীতাকে রামের আর প্রয়োজন নাই। পতিব্রতা স্ত্রীর প্রতি রাম-চন্দ্রের মত মহৎব্যক্তির এরূপ আচরণের উদাহরণ আর বোধ করি কোথাও দেখা যাইবে না। এই অপমানে সীতা জ্বলিয়া উঠিয়াছেন সত্য তবুও অমর্যাদাজনক আচরণ কিছুই করেন নাই। স্বামীর প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে তিনি দেবরকে অনুরোধ করিয়াছেন চিতা প্রস্তুত করিতে। রামচন্দ্রকৃত অপমানের উত্তর তিনি সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া। আবার রাম যখন তাঁহাতে গ্রহণ করিয়াছেন তখন তিনি স্বামীকে ক্ষমা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া সীতাকে আনন্দদান করিতে সচেষ্ট হইলেন। গর্ভবতী সীতার মনোগত অভিলাষ জানিতে ইচ্ছুক রাম বৈদেহীকে প্রশ্ন করিলেন যে, তিনি সীতার কোন্ মনোরথ পূর্ণ করিবেন? সীতা যেন নিয়তির প্ররোচনায় তপোবনদর্শনের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন।

এদিকে কথাপ্রসঙ্গে রাম বয়স্য ভদ্রের নিকট জানিতে পারিলেন রাবণ-গৃহবাসিনী সীতাকে লইয়া প্রজাদের মধ্যে নানারূপ কথা উঠিয়াছে। রাম সীতার তপোবনদর্শনের অভিলাষ পূর্ণ করিবার ছলে চিরকালের জন্য লক্ষ্মণকে দিয়া সীতাকে প্রেরণ করিলেন বাল্মীকির আশ্রমে। লক্ষ্মণ

আসিয়া সীতাকে তপোবনে লইয়া যাইবার জন্য রামের আদেশের কথা জানাইলেন। রামচন্দ্রের ছলনার বিষয়ে অজ্ঞা সীতাও মুনিপত্নীদের জন্য বিবিধ রত্ন ও মহামূল্য বসন লইয়া আনন্দিত মনে লক্ষ্মণের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। কিন্তু সীতার আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইতে বেশীক্ষণ লাগিল না। তিনি নানাবিধ অশুভ দর্শন করিলেন।

আমাদের বিস্ময় বোধ হয় সীতা সর্বদা রামচন্দ্রের আদেশ নিয়া সকলকার্য করিতেন। অথচ অভিলাষসিদ্ধির আনন্দে তপোবনে যাইবার পূর্বে তিনি রামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন না। তিনি যদি যাইবার পূর্বে রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন তবে বোধ হয় দ্বিতীয় বার তাঁহাকে পরিত্যাগের জন্য রাম কোন কারণপ্রদর্শন করিতে পারিতেন না।

এদিকে লক্ষ্মণ জাহ্নবী পার হইবার সময়ই শোকবিহ্বল হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণের ব্যবহারে সীতা খুব বিস্ময়বোধ করিলেন। গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া বাল্মীকিমুনির আশ্রমের নিকট আসিয়া লক্ষ্মণ তপোবনে আসিবার আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। সীতা মুহূর্তমধ্যে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞা লাভ করিয়া দীনবাক্যে লক্ষ্মণকে বলিলেন—লক্ষ্মণ! দুঃখভোগের জন্যই বিধাতা আমার দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ অদ্য আবার দুঃখরাশি মূর্তিমান্ হইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত।[১]

রামকর্তৃক পরিত্যক্ত হইবার পর সীতা কিন্তু রামের এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করিলেন না। নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধেই তিনি দোষারোপ করিয়াছেন। সীতা যেন সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। সীতার চরিত্র সমালোচনার অধিকার যেন প্রত্যেকের আছে। সীতা কিন্তু কাহারও কোন অপরাধের প্রতি কখনও তর্জনী নির্দেশ করেন নাই। রামের সন্তান যদি সীতার গর্ভে না থাকিত তবে জাহ্নবীর জলে প্রাণবিসর্জন দিয়া সীতা এই অপমান হইতে মুক্তিলাভ করিতেন। তিনি দেবরের মাধ্যমে স্বামী রাম নয়, নৃপতি

১। মামিকেয়ং তনুর্নূনং সৃষ্টা দুঃখায় লক্ষ্মণ।
ধাত্রা যস্যাস্তথা মেঽদ্য দুঃখমূর্তিঃ প্রদৃশ্যতে ॥ ৭।৪৮।৩

রামকে প্রণাম জানাইয়াছেন। কিন্তু একবারও সেই নৃপতিকে অভিযোগ জানান নাই বিনা দোষে কেন তিনি তাঁহার পরিণীতা স্ত্রীকে ত্যাগ করিলেন ?

লক্ষ্মণ সীতাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। দুঃখিনী সীতার রোদন ব্যতীত আর কিছু করিবার ছিল না। তাঁহার রোদনধ্বনি শুনিয়া মুনিবালকেরা বার্তা প্রেরণ করিলে বাল্মীকি নিষ্পাপা সীতাকে লইয়া আশ্রমে আনিয়া মুনিপত্নীদের নিকট অর্পণ করিলেন। যথাসময়ে সীতার লব ও কুশ নামে দুটি যমজসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। তাহাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন স্বয়ং বাল্মীকিমুনি।

দ্বাদশ বর্ষ পরে অশ্বমেধযজ্ঞে বাল্মীকিমুনি আমন্ত্রিত হইয়াছেন। বাল্মীকি লবকুশকে রামায়ণ গান শিখাইয়াছিলেন, তিনি রাজসভায় সেই গান গাহিতে আদেশ দিলেন। রামায়ণ গান হইতে রাম জানিতে পারিলেন লব-কুশ তাঁহারই পুত্র। রাম বাল্মীকিমুনির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন ও বলিয়া পাঠাইলেন যে জানকীর চরিত্র যদি শুদ্ধ ও পাপহীন হয় তবে তাহার প্রমাণ যেন তিনি রাজসভায় আসিয়া দেন। সীতা সর্বসমক্ষে তাঁহার চারিত্রিক বিশুদ্ধির প্রমাণ দিবে শুনিয়া রাজসভায় মুনি, ঋষি, রাক্ষস ও বানর প্রভৃতির বিশাল সমাগম হইল। বাল্মীকিমুনি সভায় আসিয়া সীতার চরিত্রের পবিত্রতার শপথ করিলেন। তাহাতে রামচন্দ্রের সন্তুষ্টি হইল না। তিনি সীতাকে স্বয়ং বিশুদ্ধির প্রমাণ দিতে হইবে বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তখন কাষায়বস্ত্রধারিণী সীতা নতমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন—

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ৭।৯৭।১৪

সীতা এভাবে বারংবার শপথবাক্য উচ্চারণ করিতে থাকিলে ধরণীদেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া স্বীয়কন্যাকে নিজ ক্রোড়ে আশ্রয় দিলেন।

সীতাকে রাম লোকোপবাদের ভয়ে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছেন। আবার দ্বাদশবৎসর তপোবনবাসের পর তিনিই সীতাকে রাজসভায় আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার চারিত্রিক বিশুদ্ধির প্রমাণ বাল্মীকিমুনি বারংবার দিলেও রাম তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। তিনি লঙ্কায় সীতার অগ্নিপ্রবেশের ন্যায় পুনরায় কোন একটা অলৌকিক

ব্যাপার হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে তিনি আবার সীতাকে সসম্মানে গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি সীতা অনেক সহ্য করিয়াছেন। তাই তিনি এবার তাঁহার জননীর ক্রোড়েই তাঁহার শেষ আশ্রয় কামনা করিয়াছেন। যেখানে তিনি গেলেন সেখানে ত আর কোন অভিযোগের ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি পৌঁছাইবে না, পবিত্রা হইয়াও পবিত্রতার প্রমাণ দিতে হইবে না।

মন্দোদরী

রামায়ণের প্রতিনায়ক রাবণ। বলিতে গেলে তাঁহারই জন্য রাম-কাহিনীর সম্প্রসারণ। রাবণবধই রামের অসাধারণ কীর্তি। ত্রিলোকজয়ী ত্রিভুবনের ত্রাসসঞ্চারকারী রাবণের প্রাধানা মহিষী হইতেছেন মন্দোদরী। মন্দোদরীর পিতৃবংশও কোনক্রমে অনুল্লেখ্য নহে। বাল্মীকিমুনি রামায়ণের অন্যান্য বিশিষ্ট নারীচরিত্র সীতা, তারা, কৌশল্যা ও কৈকেয়ী অপেক্ষা মন্দোদরীর জন্য স্বল্প স্থানই রাখিয়াছেন। তথাপি এই স্বল্পাবকাশেই চরিত্রটি স্বাতন্ত্র্যবোধে, মর্যাদাবোধে, ধর্মপরায়ণতায়, নীতিবুদ্ধিতে ও বিচার-বুদ্ধিতে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

নারীত্বের সকল গুণই মন্দোদরীর ছিল। দৈহিক সৌন্দর্যেও তিনি কিছুমাত্র কম ছিলেন না।[১] তথাপি অতিলোভী কামপরায়ণ স্বামীকে তিনি বাঁধিয়া রাখিতে পারেন নাই। যিনি সারাজীবন ধরিয়া পাপাচার করিয়াছেন, বহু নারীর চক্ষে অশ্রুবন্যা বহাইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে মন্দোদরীর চরিত্রমাধুর্য সম্যক্ উপলব্ধির অবকাশ ছিল না। সাধ্বী মন্দোদরী স্বামীর অন্যায়কার্য সমর্থন করিতেন না। বিপথগামী স্বামীকে ধর্মপথে আনয়ন করিবার জন্য বহু চেষ্টাও করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সফল হন নাই। সীতাহরণ যে রাবণের বিনাশ সূচনা করিতেছে তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। কারণ রাম যে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার তাহা রামের কার্যকলাপ হইতেই তিনি বুঝিয়াছিলেন। সেজন্য পতিপ্রাণা সীতাকে হরণ করিয়া পাপমতি রাবণের নিস্তার নাই বুঝিয়া পতিকে নানাভাবে

১। (ক) কশ্মলাভিহতা সন্না বভৌ রাবণোরসি। ৬।১১১।৮৭

(খ) সন্ধ্যানুরক্তে জলদে দীপ্তা বিদ্যুদিবোজ্জ্বলা ॥ ৬।১১১।৮৮

বুঝাইয়াছেন। স্বামীর অধিকাংশ কার্য সমর্থন না করিলেও তিনি একান্তভাবে পতিপরায়ণা ছিলেন। স্বামীর অন্যায়কার্য সমর্থন না করিলেও পতির প্রতি কখনও বিদ্বেষ পোষণ করেন নাই। সাধ্বী স্ত্রীরূপে তিনি রাবণকে সর্বদা সৎপরামর্শ দিয়াছেন। ধর্মশীলা মন্দোদরীর নিকট ধর্ম-পরায়ণ দেবর বিভীষণ খুবই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। একাধিকবার তিনি দেবরের ধর্মপরায়ণতার সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন। রাবণ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণের অভিপ্রায়কে ভুল বুঝিয়াছেন। কিন্তু মন্দোদরী দেবরের কথার সারবত্তা বুঝিয়াছিলেন ও স্বামীও তাহাই অনুসরণ করুন ইহাই মনে মনে চাহিয়াছিলেন। স্পষ্টতই তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরীর বিলাপের মধ্যেই আমরা তাঁহার যাহা কিছু পরিচয় পাই, মহাকবি অন্যত্র কোন মন্তব্য করেন নাই। প্রতি-নায়কের প্রধানা মহিষী হিসাবে তাঁহার চরিত্র মহাকবির আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা বোধ হয় উচিত ছিল। আমরা রাবণমহিষী মন্দোদরীর প্রথম উল্লেখ পাই সুন্দরকাণ্ডে দশম সর্গে যেখানে কপিবর হনুমান্ সীতা অন্বেষণে ব্যাপৃত। তিনি রাবণের শয্যাপার্শ্বে এক অপরূপলাবণ্যসম্পন্না নারী দেখিয়া তাঁহাকে সীতা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন।

হনুমানের পক্ষে রাবণের অন্তঃপুরে অসংখ্য নারীর মধ্যে মন্দোদরীকে সীতা বলিয়া কল্পনা করায় মন্দোদরী যে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। মন্দোদরী স্বয়ং নিজেকে রূপবতী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তথাপি রাবণ যে শূর্পণখার নিকট সীতার রূপের বর্ণনা শুনিয়া সীতাকে যে অধিকতর রমণীয়া মনে করিয়া হরণ করিয়াছেন তাহা যেন তাঁহার ও মন্দোদরীর নিয়তির লীলাকেই সূচিত করে।

উত্তরকাণ্ডে আমরা মন্দোদরীর জন্মপরিচয় জানিতে পাই। মন্দোদরী দানবরাজ ময়ের কন্যা। তাঁহার মাতা হেমা ছিলেন স্বর্গের অপ্সরা। তাঁহার দুই ভ্রাতার নাম ছিল মায়াবী ও দুন্দুভি। মৃগয়াকালে রাবণ বনে ময়ের সাক্ষাৎলাভ করেন। ময়ের ইচ্ছানুসারে অগ্নিসাক্ষী করিয়া রাবণ মন্দোদরীর পাণিগ্রহণ করেন। ময় রাবণকে এক অমোঘ শক্তি দান করিয়াছিলেন। যাহা রাবণ পরে লক্ষ্মণের প্রতি প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে মৃতপ্রায় করিয়াছিলেন। এই মন্দোদরী ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদের মাতা।

যুদ্ধে নিহত স্বামীকে দেখিয়া মন্দোদরী অতি করুণ বিলাপ করিতে করিতে প্রশ্ন রাখিয়াছেন—ক্রুদ্ধ রাবণকে দেখিয়া দেবরাজ পুরন্দর, মহর্ষি ও গন্ধর্বগণও ভীত হইতেন, সেই রাবণ অদ্য সামান্য মানব রামের হস্তে

পরাজিত হইয়া ভূশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন কেন? কামরূপধারী রাবণ মনুষ্য-গণের অগম্য লঙ্কাপুরীতে বিচরণ করিতেন, সেই রাবণ অতি সামান্য বনচারী রামকর্তৃক নিহত হইয়াছেন, ইহা অবিশ্বাস্য। বোধহয় স্বয়ং যমই রামরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছেন। অথবা রাম সম্ভবতঃ সামান্য মনুষ্যমাত্র নহেন। তিনি নিশ্চয়ই—

অনাদিমধ্যনিধনো মহতঃ পরমো মহান্।
তমসঃ পরমো ধাতা শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥
শ্রীবৎসবক্ষা নিত্যশ্রীরজয্যঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ।
মানুষং রূপমাস্থায় বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ॥ ৬।১১১।১২-১৩

এই শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বিষ্ণু মনুষ্যগণের হিতকামনায় দেবশত্রু রাক্ষস-রাজকে নিহত করিয়াছেন। খরদূষণবধ ও হনুমানের লঙ্কা আগমনের পর মন্দোদরী বুঝিয়াছিলেন রাম সামান্য মানুষ নহেন। তখনই মন্দোদরী রাবণকে রামের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে বারংবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কথায় রাবণ বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেন নাই। অরুন্ধতী সদৃশ সীতার তপস্যাগ্নিতে রাবণ দগ্ধ হন নাই তাহার কারণ অগ্নি প্রভৃতি দেবগণও রাবণকে ভয় করিয়া চলেন। আর পাপের ফল ত যথাকালে প্রাপ্ত হইতেই হয়। সৎকর্মকারী বিভীষণ সুখী হইলেন ও পাপকারী রাবণ দুঃখে পতিত হইলেন।

রূপ, কুল অথবা দাক্ষিণ্যে মন্দোদরী অপেক্ষা সীতা কোন অংশে শ্রেষ্ঠা নহেন তাহা রাবণ মোহবশতঃ বুঝিতে পারেন নাই। পূর্বে মন্দোদরী বিচিত্র ভূষণে নিজেকে সজ্জিতা করিয়া কৈলাস, মন্দর, মরু, চৈত্ররথ প্রভৃতি স্থানে বিমানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এখন সেই একই মন্দোদরী হইয়াও তিনি সেই সকল ভোগ হইতে বঞ্চিতা হইলেন। দানবরাজ পিতা, রাক্ষসরাজ স্বামী, সুরেন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদ পুত্র বলিয়া তিনি পূর্বে গর্ব করিতেন। এখন তিনি অনাথায় ন্যায় অনন্ত বৎসর ধরিয়া শোক করিবেন। পূর্বে রাবণ পতিব্রতা, ধর্মরতা, গুরু শুশ্রূষণে রতা বহু নারীকে শোকাভিভত করিয়াছেন। তাহাদের অভিশাপে রাবণের আজ এই দশা।

ত্রিভুবনজয়ী রাবণ মায়ামৃগের সহায়তায় রামকে ও মায়াবাক্যের সাহায্যে লক্ষ্মণকে সরাইয়া যে নারীচৌর্যরূপ ক্ষুদ্রকার্য সম্পন্ন করিলেন তাহাতেই তাঁহার কাতরতার প্রকাশ, উহাই তাঁহার বিনাশের পূর্বলক্ষণ।

সত্যবাক্ মহাবাহু বিভীষণ সেইকার্য শুনিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, রাক্ষসগণের বিনাশ সমুপস্থিত।

মারীচ প্রভৃতি হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্‌গণের, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের ও মন্দোদরীর পিতার যুক্তিসম্মত বাক্য না শুনিবার ফলেই রাবণ আজ এরূপ ফললাভ করিলেন।

অদ্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ সুমালীর দৌহিত্রী মন্দোদরীর সহিত কেন বাক্যালাপ করিতেছেন না? এরূপ নানা বিলাপ করিতে করিতে মন্দোদরী রাবণের বক্ষে পতিত হইলেন ও রাবণের বক্ষঃস্থলে সন্ধ্যানুরক্ত জলদে দীপ্তা বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সপত্নীগণ মন্দোদরীকে সান্ত্বনা দিতে গেলে তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রামের আদেশানুসারে বিভীষণ রাবণের স্ত্রীগণকে সান্ত্বনা দিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া মন্দোদরীসহ রাবণের পত্নীগণকে নগরীমধ্যে প্রেরণ করিলেন।

মন্দোদরীর বিলাপের মধ্য দিয়া একটা কথা আমাদের নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, মন্দোদরী রাবণের বীর্যবত্তা ও শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকিলেও সে-শক্তি যে বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ রামের শক্তির তুলনায় অতি তুচ্ছ তাহা তিনি অতি ভালোরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। রাম ও সীতার শুভশক্তির নিকট রাবণের অশুভ-শক্তির পরাজয় যে অনিবার্য তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। তিনি স্বামীর নারীহরণ প্রভৃতি কার্য সমর্থন করিতেন না এবং পতিকে সুপথে আনিতে বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাতে ব্যর্থ হইয়াছেন। কিন্তু স্বামীর বিরাগ উৎপাদন করিবার মত কোন কার্য করেন নাই। কারণ সুন্দরকাণ্ডে দেখিতে পাই রাবণ অশোকবনে যখন সকল পত্নীগণের সহিত সীতার সম্মতি লাভের জন্য গিয়াছিলেন তখন মন্দোদরীও তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। রাবণ যেরূপ কাপুরুষের ন্যায় সীতাকে হরণ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার যে-দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। কারণ ত্রিলোকজয়ী রাবণের সামান্য মনুষ্য হইতে এত ভীতি তাঁহার বিনাশের পূর্ব লক্ষণই সূচিত করে। মন্দোদরী স্বামীর এই অবধারিত

পরিণাম সম্বন্ধে যেন পূর্ব হইতেই অবহিত ছিলেন। তিনি অনাথা হইয়া স্বামীর জন্য শোক করিয়াছেন সত্য তথাপি রাবণের মত পাপীর পক্ষে এরূপ শাস্তি সঙ্গত তাহা অনুধাবন করিয়াছিলেন।

আমরা সীতার দুঃখে শোকপ্রকাশ করি। তথাপি মনে হয় মন্দোদরীও সীতা অপেক্ষা কম দুঃখিনী ছিলেন না। কারণ সীতার তবু সান্ত্বনা ছিল রাম কখনও অন্যায় কার্য করেন নাই ও করিবেনও না। কিন্তু রাবণ আমৃত্যু একটার পর একটা অন্যায় কার্য করিয়া গিয়াছেন। মন্দোদরীর মত ধর্মশীলা ও সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে এতাদৃশ পতির সঙ্গে সহযোগিতা করা কম দুঃখজনক ছিল না। বাঁচিয়া থাকিতে স্বামীর কার্যকলাপ তাঁহাকে অসুখী করিত। আবার স্বামী ও পুত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিল না, তিনি একেবারেই অনাথা সাধারণ নারীতে পর্যাসিত হইলেন। স্বর্ণলঙ্কার অধিপতি, ত্রিভুবনজয়ী রাবণের প্রধানা মহিষী সহস্র সহস্র রাক্ষস-রমণীর মধ্যে কোথায় অদৃশ্যা হইয়া গেলেন কেহ তাঁহার কোনও সন্ধান রাখিল না।

চতুর্থ অধ্যায়

রামায়ণের কয়েকটি বহু-বিতর্কিত প্রসঙ্গ

আদর্শ চরিত্ররূপে রামসীতা ভারতবাসীর অন্তরলোকে চিরস্থায়ী আসন করিয়া লইয়াছেন। তৎসত্ত্বেও রামসীতার চরিত্রে আধুনিক দৃষ্টিতে সমালোচনাযোগ্য এরূপ কতকগুলি দোষ রহিয়াছে তাহা সমর্থন করিতে সাধারণ চিন্তাশীল ব্যক্তিও দ্বিধাগ্রস্ত। এখন এই দোষগুলি রামসীতার চরিত্রমহিমাকে আদৌ ক্ষুণ্ণ করে কিনা বা এই দোষাবলীকে দোষ বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায় কিনা তাহা এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। ইহার সঙ্গে সর্বজন-সমালোচিত কৈকেয়ীচরিত্রের দোষ পরিহারের চেষ্টা করা গেল। রামজননীরূপে কৈকেয়ীচরিত্রের দোষাবলীর পরিহার সর্ব প্রথমেই করাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

কৈকেয়ীচরিত্রের তথাকথিত দোষাবলী

কৈকেয়ীচরিত্রের দোষাবলী সর্বজনবিদিত। কৈকেয়ীর কার্যাবলীর নিন্দায় তাঁহার প্রিয়পুত্র ও স্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজাবৃন্দ সকলেই মুখর। কৈকেয়ী চরিত্রের যে-দোষসমূহের নিন্দায় সর্বজন সোচ্চার তাহার জন্য কৈকেয়ী সর্বতোভাবে দায়ী কিনা বিচার করা যাইতে পারে। পূর্বে কৈকেয়ীর চরিত্রবিশ্লেষণে তাঁহার চরিত্রের দোষ ও গুণসমূহ আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার নিন্দিত কার্যাবলীর জন্য তিনি কতটা দায়ী ও সত্যসত্যই তিনি সর্বজনের ধিক্কারের যোগ্যা কিনা তাহাই এই অধ্যায়ে আলোচ্য।

মহাকাব্যের অপরাপর চরিত্রগুলির কৈকেয়ীর সম্বন্ধে কি ধরণের অভিযোগ ছিল তাহা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

কৈকেয়ী সম্বন্ধে মহারাজ দশরথের অভিযোগ তুলিয়া ধরা হইল। দশরথ বলিয়াছেন—

কৈকয়ামব্রবীৎ ক্রুদ্ধো নির্দহন্নিব তেজসা।
নৃশংসে দুষ্টচারিত্রে কুলস্যাস্য বিনাশিনি ॥ ২।১২।৭
তস্যৈবং ত্বমনর্থায় কিং নিমিত্তমিহোদ্যতা।
ত্বং ময়াত্মবিনাশায় ভবনং স্বং নিবেশিতা ॥

অবিজ্ঞানান্নৃপসুতা ব্যালা তীক্ষ্ণবিষা যথা ।
জীবলোকো যদা সর্বো রামস্যাহ গুণস্তবম্ ।। ২।১২।৯-১০
চিরং খলু ময়া পাপে ত্বং পাপেনাভিরক্ষিতা ।
অজ্ঞানাদুপসম্পন্না রজ্জুরুদ্বন্ধনী যথা ।। ২।১২।৮০
ক্ষুরোপমাং নিত্যমসৎ প্রিয়ংবদাং প্রদুষ্টভাবাং স্বকুলোপঘাতিনীম্ ।
ন জীবিতুং ত্বাং বিষহেঽমনোরমাং দিধক্ষমাণাং হৃদয়ংসবন্ধনম্ ।।
২।১২।১১০

ন চৈতন্মে প্রিয়ং পুত্র শপে সত্যেন রাঘব ।
ছন্নয়া চলিতস্ত্বস্মি স্ত্রিয়া ভস্মাগ্নিকল্পয়া ।।
বঞ্চনা যা তু লব্ধা যে তাং ত্বং নিস্তর্তুমিচ্ছসি ।
অনয়া বৃত্তগাদিন্যা কৈকয্যাভিপ্রচোদিতঃ ।। ২।৩৪।৩৬-৩৭

কৈকেয়ী সম্বন্ধে রাজা দশরথ যে-সকল বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণযোগ্য । নৃশংসা, দুষ্টচরিত্রা, কুলনাশিনী, তীক্ষ্ণবিষা সর্পিণী, ক্ষুরসমা, ভস্মাগ্নিকল্পা প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিতে দশরথ দ্বিধাবোধ করেন নাই । কৈকেয়ী নাকি দশরথের ও নিজের বিনাশের নিমিত্তই দশরথের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন । কৈকেয়ী সম্বন্ধে প্রযুক্ত এই বিশেষণগুলি প্রযোজ্য কিনা তাহা বিবেচ্য ।

দশরথের পুত্রেষ্টিযজ্ঞের কথা দিয়াই আরম্ভ করিতে পারা যায় । দশরথ বহুকাল ধরিয়া নিঃসন্তান । তাঁহার সাড়ে তিনশত মহিষী । তাঁহাদের মধ্যে প্রধানা হইতেছেন কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা । পুত্রহীন রাজা জানিতে পারিলেন যে, ঋষ্যশৃঙ্গমুনি তাঁহার পুত্রলাভের উপায় নির্দেশ করিতে পারিবেন । অশ্বমেধ যাগদ্বারা দশরথ নিষ্পাপ হইলে ঋষ্যশৃঙ্গ পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিতে আদেশ দিলেন । যজ্ঞাগ্নি হইতে একজন তেজস্বী দিব্যালঙ্কারভূষিত পুরুষ আবির্ভূত হইয়া প্রজাপতি প্রেরিত পায়স দশরথকে প্রদান করিয়া অনুরূপ ভার্যাগণকে দিতে বলিলেন । তাহাতে অচিরেই তাঁহার পুত্রলাভ হইবে । আনন্দিত দশরথ পায়স লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ও প্রধানা তিন মহিষীর মধ্যে পায়স ভাগ করিয়া দিলেন । তিনি কিন্তু সমভাবে পায়স ভাগ[১] করিলেন না । জ্যেষ্ঠা মহিষী কৌশল্যাকে

১ । এই পায়স বিভাগ সম্বন্ধে নানা মতভেদ দেখা যায় । কাহারও কাহারও মতে কৌশল্যা অর্ধাংশ ও কৈকেয়ী অর্ধাংশ পাইয়াছেন । পরে তাঁহারা নিজ নিজ অংশ হইতে এক-চতুর্থাংশ সুমিত্রাকে দিয়াছেন ।

প্রদান করিলেন সম্পূর্ণ পায়েসের অর্ধাংশ। অপর অবশিষ্ট অর্ধাংশের অর্ধভাগ দান করিলেন সুমিত্রাকে। অবশিষ্ট অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ পায়স যাহা রহিল তাহা আবার অর্ধভাগ করিয়া দান করিলেন কৈকেয়ীকে। পুনরায় চিন্তা করিয়া তিনি অবশিষ্ট পায়স সুমিত্রাকে দান করিলেন।

> কৌসল্যায়ৈ নরপতিঃ পায়সার্ধং দদৌ তদা।
> অর্ধাদর্ধং দদৌ চাপি সুমিত্রায়ৈ নরাধিপঃ ॥
> কৈকয্যৈ চাবশিষ্টার্ধং দদৌ পুত্রার্থকারণাৎ।
> প্রদদৌ চাবশিষ্টার্ধং পায়সস্যামৃতোপমম্ ॥
> অনুচিন্ত্য সুমিত্রায়ৈ পুনরেব মহামতিঃ।
> এবং তাসাং দদৌ রাজা ভার্যাণাং পায়সং পৃথক্ ॥ ১।১৬।২৭-২৯

আমরা জানি কৈকেয়ী দশরথের প্রিয়তমা মহিষী। কৈকেয়ীর গৃহে দশরথ অধিককাল অতিবাহিত করিতেন, তাহা কৈকেয়ীপুত্র ভরতের মুখেও শুনিয়াছি। এই আনুকূল্য প্রদর্শন কি নিতান্তই বাহ্য? দশরথ যখন পায়স বণ্টন করিলেন তখন তিনি তিন মহিষীকেই সমভাবে ভাগ করিয়া দিতে পারিতেন। আর ইহার মধ্যে যদি আনুকূল্য প্রদর্শনের প্রশ্ন আসে তবে কৈকেয়ীরই অধিক পরিমাণ পায়স পাইবার কথা। কিন্তু দশরথ, কৌশল্যা ও সুমিত্রাকেই বেশী পায়স প্রদান করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা কম পাইয়াছেন কৈকেয়ী। অপর দুইজন প্রধানা মহিষী অধিক পরিমাণ পায়স পাইয়াছেন বলিয়া কৈকেয়ী বিন্দুমাত্র ঈর্ষা প্রকাশ করেন নাই। তিনি পতির পায়স বিভাগ সানন্দেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কৈকেয়ী যদি কুটিলচরিত্রা নারীই হইতেন তাহা হইলে স্বামীকে অপর দুই মহিষীর প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিতে দেখিয়া ঈর্ষান্বিতাই হইতেন।

তাহা ছাড়া কৈকেয়ী বরদ্বয় প্রার্থনার পর দশরথকর্তৃক বরদুটি ফিরাইয়া লইয়া অন্য বরদ্বয় কামনা করিতে কৈকেয়ীকে অনুনয় বিনয় করিয়াছেন, তখন তাঁহার বাক্যাবলীতে কৈকেয়ীচরিত্রের যে প্রকাশ দেখিতে পাই তাহাতে কৈকেয়ীর মহানুভবতাই অনুভব করিতে হয়। দশরথ বলিয়াছেন, কৈকেয়ী পূর্বে কখনও অপ্রিয় বা অযুক্ত কোন কার্য করেন নাই। সপত্নী কৌশল্যার পুত্র রামকে তিনি নিজপুত্রতুল্যই দেখিতেন। কৈকেয়ীর নিকট ধার্মিক রাম ছিল জ্যেষ্ঠপুত্রসদৃশ। নৃশংসা, কুলনাশিনী, দুষ্টচরিত্রা নারী কখন সপত্নীপুত্রকে স্বপুত্রতুল্য স্নেহ করিতে পারেন না। আর ধার্মিকশ্রেষ্ঠ দশরথ স্ত্রীর ব্যবহারে পূর্বে কোন অন্যায় দেখিতে পান

নাই। রামের বননিবাসনের সময় ভরতের বয়স ছিল ২৪ বৎসর। তাঁহার বহু পূর্বেই দশরথের সহিত কৈকেয়ীর বিবাহ হইয়াছিল। এই দীর্ঘ দিন ধরিয়া কৈকেয়ীর চরিত্রে দশরথ কিন্তু কুলনাশিনীর কোন চিহ্ন দেখিতে পান নাই।

কৈকেয়ী যে অত্যন্ত উদার-স্বভাবা নারী ছিলেন তাহার সর্বপ্রধান প্রমাণ পাওয়া যায় মন্থরার সহিত কথোপকথনপ্রসঙ্গে। রামের অভিষেক-বার্তা শ্রবণমাত্র তিনি আনন্দিতা হইয়া মন্থরাকে আভরণ প্রদান করিয়াছিলেন। সংবাদটি প্রদানের সময় দশরথ সম্বন্ধে মন্থরা যে-কটূক্তি করিয়াছে তাহাদ্বারা কৈকেয়ী কিন্তু বিন্দুমাত্র প্রভাবিতা হন নাই। বরঞ্চ বলিয়াছেন, তিনি রাম ও ভরতের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না। রামের অভিষেকের মত প্রীতিজনক সংবাদ তাঁহার কাছে আর কিছুই নাই। রাজার এই সিদ্ধান্তকে কৈকেয়ী স্বাগত জানাইয়াছেন। আবার মন্থরা যখন বলিতে লাগিল যে, রাম রাজা হইয়া ভরতের ক্ষতিসাধন করিবে তখন মহানুভবা কৈকেয়ী বলিয়াছিলেন, রামের রাজ্যপ্রাপ্তির অর্থ ভরতেরও রাজ্যপ্রাপ্তি। কারণ রাম স্বভ্রাতৃগণকে নিজদেহতুল্যই মনে করেন। মনের এরূপ প্রসারতা আমরা দশরথ বা কৌশল্যা কাহারও চরিত্রে দেখিতে পাই না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কৈকেয়ীকে উত্তেজিত করিতে মন্থরা সফল হইয়াছে। কারণ সে কৈকেয়ীকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছে যে, রামের রাজ্যাভিষেককালে দশরথ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই ভরতকে দূরে রাখিয়াছেন। আর জ্যেষ্ঠা মহিষী কৌশল্যা রাজমাতা হইলে কৈকেয়ীর ললাটে অনেক দুঃখ আছে। এস্থানে আমরা বলিতে বাধ্য, কৈকেয়ীকে মন্থরার এই ধরণের বিদ্বেষপ্রসূত বাক্য বিশ্বাস করাইবার জন্য দায়ী যেরূপ দশরথ বা মন্থরা, কৈকেয়ী সেরূপ নহেন। কারণ আমরা দেখিয়াছি ভ্রাতৃগণের সহিত নিজের বিবাহোৎসব সমাপ্ত হইবার অব্যবহিত পরে মাতুল যুধাজিৎ-এর সহিত ভরত মাতুলালয় গমন করিয়াছেন। বিবাহকালে ভরতের বয়স ছিল মাত্র বার বৎসর। ইহার পর দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দশরথ কিন্তু প্রিয়তমা মহিষীর একমাত্র পুত্রের দর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষা একবারও প্রকাশ করেন নাই। এই সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরে কি অযোধ্যার রাজভবনে কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় নাই যাহাতে ভরত যোগদান করিতে পারেন? উদার-স্বভাবা কৈকেয়ী কিন্তু এতদিন পর্যন্ত পুত্রের প্রতি এরূপ উদাসীনতা প্রদর্শন করিলেও দশরথকে কিছু বলেন নাই। স্বামীকে তিনি এতদূর বিশ্বাস করিতেন যে দশরথ ইচ্ছা করিয়া ভরতকে প্রবাসে

রাখিতে চাহেন একথা কৈকেয়ীর মনে একবারও উদিত হয় নাই। কিন্তু মন্থরা যখন অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া দেখাইল তখন আর কৈকেয়ীর বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না। আর মন্থরার কথা যে অসত্য নয় তাহা আমরা দশরথের কথা হইতেই জানিতে পারি। অভিষেকের পূর্বে রামকে ডাকিয়া দশরথ বলিয়াছিলেন যে—

বিপ্রোষিতশ্চ ভরতো যাবদেব পুরাদিতঃ।
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তে কালো মতো মম॥
কামং খলু সতাং বৃত্তে ভ্রাতা তে ভরতঃ স্থিতঃ।
জ্যেষ্ঠানুবর্তো ধর্মাত্মা সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
কিন্তু চিত্তং মনুষ্যাণামনিত্যমিতি মে মতম্।
সতঞ্চ ধর্মানিত্যানাং কৃতশোভি চ রাঘব॥ ২।৪।২৫-২৭

ভরত বিদেশে থাকাকালীনই তোমার অভিষেক সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। যদিও তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠানুবর্তী, ধর্মাত্মা, দয়ালু, জিতেন্দ্রিয়। তথাপি মানুষের চিত্তে বিকার আসিতে বেশী সময় লাগে না। হে রাঘব! সর্বদা ধার্মিক ব্যক্তিগণের চিত্ত রাগদ্বেষাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে।

দশরথের এই উক্তি স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই দশরথ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে প্রবাসে রাখিয়াছেন। আর অযোধ্যার সিংহাসন যে ভরতেরই প্রাপ্য তাহা প্রমাণ করে দশরথের আরও একটি কার্য। রঘুবংশের নিয়মানুযায়ী জ্যেষ্ঠপুত্রই সিংহাসনের অধিকারী। তদনুসারে দশরথের পর স্বাভাবিকভাবে রাম অযোধ্যার সিংহাসন লাভ করিবেন। সুতরাং রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা প্রজাগণের অনুমতি-সাপেক্ষ ছিল না। কিন্তু দশরথ অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছেন। তিনি সকল নগরবাসী, গ্রামবাসী ও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতিগণকে ও শ্রেষ্ঠ নাগরিকগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহাদের নিকট রামের অনেক সুখ্যাতি করিয়া তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সর্বাপেক্ষা অভাবনীয় ব্যাপার যে, এই আনন্দোৎসবে তাঁহারই দুই আত্মজ ভরত ও শত্রুঘ্ন অনুপস্থিত। আর তিনি সংবাদ প্রেরণ করিলেন না মিথিলাপতি জনক ও কৈকেয়ীর পিতা অশ্বপতিকে। অথচ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতিগণকে আমন্ত্রণ করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। দশরথ এখানে সাধারণ সামাজিকতাবোধ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছেন। জনক ও অশ্বপতিকে

না জানাইবার কারণ আরও গভীরে। কারণ চিত্রকূটে আমরা রামের মুখে ভরতকে বলিতে শুনি—

পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্ ।
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্ রাজ্যশুল্কমনুত্তমম্ ॥ ২।১০৭।৩

ভ্রাতঃ! পূর্বে আমাদের পিতৃদেব যখন তোমার জননীকে বিবাহ করেন, তখন তোমার মাতামহের নিকট তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কন্যার গর্ভে যে সন্তান হইবে তাহাকেই রাজ্যদান করিবেন।

মনে হয় বৃদ্ধ দশরথ অশ্বপতির তরুণী কন্যাটিকে বিবাহ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন অশ্বপতি স্বীয় কন্যার পুত্র অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিবে এই সর্তেই কৈকেয়ীকে দশরথের নিকট সমপ্রদান করেন। দশরথের মনে নিশ্চয়ই সেই প্রতিজ্ঞার কথা সদা জাগরূক ছিল। সেজন্যই তিনি কৈকেয়ীপুত্রকে দীর্ঘকাল প্রবাসে ত রাখিয়াছেনই, আর রামের রাজ্যাভিষেক ভরতের অনুপস্থিতিতেই সম্পন্ন করিতে চহিয়াছেন। আর অশ্বপতি ও জনককে সংবাদ না দেওয়ার কারণও ইহাই। অশ্বপতি ও জনক দুইজনই ব্রহ্মবিদ্ ও ধার্মিক। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে হয়তো অশ্বপতি দশরথের বিবাহকালের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিতেও পারিতেন। ধার্মিক জনক যে তাহা সমর্থন করিতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দশরথের ভুল কিন্তু এখানেই। দশরথ স্বয়ং ভরতকে রাম অপেক্ষা ধার্মিক জানিয়াও তাঁহাকে রামের রাজ্যাভিষেককালে অযোধ্যায় আনয়ন করিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু অযোধ্যায় ভরতের উপস্থিতি পরিস্থিতিকে অন্যরূপ করিত। ভরতের মত উদারহৃদয়সম্পন্ন রাজপুত্র কখনও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিক্রম করিয়া সিংহাসনে বসিতে চাহিতেছেন না, দশরথ তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করিলেও না। আর মন্থরা কৈকেয়ীকে এতাদৃশ প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া বুঝাইতে সমর্থ হইত না। কারণ মন্থরা তিনবারের চেষ্টায় কৈকেয়ীকে উত্তেজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কৈকেয়ী রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া কৌশল্যা অপেক্ষা কম আনন্দিতা হন নাই। তবে প্রশ্ন ওঠে, কৈকেয়ী স্বামী দশরথ, সারথি সুমন্ত্র, পুরোহিত বসিষ্ঠ, প্রবীণ সিদ্ধার্থ ও সর্বোপরি রামের সহিত যে-ব্যবহার করিয়াছেন তাহা কিভাবে সমর্থন করা যায়? তাহার উত্তর আমরা স্থানান্তরে দিতেছি। বর্তমানে কৈকেয়ীর প্রতি কৌশল্যার অভিযোগগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা

যাউক। কৌশল্যা রামের বননির্বাসনের সংবাদ জানিবার পর রামকে বলিয়াছিলেন—

> অত্যন্তং নিগৃহীতাস্মি ভর্তুর্নিত্যমসম্মতা।
> পরিবারেণ কৈকয্যাঃ সমা বাপ্যথবাবরা॥
> যো হি মাং সেবতে কশ্চিদপি বাপ্যনুবর্ততে।
> কৈকয্যাঃ পুত্রমন্বীক্ষ্য স জনো নাভিভাষতে। ২।২০।৪২-৪৩

পতির আনুকূল্য না পাইয়া আমি অতিশয় নিগ্রহ ভোগ করিয়াছি। আমি কৈকেয়ীর পরিচারিকাতুল্য কিংবা তদপেক্ষাও হীন হইয়া রহিয়াছি। যে আমার সেবা করে অথবা অনুবর্তন করে সে কৈকেয়ীপুত্রকে দেখিলে আমার সহিত কথা বলে না। কৈকেয়ী সর্বদা ক্রুদ্ধ হইয়া কর্কশবাক্য বলে। আমি এই দুরবস্থায় পড়িয়া কিভাবে তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিব। তোমার উপনয়নের পর সপ্তদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইল। আমি নিজ দুঃখের অবসান কামনা করিয়া এতদিন অতিবাহিত করিয়াছি।

কৌশল্যার প্রথম অভিযোগ—তিনি স্বামীকর্তৃক অনাদৃতা। দ্বিতীয় অভিযোগ—কৈকেয়ী তাঁহাকে দাসী অথবা দাসী হইতে অধিক নিগৃহীত করিয়া থাকেন। যে-কেহ কৌশল্যার সেবা করে বা অনুবর্তন করে সে কৈকেয়ীর পুত্রকে দেখিলে কৌশল্যার সহিত কথা বলে না। নিত্যক্রুদ্ধা ও কর্কশবাদিনী কৈকেয়ীর বদন হতভাগিনী কৌশল্যা কিভাবে অবলোকন করিবেন?

কৌশল্যার প্রথম অভিযোগের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, স্বামীর অনাদরের জন্য কৈকেয়ী বিন্দুমাত্র দায়ী নহেন। দশরথ যদি তরুণী ভার্যা কৈকেয়ীর প্রতি বেশী আনুকূল্য প্রদর্শন করেন তাহা হইলে কৈকেয়ীর নিশ্চয়ই কিছুই করণীয় নাই। দ্বিতীয় অভিযোগ, কৈকেয়ী কৌশল্যাকে দাসী অপেক্ষা অধিক অনাদর করিয়া থাকেন। আমরা দেখিয়াছি, দশরথ বলিয়াছেন যে, রাম স্বীয় জননী অপেক্ষা কৈকেয়ীকেই অধিক শুশ্রূষা ও সেবা করিয়া থাকেন। কৈকেয়ীর আদেশ পালন করিতে রামের খুবই আগ্রহ। তাহা ছাড়া রাম অন্যত্র এই কনিষ্ঠা জননী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, কৈকেয়ী নানাগুণসম্পন্না ও সৌভাগ্যশালিনী ইত্যাদি। রামের কথা হইতে বোঝা যায় কৈকেয়ীর চরিত্রে যথেষ্ট গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। কৈকেয়ী যদি কৌশল্যার প্রতি এত অত্যাচারই করিয়া থাকেন তাহা হইলে ধার্মিক পুত্র রাম স্বীয় জননীর প্রতি অন্যায়কারিণী বিমাতার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ

করিতে পারিতেন কি ? কৈকেয়ী রামের সহিত স্বীয় পুত্রের ন্যায়ই ব্যবহার করিতেন। কৌশল্যার প্রতি কৈকেয়ীর যদি তীব্র বিদ্বেষই থাকিত তাহা হইলে কৌশল্যার পুত্র রামকে কৈকেয়ী এতাদৃশ স্নেহ করিতে পারিতেন না। আর কখনও বলিতে পারিতেন না রামের রাজ্যপ্রাপ্তিতে ভরতেরও রাজ্যপ্রাপ্তি হইল।

কৌশল্যার আর একটি অভিযোগ, যে-ব্যক্তি কৌশল্যার সেবা করে বা অনুগমন করে সেও কৈকেয়ীর পুত্রকে দেখিবামাত্র বিচলিত হইয়া কৌশল্যার সহিত কোন কথা বলিতে সাহস করে না। কৈকেয়ীপুত্র ভরতের প্রতি কৌশল্যার এই অভিযোগ অতিশয়োক্তি ব্যতীত কিছুই নহে। কারণ ভরত বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসর অযোধ্যায় ছিলেন না। তিনি দ্বাদশ বৎসর বয়সেই মাতুলালয়ে গমন করিয়াছিলেন। দশরথের মৃত্যুর পূর্বে আর অযোধ্যায় আসেন নাই। দ্বাদশ বৎসরের ভরত ত শিশুমাত্র। সেই শিশুকে দেখিয়া কৌশল্যার অনুবর্ত্তিজনেরা ভয়ে কৌশল্যার সহিত বাক্যালাপ করিবে না ইহা কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ ভরত যদি মন্দবুদ্ধি হইতেন তাহা হইলে না হয় কথা ছিল। কারণ তাহা হইলে জননীর নিকট কৌশল্যার অনুবর্ত্তিজনদের বিরুদ্ধে বলিতে পারিতেন। কিন্তু রাম, দশরথ প্রভৃতির সকলের উক্তি হইতে জানা যায় যে, ভরত অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন। দশরথ ত রাম অপেক্ষা ভরতকেই বেশী ধার্মিক মনে করিতেন। তাহা ছাড়া স্বজননীকে ভরত অন্যান্য জননী অপেক্ষা বেশী শ্রদ্ধা করিতেন তাহাও আমরা কোথাও পাই না। বরঞ্চ দ্বাদশ বৎসর পর অযোধ্যা হইতে প্রেরিত দূতগণের নিকট কৌশল্যা ও সুমিত্রার প্রশংসা করিয়া নিজজননী সম্বন্ধেই নানা নিন্দাজনক বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। কৈকেয়ীর পুত্রের প্রতি কৌশল্যার অভিযোগগুলি সপত্নী বিদ্বেষের প্রকাশমাত্র। কৈকেয়ী সর্বদা ক্রুদ্ধ হইয়া কথা বলেন ও সর্বদা কর্কশবাক্য বলেন এই অভিযোগও কৌশল্যা করিয়াছেন। মনে হয় দশরথের অত্যধিক আদরে গর্বিতা কৈকেয়ী জ্যেষ্ঠা সপত্নীর সহিত যথাযোগ্য সম্মান দিয়া কথা বলিতেন না। এই ব্যাপারে দশরথ কখনও এই তরুণী পত্নীকে কিছুই বলেন নাই। আর কৈকেশী অযোধ্যার রাজভবনে প্রবেশ করিবার পূর্বে কৌশল্যাই ছিলেন সর্বময়ী কর্ত্রী ও সকলের সম্মানের পাত্র। কিন্তু দশরথ কৈকেয়ীকে বিবাহ করিবার পর হইতেই কৌশল্যাকে অবহেলা করিতে লাগিলেন। সুতরাং নিজের প্রাপ্য সম্মান হারাইয়া কৌশল্যার কৈকেয়ীর

প্রতি বিদ্বেষ জন্মিবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং কৈকেয়ীর সকল কথাই কৌশল্যার নিকট বিষতুল্য মনে হইত। এখানে কৈকেয়ী অপেক্ষা দশরথই অপেক্ষাকৃত বেশী দায়ী। কারণ তিনি কৈকেয়ীকে কৌশল্যার সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে আদেশ দিলে তাহা না করিবার মত নীচতা কৈকেয়ীর চরিত্রে ছিল না।

কৌশল্যা বলিয়াছেন যে, তিনি বহু বৎসর ধরিয়া অপেক্ষা করিয়াছেন কবে রাম রাজা হইবেন। তাহা হইলে পতিকর্তৃক অবহেলিতা কৌশল্যা অন্ততঃ রাজমাতা হইবার সুখ-লাভ পারিবেন। এখানে প্রশ্ন জাগে, দশরথ যে রাজ্যশুল্ক রাখিয়া কৈকেয়ীকে বিবাহ করিয়াছেন তাহা কি কৌশল্যা জানিতেন না? রাম যখন ব্যাপারটা জানেন তখন তাহা কৌশল্যার অজ্ঞাত থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না। রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন ইহা কৌশল্যার পক্ষে সঙ্গত আশা হইলেও কৈকেয়ীকে বিবাহকালে দশরথের প্রতিজ্ঞার কথা কৌশল্যার মনে রাখা উচিত ছিল। তাহা হইলে তিনি এতাদৃশ দুঃখ পাইতেন না।

এবার বনবাসের প্রথম রাত্রিতে রাম লক্ষ্মণের নিকট কৈকেয়ীর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ করিয়াছেন তাহা আলোচ্য।

রাম বলিয়াছেন—

> সা হি দেবী মহারাজং কৈকয়ী রাজ্যকারণাৎ।
> অপি চ্যাবয়েৎ প্রাণান্ দৃষ্ট্বা ভরতমাগতম্ ॥ ২।৫৩।৭
> মন্যে দশরথান্তায় মম প্রব্রাজনায় চ।
> কৈকেয়ী সৌম্যসংপ্রাপ্তা রাজ্যায় ভরতস্য চ ॥
> অপীদানীং ত কৈকয়ী সৌভাগ্যমদমোহিতা।
> কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ সা প্রবাধেত মৎকৃতে ॥ ২।৫৩।১৪-১৫

কৈকেয়ীর বিরুদ্ধে রামের এই প্রথম অভিযোগ। তিনি দ্বিতীয়বার অভিযোগ করিয়াছেন সীতাহরণের অব্যবহিত পরে।

কৈকেয়ীর বিরুদ্ধে রামের অভিযোগ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে, ভরতকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়া কৈকেয়ী রাজ্যহেতু মহারাজের প্রাণ নষ্ট করিতে পারেন। দশরথের মৃত্যুর জন্য, রামের বনবাসের জন্য ও ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য কৈকেয়ী অযোধ্যার রাজভবনে প্রবেশ করিয়াছেন। সৌভাগ্য-মদমত্তা কৈকেয়ী নিশ্চয়ই এখন রামের জন্য সুমিত্রা ও কৌশল্যাকে কষ্ট দিতেছেন। রাম

কি প্রকার মানসিক অবস্থায় পড়িয়া কৈকেয়ীর প্রতি এই অভিযোগগুলি করিয়াছেন তাহা দেখা যাইতে পারে। রাজপুত্র রাম রাজভবনের বিলাসিতা ও প্রাচুর্য পরিহার করিয়া জটাচীর ধারণ করিয়া বনে গমন করিয়াছেন। প্রথমে অযোধ্যাবাসিগণ তাঁহার অনুগমন করিলেও শেষপর্যন্ত তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন পিতৃকুলের অতি প্রাচীন ও বিশ্বস্ত সারথি সুমন্ত্র। সেই সুমন্ত্রও শেষপর্যন্ত বিদায় লইলেন। অপরিচিত ভয়ঙ্কর বনে প্রথম রাত্রিবাস। চরম বিপদে পড়িয়া তিনি পিতা ও বিমাতার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করিয়াছেন। প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে হারাইবার পরও তিনি বিমাতার বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযোগ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ছাড়া রাম সদাসর্বদা কনিষ্ঠা মাতার প্রশংসাই করিয়াছেন। বনবাসকালেও লক্ষ্মণ একবার কৈকেয়ীর নিন্দা করিলে তিনি লক্ষ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধই হইয়াছিলেন। সুতরাং কৈকেয়ীর প্রতি রামের এই বিদ্বেষ রামের মানসিক বিপর্যয়ের তাৎক্ষণিক প্রকাশমাত্র।

এবার কৈকেয়ীপুত্র ভরতের স্বীয় জননী সম্বন্ধে কি অভিমত তাহা আলোচ্য।

অযোধ্যার দূতগণকে দেখিয়া অন্যান্য জননীদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া ভরত স্বজননীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

> আত্মকামা সদা চণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী।
> অরোগা চাপি মে মাতা কৈকেয়ী কিমুবাচ হ ॥ ২।৭০।১০

ভরদ্বাজের নিকট জননীদের পরিচয় প্রসঙ্গে কৈকেয়ী সম্বন্ধে ভরতের উক্তি—

> যস্যাঃ কৃতে নরব্যাঘ্রৌ জীবনাশমিতো গতৌ।
> রাজা পুত্রবিহীনশ্চ স্বর্গং দশরথো গতঃ ॥
> ক্রোধনামকৃতপ্রজ্ঞাং দৃপ্তাং সুভগমানিনীম্।
> ঐশ্বর্যকামাং কৈকয়ীমনার্যামার্যরূপিণীম্ ॥
> মমৈতাং মাতরং বিদ্ধি নৃশংসাং পাপনিশ্চয়াম্।
> যতো মূলং হি পশ্যামি ব্যসনং মহদাত্মনঃ ॥ ২।৯২।২৫-২৭

দ্বাদশ বৎসর বয়সে ভরত মাতুলালয়ে গিয়াছেন, কিন্তু জননী সম্বন্ধে তিনি খুব ভাল ধারণা লইয়া যান নাই। ভরতের নিকট তাঁহার মাতা স্বার্থপরায়ণা, সদা ক্রুদ্ধা ও প্রাজ্ঞমানিনী। আবার অযোধ্যায় দ্বাদশ বৎসর পরে ফিরিয়া জননীর অত্যন্ত নিন্দাজনক ব্যবহার ও কার্যাবলী দেখিয়া

ভরত ক্রোধে অন্ধ হইয়াছেন। সুতরাং ভরদ্বাজের নিকট জননীর পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ক্রোধপরায়ণা, গর্বিতা, সৌভাগ্যগর্বিতা, ঐশ্বর্যকামা, আর্যাতুল্য দেখিতে কিন্তু বাস্তবে অনার্যা, নৃশংসা ও পাপীয়সী ও সমস্ত বিপদের মূল।

ভরত অযোধ্যায় প্রত্যবর্তন করিয়া মাতার যে নির্লজ্জা রূপ দেখিয়াছেন ও তাহার ফলে যেভাবে সকলের সন্দেহভাজন ও অপ্রিয় হইয়াছেন তাহাতে ভরদ্বাজের নিকট পরিচয় প্রসঙ্গে মাতা সম্বন্ধে এই সকল বিশেষণ প্রয়োগের যৌক্তিকতা রহিয়াছে। কিন্তু দূতগণের নিকট জননী সম্বন্ধে ঐ ধরণের বিশেষণ প্রয়োগ ধার্মিকপুত্র ভরতের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। মনে হয় অন্যান্য জননী অপেক্ষা কৈকেয়ী দশরথের বেশী আনুকূল্য লাভ করিতেন তাহা ভরতের মনঃপূত ছিল না।

রামায়ণের বহু পাত্রকর্তৃক কৈকেয়ী যে নানা বিদ্বেষপ্রসূত বিশেষণ-দ্বারা আখ্যাতা হইয়াছেন। স্থান কাল অনুযায়ী কোথাও কোথাও তাহার যৌক্তিকতাও রহিয়াছে। কিন্তু কৈকেয়ী কতদূর উদারহৃদয়সম্পন্না ছিলেন তাহা আমরা তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। এখন প্রশ্ন, কৈকেয়ী রামের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব দিন হইতে সপ্তাহ তিনেক পর্যন্ত যে অস্বাভাবিক ব্যবহার করিয়াছেন তাহার জন্য কি তিনি সর্বতোভাবে দায়ী? এই কয়েক সপ্তাহ ব্যতীত পূর্বের বা পরের কোন ঘটনায় কৈকেয়ীর মধ্যে আর কোনরূপ নীচতা দেখিতে পাওয়া যায় না। চিত্রকূটে অন্যান্য জননীদের ন্যায় কৈকেয়ীও রামকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া নিতে আগ্রহী ছিলেন। রামসীতা ও লক্ষ্মণের নিকট বিদায় লইয়া চিত্রকূট হইতে আসিবার সময় কৌশল্যা ও সুমিত্রার ন্যায় কৈকেয়ীর নয়নও বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়াছে। কণ্ঠরুদ্ধ হওয়ায় তিনি রামের সহিত কোন কথা বলিতে পারেন নাই। আবার চতুর্দশ বৎসর পরে রাম অযোধ্যায় ফিরিবার পর অন্যান্য জননীদের সহিত মাঙ্গলিককার্যে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে হঠাৎ দিন কয়েকের জন্য কৈকেয়ীর এই মতিচ্ছন্নতার কারণ কি? ইহার জন্য কৈকেয়ী দায়ী? না অদৃষ্ট কোন দুষ্টগ্রহ কৈকেয়ীর জীবনে কালিমা লেপন করিয়াছে?

কৈকেয়ীকর্তৃক রামের বননির্বাসনের পর লক্ষ্মণের নিকট রামের উক্তির আলোচনা করা যাইতে পারে। লক্ষ্মণকে রাম বলিয়াছেন—

কৃতান্ত এব সৌমিত্রে দ্রষ্টব্যো মৎপ্রবাসনে।
রাজ্যস্য চ বিতীর্ণস্য পুনরেব নিবর্তনে॥

কৈকয্যাঃ প্রতিপত্তির্হি কথং স্যান্মম বেদনে।
যদি ত্বয়া ন ভাবোঽয়ং কৃতান্তবিহিতো ভবেৎ ॥
জানাসি হি যথা সৌম্য ন মাতৃষু মমান্তরম্ ।
ভূতপূর্বং বিশেষো বা তস্যা ময়ি সুতেঽপি বা ॥
সোঽভিষেকনিবৃত্ত্যর্থৈ প্রবাসৈর্শ্চ দুর্বচৈঃ।
উগ্রবাক্যৈরহং তস্যা নান্যদ্দৈবাৎ সমর্থয়ে ॥
কথং প্রকৃতিসম্পন্না রাজপুত্রী তথাগুণা।
ব্রূয়াৎ সা প্রাকৃতেব স্ত্রী মৎপীড়াং ভর্তৃসন্নিধৌ ॥
যদচিন্ত্যং তু তদ্দৈবং ভূতেষ্বপি ন হন্যতে।
ব্যক্তং ময়ি চ তস্যাঞ্চ পতিতো হি বিপর্যয়ঃ ॥ ২।২২।১৫-২০

হে সৌমিত্রে! আমার বননির্বাসন ও প্রাপ্তরাজ্যের নিবৃত্তির কারণ একমাত্র দৈব। তাহা না হইলে কৈকেয়ী আমাকে ব্যথা দিতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন কেন? আমার মাতৃগণের মধ্যে আমার প্রতি বা তাঁহাদের পুত্রদের প্রতি ব্যবহারে কোন বৈলক্ষণ্য আমি দেখি নাই। কৈকেয়ীকর্তৃক উগ্রবাক্য দ্বারা আমার অভিষেকনিবৃত্তি ও প্রবাস দৈব ব্যতীত কখনও সম্ভব ছিল না। কারণ স্নেহাদিগুণশালিনী ও চারিত্র্যগুণসম্পন্না মাতা কি প্রকারে প্রাকৃতা স্ত্রীর ন্যায় স্বামীর নিকট ঐরূপ বাক্য বলিতে পারেন? যাহা কিছু অচিন্তনীয় তাহাই দৈব। যাহার প্রভাব কোন প্রাণীতেই প্রতিহত হয় না। কৈকেয়ী ও আমার বিপর্যয়ে সেই দৈবই কাজ করিতেছে।

আমরা লক্ষ্য করিতেছি রাম এই কনিষ্ঠা জননীর গুণ ও স্বভাব সম্বন্ধে অতিশয় শ্রদ্ধাপরায়ণ। স্বেচ্ছাকৃতভাবে জননী রামের সহিত এরূপ কঠোর ব্যবহার করিতে পারেন তাহা রাম বিশ্বাস করিতেছেন না। কারণ কৈকেয়ী নিজপুত্র ভরতের সহিত যেরূপ আচরণ করিতেন, সেরূপ রামের সহিতও করিতেন। কৈকেয়ীর ন্যায় প্রভূতগুণসম্পদের অধিকারিণী নারী সর্বজন সমক্ষে স্বামীর প্রতি এরূপ নির্লজ্জ ব্যবহারও স্বাভাবিক নহে। রামের মতে কৈকেয়ীর মানসিক বিপর্যয় ও রামচন্দ্রের ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য দৈব ব্যতীত কেহ দায়ী নহে। রামের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও বলিতে পারি পুত্রতুল্য রামচন্দ্রের প্রতি কৈকেয়ীর নির্লজ্জ ও নিন্দনীয় ব্যবহারের জন্য কৈকেয়ী সম্পূর্ণভাবে দায়ী নহেন। রামের ভাগ্যে নির্বাসন ছিল। কৈকেয়ী এখানে নিমিত্ত মাত্র। কৈকেয়ী যদি রামকে বনে

না প্রেরণ করিতেন তবে অন্য কাহাকেও রামের বনগমনের নিমিত্ত হইতেই হইত।

এ সম্বন্ধে আমরা ভরতের প্রতি ভরদ্বাজের উক্তির কথা বলিতে পারি—

> ন দোষেণাবগন্তব্যা কৈকয়ী ভরত ত্বয়া।
> রামপ্রব্রাজনং হ্যেতৎ সুখোদর্কং ভবিষ্যতি ॥
> দেবানাং দানবাণাঞ্চ ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
> হিতমেব ভবিষ্যতি রামপ্রব্রাজনাদিহ ॥ ২।৯২।৩০-৩১

হে ভরত, তুমি কৈকেয়ীর প্রতি কঠোর ব্যবহার করিও না। রামের প্রবাস পরিণামে সুখকর হইবে। দেবতা, দানব ও ঋষিগণের মঙ্গলের জন্যই রামের এই প্রবাস।

এখানে দেখি মহামুনি ভরদ্বাজের মতেও রামের প্রবাসের জন্য কৈকেয়ী দায়ী নহেন। রামের প্রবাস দেবতা, দানব, ঋষি সকলেরই মঙ্গলের জন্য। ত্রিজগতের মঙ্গলের জন্য কৈকেয়ী সকল অপবাদ মাথায় লইয়াছেন। কৈকেয়ীর এই যে-মতিচ্ছন্নতা তাহা অতি সাময়িক। পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি কৈকেয়ীর এরূপ মানসিক নীচতা স্বভাবজাত নহে।

আমরা চিত্রকূটে রাম ভরতের কথোপকথন শ্রবণরত মহর্ষিগণকে দেখিয়াছি যে, রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন তাহা তাঁহারা চাহেন না। রাবণবধেচ্ছু ঋষি, দেবর্ষি, মুনি, সিদ্ধ ও পরম ঋষিগণ ভরতকে রামের আদেশ শুনিতে আদেশ দিয়াছেন। রাম যাহাতে পিতার নিকট অঋণী হন তাহাই তাঁহারা ইচ্ছা করেন, কারণ কৈকেয়ীর নিকট অঋণী হইয়াও দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন। তাঁহারা একথা বলিলেও 'দশগ্রীববধৈষিণঃ' শব্দটি প্রয়োগের দ্বারা বোঝা যাইতেছে যে, এই সকল দেবতা ঋষিগণের একমাত্র চিন্তা রাবণবধ। সুতরাং রামের বনবাস না হইলে তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না। কারণ বালকাণ্ডে আমরা দেখিয়াছি মহাবলী রাবণের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দেবতাগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। তখন দেবতারা বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যেন দশরথের তিন মহিষীর গর্ভে চারি অংশে বিভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন ও দেবগণের অবধ্য রাবণকে বধ করেন। তাহাতে বিষ্ণু স্বীকৃত হন। সুতরাং কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা দেবগণের ইচ্ছাপূরণার্থেই।

আমরা জানি রামের বনগমনের ষষ্ঠরাত্রে দশরথের পূর্বকৃত দুষ্কর্মের

কথা স্মরণ হয়। তিনি কুমার অবস্থায় শব্দভেদী বাণদ্বারা অন্ধমুনির পুত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। অন্ধমুনি পুত্রশোকে মৃত্যুবরণের পূর্বে দশরথকে অভিশাপ দিয়া বলিয়াছিলেন—

ত্বয়াপি চ যদজ্ঞানান্নিহতো মে স বালকঃ।
তেন ত্বামপি শপ্সেঽহং সুদুঃখমতিদারুণম্ ॥
পুত্রব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাম্প্রতম্।
এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যতি ॥ ২।৬৪।৫৩-৫৪

তুমি আমার একমাত্র শিশুপুত্রকে অজ্ঞানতাবশতঃ বধ করিয়াছ। আমি অভিশাপ দিতেছি যে, আমার মত তোমাকেও পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

মুনিবাক্যের সত্যতা রক্ষার্থে রামের সহিত দশরথের বিচ্ছেদ কোন না কোনভাবে হইত। এখানে সেই বিচ্ছেদের নিমিত্ত হইতেছেন কৈকেয়ী।

সকল দিক্ দিয়া বিচার করিলে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, রাম, সীতা, ভরত অপেক্ষা কৈকেয়ীর আত্মত্যাগও কম নহে। আর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের তবু সান্ত্বনা ছিল যে, সকলেই তাঁহাদের গুণগ্রাহী। তাঁহাদের মহত্ত্ব, উদারতা, আত্মত্যাগ, নিস্পৃহতা, ঐশ্বর্যের প্রতি লোভ-হীনতা প্রভৃতি গুণ সর্বজনস্বীকৃত ও প্রশংসিত। কিন্তু যে-কৈকেয়ীর আত্মত্যাগহেতু দেবতা, দানব ও ঋষি প্রভৃতি সকলের হিতসাধন হইয়াছিল সেই কৈকেয়ীই সকলের ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্ররূপে পরিগণিতা। অযোধ্যাপুরীতে কৈকেয়ীর পার্শ্বে দাঁড়াইবার বা সহানুভূতি দেখাইবার জন্য কেহ ছিল না। সুদীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর সকলের ধিক্কৃত, নিন্দিত দৃষ্টি এড়াইয়া আত্মাভিমানিনী কৈকেয়ী কিভাবে অযোধ্যার অন্তঃপুরে কাটাইয়াছিলেন তাহা আমরা কল্পনা করিতেও পারি না।

রামচরিত্রের তথাকথিত দোষাবলী

পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র তাঁহার গুণাবলীর জন্য সর্বজনপ্রিয় ও সর্বজনবন্দিত। সর্বজনের আদর্শ রামচন্দ্র কিন্তু তাঁহার কিছু কিছু কার্যাবলীর জন্য বহুক্ষেত্রে সমালোচিত হইয়াছেন। তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছেন বালিবধের জন্য। তাহা ছাড়া বনবাসের প্রথম রাত্রিতে তাঁহার আক্ষেপ, লঙ্কাতে সীতার প্রতি কর্কশবাক্য প্রয়োগ ও সীতানির্বাসন

প্রভৃতি কার্যাবলীর জন্য সমালোচকদের বিরূপ মন্তব্য হইতে অব্যাহতি পান নাই।

রামচন্দ্রের বালিবধরূপ কর্ম কিভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। রামকর্তৃক সীতাকে একাকী পরিত্যাগ না করিবার আদেশ সত্ত্বেও সীতার সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা না করিতে পারিয়া লক্ষ্মণ মারীচানুসারী রামকে রক্ষা করিতে গেলেন। এই সুযোগে লঙ্কেশ্বর রাবণ সীতাকে পঞ্চবটী আশ্রম হইতে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। লক্ষ্মণের সহিত রাম আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিয়া সীতাকে না পাইয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া সর্বত্র সীতার অন্বেষণ করিতে থাকেন। বন হইতে বনান্তরে সীতার অন্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে শেষপর্যন্ত দনুপুত্র কবন্ধের সহিত রামলক্ষ্মণের সাক্ষাৎ হয়। কবন্ধের নিকট রাম সীতার হরণকারী কে ও তাহার অবস্থান কোথায় তাহা জানিতে চাহেন। রাম কবন্ধের নিকট হইতে জানিতে পারেন যে, সীতাহরণকারীর পরিচয় ও বাসস্থান জানেন একমাত্র সুগ্রীব। এই সুগ্রীবের সহায়তায় রাম সীতাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন। বর্তমানে ভ্রাতা বালিকর্তৃক বিতাড়িত ঋষ্যমূকপর্বতে বাসকারী সুগ্রীব পৃথিবীর সমুদায় রাক্ষসের বাসস্থান অবগত আছেন। সুতরাং রাম যেন সুগ্রীবের সহিত সখ্যস্থাপন করেন। কবন্ধপ্রদর্শিত পথে রাম পম্পাসরোবর অতিক্রম করিয়া ঋষ্যমূক পর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে রামলক্ষ্মণকে দেখিয়া বালিপ্রেরিত গুপ্তচর মনে করিয়া সুগ্রীব ভীত হইলেন। তখন সুগ্রীব হনুমান্‌কে রামলক্ষ্মণের অভিপ্রায় জানিতে প্রেরণ করিলে লক্ষ্মণ বনবাসের কাহিনী ও সীতাহরণের কাহিনী বর্ণনা করিয়া সুগ্রীবের শরণাগত হইতে চাহিলেন। কারণ সুগ্রীবই সীতাহরণকারী রাক্ষসের পরিচয় জানিতে সমর্থ। হনুমান্ সন্তুষ্টচিত্তে রামলক্ষ্মণকে লইয়া ঋষ্যমূক পর্বতে উপস্থিত হইয়া রামলক্ষ্মণ যে সুগ্রীবের সহিত সখ্যস্থাপন করিতে উৎসুক তাহা সুগ্রীবকে জানাইলেন। প্রজ্বলিত অগ্নির সম্মুখে রাম ও সুগ্রীবের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হইল। আনন্দিত সুগ্রীব বলিলেন—'ত্বং বয়স্যোঽসি হৃদ্যো মে হ্যেকং দুঃখং সুখঞ্চ নৌ' ৪।৫।১৭ (আজ হইতে তুমি আমার প্রিয়সখা। আমরা উভয়ে পরস্পরের সুখে ও দুঃখে সমানভাগী হইব)।

তখন সুগ্রীবও তাঁহার বনবিচরণের কাহিনী রামলক্ষ্মণকে জানাইলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালিকর্তৃক বিতাড়িত হইয়া সুগ্রীব এই দুর্গম বনে আশ্রয় নিয়াছেন। তাহা ছাড়া বালী তাঁহার ভার্যাকেও অপহরণ করিয়াছেন।

বালীর ভয়ে ভীত সুগ্রীবও রামচন্দ্রের নিকট অভয় প্রার্থনা করিলেন। তখন কাকুৎস্থ-বংশীয় রাম হাসিয়া বলিলেন—হে মহাকপি, উপকারের ফলে যে মিত্রলাভ হয় তাহা আমার জ্ঞাত, তোমার ভার্যাপহারী ভ্রাতা বালীকে আমি সূর্যসদৃশ তীক্ষ্ণ ও নিশ্চিত বাণদ্বারা হত্যা করিব।[১]

সুগ্রীব কিভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন তাহা আলোচ্য। মায়াবী নামক অসুরকে বধ করিতে গিয়া কিষ্কিন্ধাপতি বালী এক বৎসরের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন না। তখন সুগ্রীব বালীকে মৃত মনে করিয়া কিষ্কিন্ধার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সুগ্রীব রাজত্ব করিতে থাকিলে বালী মায়াবীকে বধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সুগ্রীবকে রাজত্ব করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন ও সুগ্রীবভার্যা রুমাকে অপহরণ করিলেন। বালীর ভয়েই সুগ্রীবের আজ এই দুর্দশা। মতঙ্গমুনির অভিশাপহেতু বালী এই ঋষ্যমূক পর্বতে আসিতে ভীত বলিয়া সুগ্রীব এই পর্বতে আশ্রয় লইয়াছেন। মহাবলশালী বালীকে রাম পরাজিত করিতে পারিবেন কিনা এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিলে রাম পদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা দুন্দুভির অস্থিমাত্রাবশিষ্ট দেহ শত যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন ও সাতটি তালবৃক্ষ একটিমাত্র বাণদ্বারা একবারেই ছেদন করিলেন। এবার সুগ্রীবের রামের বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিল। বালীকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিবার জন্য রাম সুগ্রীবকে আদেশ দিলেন। এদিকে কিষ্কিন্ধার নিকটবর্তী বনে লুক্কায়িত থাকিয়া দুই ভ্রাতার যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে দুই ভ্রাতার আকৃতি, অলঙ্কার, বেশ ও গমন দেখিয়া রাম নির্ণয় করিতে পারিলেন না কোন্ জন সুগ্রীব কোন্ জন বালী। এদিকে বালিকর্তৃক আহত সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্বতে প্রবেশ করিলেন। অভিশাপভয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ বালী কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাম বালীকে বিনাশ না করাতে সুগ্রীব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে রাম বলিলেন যে, রূপসাদৃশ্যে কে বালী তাহা নির্ণয় করিতে না পারায় রাম তীর নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন নাই। পরদিবস সুগ্রীবকে চিহ্নিত করিবার জন্য রাম গজপুষ্পী নাম্নী লতা সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে পরাইয়া দিলেন।

১। প্রত্যভাষত কাকুৎস্থঃ সুগ্রীবং প্রহসন্নিব।
উপকারফলং মিত্রং বিদিতং মে মহাকপে।
বালিনং তং বধিষ্যামি তব ভার্যাপহারিণম্
অমোঘাঃ সূর্যসঙ্কাশা মমেমে নিশিতাঃ শরাঃ॥ ৪।৫।২৫-২৬

পুনরায় কিষ্কিন্ধায় আগমন করিয়া সুগ্রীব আকাশ বিদারিত ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া বালীকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন। রাম প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আজ তিনি যে কোন প্রকারেই হউক, বালীকে বধ করিবেন। রাম আজ অবশ্যই বালীর বিনাশসাধন করিবেন এই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সুগ্রীবও প্রবল গর্জন করিতে করিতে বালীকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন। এদিকে বালিপত্নী তারা বালীকে যুদ্ধার্থে গমন করিতে নিষেধ করিয়া সুগ্রীবের সহিত সখ্যস্থাপন করিতে স্বামীকে অনুরোধ জানাইলেন কারণ সুগ্রীবের সহায় এখন মহাত্মা, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন, পিতৃ অনুগত ও গুণরাজির আধার রাম-লক্ষ্মণ। কিন্তু বালী তারার হিতকর বাক্য অবহেলা করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত গমন করিতে চাহিলেন। কারণ সুগ্রীবের ঔদ্ধত্য অসহনীয়, আর ধর্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ রাম অকারণ নিশ্চয়ই বালীকে বধ করিবেন না। বালী ও সুগ্রীবের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে হীনবল হইয়া সুগ্রীব দশদিক্ অবলোকন করিতে থাকিলে শ্রীরাম বালীর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া মহাবাণ নিক্ষেপ করিলেন, বালী ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় বাণাহত হইয়া মহীতলে পতিত হইলেন। বালী ভূলুণ্ঠিত হইলে রাম ও লক্ষ্মণ দুইভ্রাতা বালীর নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। অল্পপ্রাণ, নষ্টচেতন বালী রাম ও লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন—কুলীন, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, তেজস্বী, চরিত্রব্রত, করুণবেদী, প্রজাহিতৈষী, জিতেন্দ্রিয়, দৃঢ়ব্রত ও বিশেষতঃ শম, দম ও ধর্ম প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট রাম কি করিয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে হত্যা করিলেন? বালীর ধারণা ছিল অপরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকাকালে রামের মত ধার্মিক পুরুষ নিশ্চয়ই বালীকে হত্যা করিবেন না। সেজন্যই তারার বাক্য অবহেলা করিয়া বালী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাম ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় গুপ্তভাবে অনিষ্টকারী। বিনা অপরাধে বালীকে হত্যা করায় রাম সাধুদিগকে কি বলিবেন? তাহা ছাড়া বালীর মাংসও অভক্ষ্য। আর সীতা উদ্ধারের জন্য যদি সুগ্রীবের বন্ধুত্ব কামনা করিয়া রাম বালীকে হত্যা করিয়া থাকেন তবে বালী একদিনেই সীতাকে উদ্ধার করিতে পারিতেন। তখন রাম বালীর অভিযোগ খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে বালীকে বলিলেন, তাঁহাকে বধ করিবার কারণ হইতেছে যে, বালী সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্যাতে অভিগমন করিয়াছেন। বালী নিতান্ত কামবৃত্ত, সনাতন ধর্মভ্রষ্ট ও পাপাচারী বলিয়াই রাম ধর্মরক্ষার্থে বালীকে এরূপ দণ্ডপ্রদান করিয়াছেন। আর তাহা ছাড়া রাম আজ পিতৃসত্যপালনের নিমিত্ত রাজ্যহীন, সুগ্রীবও ভ্রাতার সহিত বিরোধহেতু

রাজ্যহারা। রাবণ রামপত্নী সীতাকে হরণ করিয়াছেন, এদিকে সুগ্রীবের স্ত্রী রুমাকে বালী গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং রাম ও সুগ্রীব যেরূপ পরস্পরের দুঃখ বুঝিতে সমর্থ সেরূপ অপর কেহ নহেন। সেজন্যই সমদুঃখী এই দুই মিত্র কুণ্ঠাহীনভাবেই পরস্পরের দুঃখনিবারণে আগ্রহী হইবেন। রাম এই বিপদে সুগ্রীবকে নিজভ্রাতা লক্ষ্মণতুল্যই দেখিতেছেন। লক্ষ্মণের বিপদ্ যেরূপ রামের আত্মজনের বিপদ্ সেরূপ সুগ্রীবের বিপদ্‌কে রাম নিজের বিপদ্ই মনে করিতেছেন। রামও বানরদের সমক্ষেই সুগ্রীবের ইষ্টসাধন অঙ্গীকার করিয়াছেন। এখন তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন কি করিয়া ? এই সকল কারণে বালীকে বধ করা রাম অন্যায় মনে করেন না। অবশ্য বালী শেষ পর্যন্ত রামের বাক্য স্বীকার করিয়া লইলেন ও সুগ্রীব ও অঙ্গদের ভার রামকে অর্পণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

রামচন্দ্রের নিন্দনীয় কার্যাবলীর মধ্যে বালিবধ অন্যতম। সমালোচক-দের মতে বালী রামচন্দ্রের সঙ্গে কোনরূপ শত্রুতা করেন নাই। রামের মত ধার্মিক পুরুষ দ্রোহাচরণ না করা সত্ত্বেও কোন্ যুক্তিতে বালীকে বধ করিলেন ? আর ক্ষত্রিয়তেজের প্রকাশ ত সম্মুখযুদ্ধে। লুক্কায়িত থাকিয়া কাহাকেও অতর্কিতে হত্যা করা কাপুরুষের কাজ, ক্ষত্রিয়ের নহে। রঘুকুলশিরোমণি রামচন্দ্রের ন্যায় একজন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় ও বীরের পক্ষে এরূপ অক্ষত্রিয়োচিত কার্যসম্পাদন কিভাবে সম্ভব হইল ? প্রথম অভিযোগের উত্তরে বলা যাইতে পারে, দনুপুত্র কবন্ধের নিকট হইতে রাম জ্ঞাত হইয়াছিলেন যে, সুগ্রীবের সহায়তায় রাম তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকে অন্বেষণ করিতে সমর্থ হইবেন। সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই তিনি ঋষ্যমূক্ পর্বতে আগমন করিয়াছিলেন। সুগ্রীবের সহিত পরিচয়ের পরে রাম আরও জানিতে পারিলেন, সুগ্রীব রামচন্দ্রের ন্যায়ই ভাগ্যহত। কারণ সুগ্রীব রাজ্য হইতে নির্বাসিত ও তাঁহার পত্নীকে বালী হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। বনে নির্বাসিত ও স্ত্রীবিরহে কাতর রামচন্দ্রের মানসিক যন্ত্রণা সমদুঃখী সুগ্রীবের ন্যায় কে বুঝিতে সমর্থ ? অগ্নিসাক্ষী করিয়া রাম সুগ্রীবের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়াছেন, পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। রামচন্দ্রের মত মর্যাদাসম্পন্নপুরুষ বিনা উপকারে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া বালিবধ সম্পন্ন না হইলে বালীর ভয়ে ভীত সুগ্রীবও ঋষ্যমূক পর্বত হইতে অন্যত্র গমন করিতে পারিবেন না। সেক্ষেত্রে সুগ্রীবের পক্ষে সীতা অন্বেষণ অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিবার জন্য রাম সুগ্রীবকে অনুরোধ

করিলেন। সুগ্রীব যখন জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে হীনবল হইয়াছেন তখনই রাম সুগ্রীবকে রক্ষা করিবার জন্য বালীকে বাণ-দ্বারা আহত করিয়াছেন।

ধার্মিক ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াও রামচন্দ্র বিনা শত্রুতায় বালীকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না কেন? বালীর এই অভিযোগের উত্তরে রাম বলিয়াছেন যে, বালীকর্তৃক কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্যাতে অভিগমন করিবার অপরাধেই রামচন্দ্র তাঁহাকে হত্যা করিয়াছেন। কারণ ধর্মরক্ষা করাই ধার্মিক রামচন্দ্রের অবশ্যকর্তব্য। অধর্ম-বিনাশের জন্য রামচন্দ্রের মর্ত্যে আগমন। ধর্মরক্ষার্থে রামকে বালিবধ করিতেই হইবে। রাম সুগ্রীবের নিকট অগ্নিসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি সুগ্রীবের সহায়তা করিবেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রতিজ্ঞাভঙ্গও বড় অপরাধ। আর বালীকে যদি রাম হত্যা না করেন তবে সীতা-উদ্ধারও সম্ভব হইবে না। কারণ বালী বাঁচিয়া থাকিলে সুগ্রীবের পক্ষে রামের সহায়তা করা অসম্ভব ছিল। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বালীও সীতা-উদ্ধারে রামচন্দ্রের সহায়ক হইতে পারিতেন। সে কথা বালী নিজেও বলিয়াছেন। কিন্তু বালীর সহায়তায়ও সীতা-উদ্ধার সম্ভব তাহা রামচন্দ্র কিভাবে জানিবেন? দনুপুত্র কবন্ধ ত সুগ্রীবের কথাই বলিয়াছেন। অনেকের অভিযোগ, সুগ্রীবও জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার স্ত্রী তারাতে অভিগমন করিয়াছিলেন সেক্ষেত্রে রামের ধর্মরক্ষার প্রশ্ন আসিল না কেন? এই অভিযোগের উত্তরে বলা যাইতে পারে, এই ব্যাপারটা সুগ্রীব রামচন্দ্রকে জানান নাই। আর রামের মিত্র, বিশেষতঃ কিষ্কিন্ধার রাজা সুগ্রীবের কার্যাবলীর বিরুদ্ধে রামচন্দ্রের নিকট কিছু বলিতে কাহারই বা সাহস আছে?

দ্বিতীয় অভিযোগ, রাম লুক্কায়িত থাকিয়া কাপুরুষের ন্যায় বালীকে হত্যা করিলেন কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, রাম বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিবেন কি ভাবে? বাস্তবিক পক্ষে বালীর সহিত রামের কোন শত্রুতাই থাকার কথা নয়। কেবলমাত্র মিত্র সুগ্রীবের শত্রু বলিয়া বালী রামের শত্রু হইয়াছেন। কারণ রাজনীতিতে মিত্রের শত্রুও নিজের শত্রু বলিয়া পরিগণিত।

সুগ্রীব যুদ্ধ করিতে করিতে যখন হীনবল হইয়াছেন তখনই রাম বালীকে হত্যা করিয়াছেন। রাম যদি বালীকে হত্যা না করিতেন তবে সুগ্রীবই বালীকর্তৃক নিহত হইতেন। তাহা হইলে রামের প্রতিজ্ঞারক্ষা হইত না, সীতা উদ্ধার ত নয়ই। রাম বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেও পরিস্থিতি

জটিল হইত। কারণ বালী রামচন্দ্রের পরিচয় জানিতেন। বালী সম্মুখ-যুদ্ধে আগত রামকে যুদ্ধে আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কোন সদুত্তর দেওয়া নিশ্চয়ই রামের পক্ষে সম্ভব হইত না। হয়তো বালী নিজেই সীতা-উদ্ধার করিয়া দিতে চাহিতেন। কারণ আহত হইবার পর বালী বলিয়াছেন—

সুগ্রীবপ্রিয়কামেন যদহং নিহতস্ত্বয়া।
মামেব যদি পূর্বং ত্বমেদর্থমচোদয়ঃ॥
মৈথিলীমহমেকাহ্না তব চানীতবান্ ভবেঃ।
রাক্ষসঞ্চ দুরাত্মানং তব ভার্যাপহারিণম্।
কণ্ঠে বদ্ধ্বা প্রদদ্যাং তেঽনিহতং রাবণং রণে॥ ৪।১৭।৪৯-৫০

তখন রামের অবস্থা হইত ত্রিশঙ্কুর মত। তখন বালীকে রাখিবেন না, সুগ্রীবকে রাখিবেন এই দ্বিধায়া তাঁহার চিত্তবৃত্তি দোলায়মান হইত। সকল দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে রামচন্দ্রের বালিবধ দোষাবহ নহে।

রাম সম্বন্ধে আর একটি অভিযোগ হইল বনবাসের প্রথম রাত্রিতে তিনি লক্ষ্মণের নিকট ভাগ্য সম্বন্ধে যে-খেদোক্তি করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার চরিত্রানুগ হয় নাই। লক্ষ্মণের নিকট রাম বিলাপ করিয়া কি বলিয়াছিলেন তাহা বিশ্লেষণযোগ্য।

ধ্রুবমদ্য মহারাজো দুঃখং স্বপিতি লক্ষ্মণ।
কৃতকামা তু কৈকয়ী তুষ্টা ভবিতুমর্হতি॥
সা হি দেবী মহারাজং কৈকয়ী রাজ্যকারণাৎ।
অপি ন চ্যাবয়েৎ প্রাণান্ দৃষ্টা ভরতমাগতম্॥
অনাথশ্চ হি বৃদ্ধশ্চ ময়া চৈব বিনাকৃতঃ।
কিং করিষ্যতি কামাত্মা কৈকয্যা বশমাগতঃ॥
কো হ্যবিদ্বানপি পুমান্ প্রমদায়াঃ কৃতে ত্যজেৎ।
ছন্দানুবর্তিনং পুত্রং তাতো মামিব লক্ষ্মণ॥
সুখী বত সুভার্যশ্চ ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ।
মুদিতান্ কোসলানেকো যো ভক্ষ্যত্যধিরাজবৎ॥
স হি রাজ্যস্য সর্বস্য সুখমেব ভবিষ্যতি।
তাতে হি বয়সাতীতে ময়ি চারণ্যমাশ্রিতে॥
অর্থ-ধর্মৌ পরিত্যজ্য যঃ কামাননুবর্ততে।
এবমাপদ্যতে ক্ষিপ্রং রাজা দশরথো যথা॥

মন্যে দশরথান্তায় মম প্রব্রাজনায় চ।
কৈকয়ী সৌম্যসংপ্রাপ্তা রাজ্যায় ভরতস্য চ ॥
অপীদানীং তু কৈকয়ী সৌভাগ্যমদমোহিতা।
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ সা প্রবাধেত মৎকৃতে ॥ ২।৫৩।৬-১৪

সর্বলোকের আদর্শ, প্রাজ্ঞ, ধীমান্, জিতেন্দ্রিয়, অসূয়াহীন, স্থিতপ্রজ্ঞ পিতৃভক্ত রামচন্দ্রের মুখ দিয়া যে সকল খেদোক্তি বহির্গত হইয়াছে তাহা রামের পক্ষে অতি বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। বননির্বাসনের পূর্বে ও পরে যে-রামচন্দ্রের সহিত আমাদের পরিচয় তাঁহার সহিত যেন বিলাপরত রামের কোন সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রথমত: ধরা যাউক দশরথের প্রতি রামের উক্তি—'কামাত্মা ও কৈকেয়ীর বশীভূত, বৃদ্ধ ও অনাথ, আমাবিহীন দশরথ আজ কি করিবেন? রাজার এরূপ মতিভ্রম ও বিপদ্ দেখিয়া মনে হইতেছে যে ধর্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই প্রবল। হে লক্ষ্মণ, কোনও অবিদ্বান্ ব্যক্তি প্রমদার জন্য আমাতুল্য ছন্দানুবর্তী পুত্রকে ত্যাগ করিতে পারে না। যে ধর্ম অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কামের বশীভূত হয় সে অচিরে রাজা দশরথের অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

দশরথকর্তৃক নির্বাসনদণ্ড প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে রামের মনোভাব আলোচনা করা যাইতেছে। কৈকেয়ী রামকে রাজার আদেশ পালনের নিমিত্ত অঙ্গীকার করিতে অনুরোধ করিলে রাম বলিয়াছেন—রাজা আমার গুরু, পিতা, হিতৈষী। তাঁহাকর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমি কোন্ প্রিয়কার্য না করিতে পারি? রাম বনগমন করিলে কৌশল্যা প্রাণত্যাগ করিবেন বলিলে রাম কণ্ডুঋষি ও জমদগ্নিতনয়ের পিতৃভক্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনিও এই সকল মহাপুরুষের ন্যায় পিতার আদেশ পালন করিয়া তাঁহার প্রীতিসাধন করিবেন। লক্ষ্মণ যখন কৌশল্যাকে সমর্থন করিয়া রামকে বনগমন করিতে নিষেধ করিতেছিলেন তখন রাম বলিয়াছেন—

গুরুশ্চ রাজা চ পিতা চ বৃদ্ধ: ক্রোধাৎ প্রহর্ষাদথবাপি কামাৎ।
যদ্ ব্যাদিশেৎ কার্যমবেক্ষ্য ধর্মং কস্তং ন কুর্য্যাদনৃশংসবৃত্তি: ॥
২।২১।৫৭

লক্ষ্মণ বরঞ্চ পিতাকে কামপরবশ বলিয়া বহু ভর্ৎসনাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন। কিন্তু একবারও পিতার বিরুদ্ধে রাম কোন মন্তব্য করেন নাই।

পিতার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল রামের পক্ষে পিতাকে বারংবার কামপরায়ণ প্রভৃতি বলিয়া অভিযোগ করা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। আর রামের মধ্যে কখনও আমরা আত্মশ্লাঘাবোধ দেখি নাই। সেই রামই বা কিভাবে বলিলেন, তাঁহার মত ছন্দানুবর্তী পুত্রকে দশরথ স্ত্রীর জন্য ত্যাগ করিলেন?

কৈকেয়ী সম্বন্ধে রামের উক্তির পর্যালোচনা করা যাউক্। রাম কৈকেয়ী সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'ভরতকে আগত দেখিয়া কৈকেয়ী রাজ্যের নিমিত্ত মহারাজের প্রাণবিনাশ করিতে পারেন। মনে হয় দশরথের বিনাশ, আমার বনবাস ও ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত কৈকেয়ী আমাদের গৃহে আসিয়াছেন। সৌভাগ্যমদমোহিতা কৈকেয়ী নিশ্চয়ই এখন সুমিত্রা ও কৌশল্যাকে কষ্ট দিবেন।

আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি কৈকেয়ীর প্রতি রাম সর্বদা শ্রদ্ধাশীল। রামের প্রতি কৈকেয়ীর অনার্যাতুল্য ব্যবহার রাম দৈবকৃত বলিয়াই মনে করিয়াছেন। রাজা দশরথের উক্তি হইতেও জানিতে পারি রাম স্বজননী অপেক্ষা কৈকেয়ীর প্রতি বেশী সম্মান প্রদর্শন করিতেন ও কৈকেয়ীর আদেশ অতি আনন্দের সহিত পালন করিতেন। বনবাসপর্বেও দেখিয়াছি লক্ষ্মণ কৈকেয়ীর নিন্দা করিলে রাম অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিয়াছেন। সেই রামের কৈকেয়ী সম্বন্ধে কটূক্তি স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ পূর্বে বনবাসের আদেশ পাইয়াও রাম কৈকেয়ী সম্বন্ধে কোন বিদ্বেষপ্রসূত বাক্য উচ্চারণ করেন নাই বা বনগমনের জন্য পুত্রতুল্য রামের সহিত নির্লজ্জার ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতেও রামের মধ্যে চিত্তবিক্রিয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। সেই রাম এত অল্প সময়ের মধ্যে কৈকেয়ী-বিদ্বেষী লক্ষ্মণের নিকট কৈকেয়ীর বিরুদ্ধে এরূপ তীব্র অভিযোগ করিবেন তাহা আমাদের নিকট বিস্ময়ের ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়।

আবার দেখি ভরতের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত রাম বলিয়াছেন—'ভার্যাসহিত কৈকেয়ীপুত্র ভরত সমগ্র কোশলরাজ্য অধীশ্বরের ন্যায় ভোগ করিয়া আনন্দিত হইবেন। পিতা বৃদ্ধ হওয়াতে ও আমি অরণ্যে আশ্রয় লওয়াতে ভরত রাজ্যের সকল সুখ লাভ করিবেন।

ভ্রাতৃপ্রাণ রাম ভ্রাতার সৌভাগ্য দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়াছেন ইহাও স্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। অরণ্যবাসের কিছুদিনের মধ্যেই রাম লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—'আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া

বলিতেছি যে, তোমাদের মত ভ্রাতাদের জন্যই আমি ধর্ম, অর্থ, কাম ও পৃথিবী কামনা করি, ভ্রাতৃগণের পালন ও সুখের জন্যই আমি রাজ্য কামনা করি। ভরত, শত্রুঘ্ন, ও তোমাকে ছাড়িয়া যদি আমার সুখ হয় সেই সুখ ভস্মে পরিণত হউক। আমাদের নির্বাসিত জানিয়াই স্নেহাক্রান্ত ও শোকাকুল ভরত আমাদের দেখিতে আসিয়াছেন, অন্য কারণে নহে। রাম লক্ষ্মণকে আবার সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছেন —তুমি ভরতকে অপ্রিয় বাক্য বলিও না। ভরতকে অপ্রিয় বলিলে আমাকেই বলা হইল।

ভরতের প্রতি যাঁহার এরূপ শ্রদ্ধা ও প্রীতি তিনি কিভাবে ভরতের সৌভাগ্যের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না।

দশরথ, কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতি রামের মনোভাব বিশ্লেষণ করিলে যাহা পাই তাহাতে মনে হয় বনবাসের প্রথম রাত্রিতে ইঁহাদের প্রতি রামের যে-বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তাৎক্ষণিকমাত্র, সহজাত ও স্বাভাবিক নহে। নির্জন, ভয়ঙ্কর বনে, অপরিচিত পরিবেশে, আজন্ম রাজপ্রাসাদে সুখে লালিত রাজপুত্রের মনে সাময়িকভাবে মানসিক বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। এরূপ মানসিক বিপর্যয় মানুষের জীবনে অতি স্বাভাবিক। রামচন্দ্রের সকল দুঃখের মূল দশরথ, কৈকেয়ী ও ভরত। যাঁহাদের নিমিত্ত রামের এরূপ কষ্টভোগ তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশিত হওয়া মানব-মনের স্বাভাবিক প্রবণতা। এই মানসিক প্রবণতা হইতে রামের মত মহাপুরুষও মুক্তি পান নাই। অবশ্য রামের মধ্যে এই প্রবণতা স্থায়ী হইয়াছিল মাত্র একরাত্রির জন্য। পরদিবস হইতে তাঁহার ব্যবহারের মধ্যে বিদ্বেষের লেশমাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সাধারণ মানুষ কিন্তু এরূপ বিদ্বেষ আজীবন পোষণ করিত। চরিত্রগত এই ত্রুটিটুকু আছে বলিয়াই রাম অতিমানবে পরিণত হইয়া মানুষের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যান নাই।

রামচরিত্রের আরও একটি সমালোচনাযোগ্য বিষয় হইতেছে রাবণবধের পরে সীতার সহিত কর্কশ ব্যবহার। রাম-রাবণের ভীষণ সংগ্রাম সমাপ্ত। সীতাকে রামের নিকট আনিবার জন্য বিভীষণ আদিষ্ট হইলেন। শিবিকায় আরোহণ করিয়া সীতা রামের নিকট আগমন করিতে থাকিলে সীতা-দর্শনে উৎসুক বিশাল জনসংঘকে বেত্রহস্ত উষ্ণীষধারী পুরুষগণ অপসারিত করিতে থাকিল। রাম ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উহাদের পীড়ন না করিবার জন্য আদেশ দিলেন ও সীতাকে পদব্রজে রামের নিকট আসিতে বলিলেন।

সীতার প্রতি এরূপ অনাদরে বিভীষণ অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনুমান্ সীতার প্রতি রামকে অপ্রসন্ন দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। জানকী বিনীতভাবে রাঘবের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এমন সময় রাম বলিতে লাগিলেন—ভদ্রে, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে পরাজিত করিয়া আমি পৌরুষবলে যাহা করিতে হয় তাহা করিলাম। আজ আমার পৌরুষ প্রদর্শিত হইল। সুতরাং আমার শ্রম সফল। আজ আমি প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইলাম।[১]

পশ্যতস্তাস্তু রামস্য সমীপে হৃদয়প্রিয়াম্।
জনবাদভয়াদ্ রাজ্ঞো বভূব হৃদয়ং দ্বিধা॥ ৬।১১৫।১১

সমীপে আগত হৃদয়প্রিয়া জানকীকে দেখিতে দেখিতে রামের হৃদয় দ্বিধাবিভক্ত হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন—তোমার ধর্ষণ প্রতিমার্জনের নিমিত্ত ও আমার মানরক্ষার জন্য যাহা কর্তব্য, সেই রাবণের বিনাশ আমি করিয়াছি। তুমি জানিবে সুহৃদ্‌গণের বীর্যবলে আমি যে প্রচণ্ড রণ-পরিশ্রম করিয়াছি তাহা তোমার জন্য নহে। তোমার হরণজনিত অপবাদ ও নিজবংশের কলঙ্ক দূরীকরণের নিমিত্তই আমি ইহা করিয়াছি। তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। দশদিক্ পড়িয়া রহিয়াছে, তুমি যেদিকে ইচ্ছা গমন কর। কোন্ সদ্বংশজাত পুরুষ পরগৃহ-বাসকারিণী স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে পারে? রাবণের কুদৃষ্টিদ্বারা দৃষ্টা তোমাকে গ্রহণ করিয়া আমি স্বীয় কুল কলঙ্কিত করিতে পারি না। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও বিভীষণ যাঁহার নিকট থাকিতে ইচ্ছা কর তাঁহার নিকট থাকিতে পার। তোমার দিব্য মনোহর রূপ দেখিয়া রাবণ তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।[২]

সীতা সম্বন্ধে রাম যে সকল উক্তি করিয়াছেন তাহা যথার্থ কি না তাহা আলোচ্য। সীতাহরণের পর আমরা রামচন্দ্রকে বলিতে শুনিয়াছি—

১। এষাসি নির্জিতা ভদ্রে শত্রুং জিত্বা রণাজিরে।
পৌরুষাদ্ যদনুষ্ঠেয়ং ময়ৈতদুপপাদিতম্॥ ৬।১১৫।২
অদ্য মে পৌরুষং দৃষ্টমদ্য মে সফলঃ শ্রমঃ।
অদ্য তীর্ণপ্রতিজ্ঞোঽহং প্রভবাম্যদ্য চাত্মনঃ॥ ৬।১১৫।৪

২। নহি ত্বাং রাবণো দৃষ্ট্বা দিব্যরূপাং মনোরমাম্।
মর্ষয়েত চিরং সীতে স্বগৃহে পর্যবস্থিতাম্॥ ৬।১১৫।২৪

হৃতাং মৃতাং বা সৌমিত্রে ন দাস্যন্তি মমেশ্বরাঃ।
তথারূপাং হি বৈদেহীং ন দাস্যন্তি যদি প্রিয়াম্ ॥
নাশয়ামি জগৎ সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
যাবদ্দর্শনমস্যা বৈ তাপয়ামি চ সায়কৈঃ ॥ ৩।৬৪।৭০-৭১

প্রিয়াবিরহে ত্রৈলোক্যবিনাশে উদ্যত রুদ্রের ন্যায় সংহারমূর্তিধারী রামকে লক্ষ্মণ অনেক কষ্টে সংযত করিয়াছেন।

আবার দেখি সমুদ্রের তীরে পৌঁছিয়া রাম সীতার জন্য শোক ও বিলাপ করিয়াছেন। পার্শ্বস্থিত লক্ষ্মণকে দেখিয়া রাম বলিয়াছেন—

শোকশ্চ কিল কালেন গচ্ছতা হ্যপগচ্ছতি।
মম চাপশ্যতঃ কান্তামহন্যহনি বর্ধতে ॥ ৬।৫।৪
বাহি বাত যতঃ কান্তা তাং স্পৃষ্ট্বা মামপি স্পৃশ।
ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চন্দ্রে দৃষ্টিসমাগমঃ ॥ ৬।৫।৬

আবার যুদ্ধক্ষেত্রে দেখি মায়াসীতার হত্যা শ্রবণে রাম শোকে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছেন।

সীতার বিরহে অতি আতুর সেই একই রাম পার্শ্ববর্তিনী প্রিয়াকে দেখিয়া বলিতেছেন, তিনি সীতার জন্য এই যুদ্ধ করেন নাই। কেবল পৌরুষপ্রদর্শনের জন্য এই সকল কাণ্ড করিয়াছেন। সীতা এখন যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন। নিরপরাধা সীতার প্রতি রামের এই ব্যবহার অত্যন্ত বিসদৃশ।

সীতার প্রতি রামের ব্যবহারের সমর্থনে বলা যাইতে পারে যে, রাম রঘুবংশতিলক, ধার্মিক ও প্রজাবৃন্দের আদর্শস্বরূপ। রাম রাজপুত্র বা রাজা হিসাবে যাহা করিবেন তাহাই সর্বজন অনুসরণ করিবে। রাবণগৃহে সীতা অনেকদিন বন্দিনী ছিলেন। হরণকালে রাবণের সহিত তাহার গাত্রসংস্পর্শ ঘটিয়াছিল।

সীতা অযোনিসম্ভবা। তাঁহার জন্ম দিব্য। সীতাকে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। আর সীতা কায়মনোবাক্যে রামেরই অধীন। রাবণের সহিত তাঁহার যে গাত্রসংস্পর্শ ঘটিয়াছিল তাহা সীতার আয়ত্তাধীন ছিল না। এই সকল ব্যাপার রাম ভালভাবেই জানিতেন। তথাপি তিনি রাবণগৃহবাসিনী সীতাকে সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কারণ তাহা হইলে প্রজাবৃন্দও রামকে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবে। তাহাতে ধর্মরক্ষা করা কঠিন হইবে। কারণ তখন প্রজারা বলিবে যে,

তাহারা রাজাকে অনুসরণ করিয়াছে মাত্র। সর্বলোকের সমক্ষে সীতার পবিত্রতা পরীক্ষা করিয়া লওয়াই রামের সঙ্গত মনে হইয়াছে। সে কারণে সীতাকে তিনি পদব্রজে আসিতে বলিয়াছেন ও জনসংঘকে নিবারিত করিতে বারণ করিয়াছেন। কারণ জনসংঘের সমক্ষেই সীতার পরীক্ষা হওয়া যুক্তিযুক্ত।

সীতা-উদ্ধারের ব্যাপারে রামের পৌরুষ ও কুলকলঙ্কের প্রশ্ন নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু রাম লঙ্কাবিজয়ের আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন কেবলমাত্র ঐ সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহা একেবারেই সত্য নহে। সীতাকে পুনরায় লাভ করাই রামের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। জনতার সমক্ষে নিজের ভাবমূর্তিকে উচ্চে রাখিবার জন্য তিনি তাহা স্বীকার করেন নাই। সীতার সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার না করিলে সীতা অগ্নি প্রবেশের কথা চিন্তা করিতেন না। সেই অবস্থায় প্রজারঞ্জক ও ধর্মানুসারী রামের পক্ষে সীতাকে গ্রহণ করা কঠিন হইত। সীতার অগ্নিপ্রবেশের দ্বারা অগ্নিদেব-কর্তৃক সীতার পবিত্রতা সর্বজনসমক্ষে প্রতিপালিত হইতে পারিল। রামও তাহাই চাহিয়াছেন। সেজন্য তিনি অগ্নিদেবকে বলিয়াছেন—ত্রিভুবনের মধ্যে সীতা অবশ্যই পবিত্রা, কিন্তু রাবণগৃহে ইনি দীর্ঘকাল বাস করিয়াছেন। জানকীর বিশুদ্ধির পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করিলে লোকে বলিত দশরথাত্মজ রাম কামাত্মা ও নিতান্ত অনভিজ্ঞ। জনকতনয়া মৈথিলী যে অনন্যহৃদয়া ও আমার একান্ত অনুরাগিণী তাহা আমি জানি। মহাসাগর যেমন বেলাকে অতিক্রম করিতে পারে না সেরূপ স্বীয় তেজে রক্ষিতা জানকীকেও রাবণ অতিক্রম করিতে পারেন না। কেবলমাত্র সত্যাশ্রয়ী আমি ত্রিলোকবাসীর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই সীতাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করি নাই। দীপ্তা অগ্নিশিখার ন্যায় সীতাকে রাবণ মন-দ্বারাও ধর্ষণ করিতে পারেন না। কারণ সূর্যের প্রভা যেমন সূর্য হইতে অভিন্ন সীতাও সেরূপ। যেরূপ আত্মবান্ ব্যক্তি কীর্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেরূপ আমিও সীতাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।

আমরা লক্ষ্য করি রাম নিজেই বলিতেছেন, লোকে যাহাতে রামকে কামাত্মা বা মূর্খ না ভাবিতে পারে সেজন্যই তিনি সীতার অগ্নিপরীক্ষায় সম্মতি দিয়াছেন। সীতা অগ্নিদ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন না এবিষয়ে রামের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। কারণ দিব্যজন্মের অধিকারিণী সীতার জীবনে অলৌকিক নিশ্চয়ই কিছু ঘটিবে এই প্রত্যয় নিয়াই তিনি সীতাকে অগ্নি-প্রবেশে বাধা দেন নাই।

রামচন্দ্রের তথাকথিত নিন্দিত কার্যাবলীর মধ্যে সীতানির্বাসন সর্বাপেক্ষা বেশী বিতর্কিত ও সমালোচিত। সীতানির্বাসনের ব্যাপারে রামের কার্যকে কোনও প্রকারে সমর্থন করা যায় কিনা দেখা যাইতে পারে।

গর্ভবতী সীতা তপোবন দর্শনের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন। রামও সীতার অভিলাষ পূরণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এদিকে রাম বন্ধুগণের সহিত বিবিধ হাস্যপরিহাসে নিরত। রাম কথাপ্রসঙ্গে পুরবাসিগণের রাম-বিষয়ক আলোচনা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রামবয়স্য ভদ্র জানাইলেন যে, রামকর্তৃক সীতাগ্রহণের ব্যাপারে পুরবাসিগণ নানা আলোচনা করিয়া থাকে—

লঙ্কামপি পুরা নীতামশোকবনিকাং গতাম্ ।
রক্ষসাং বশমাপন্নাং কথং রামো ন কুৎস্যতি ॥
অস্মাকমপি দারেষু সহনীয়ং ভবিষ্যতি।
যথা হি কুরুতে রাজা প্রজাস্তমনুবর্ততে ॥ ৭।৪৩।১৮-১৯

ইহা শুনিয়া প্রজানুরক্ত রাম মর্মাহত হইয়া বয়স্যগণকে বিদায় দিয়া নিজবুদ্ধিতে কর্তব্যনির্ণয় করিয়া ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিয়া আনাইলেন।

অগ্রজকে অশ্রুপূর্ণবদন দেখিয়া বিষণ্ণবদন ভ্রাতৃগণ উপবেশন করিলে রাম বলিলেন—পৌরগণ ও জনপদবাসিগণ সীতা সম্বন্ধে নিদারুণ অপবাদ প্রদান করিয়া আমার উপর ঘৃণা পোষণ করিতেছে। সেই অপবাদ আমার মর্মস্থল বিদ্ধ করিতেছে।

কারণ রাম মহাত্মা ইক্ষ্বাকুকুলে জাত ও সীতাও মহাত্মা জনকের পবিত্রকুলে উৎপন্না। লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া রাম বলিলেন, লক্ষ্মণের সম্মুখেই লঙ্কানগরীতে দেবগণকর্তৃক সীতার পবিত্রতা প্রমাণিত হইয়াছিল। আর রামের অন্তরাত্মাও যশস্বিনী সীতাকে শুদ্ধা বলিয়াই জানেন। এজন্য রাম রাবণগৃহবাসিনী সীতাকে অযোধ্যায় আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন পৌরজন ও জনপদজনের নিন্দাবাদে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত। আর এই ধরিত্রীতে অকীর্তি যদি একবার ঘোষিত হয় ও সেই অপকীর্তির চর্চা যতদিন চলিতে থাকিবে ততদিন পর্যন্ত পুরুষ অধর্মলোকে পতিত হয়। রাম লোকনিন্দার ভয়ে নিজের জীবন ও ভ্রাতৃগণকেই পরিত্যাগ করিতে পারেন। সেখানে জনকতনয়াকে পরিত্যাগ করা আর কি অধিক ?

অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান্ বা পুরুষর্ষভাঃ ॥ ৭।৪৫।১৪
অপবাদভয়াদ্ ভীতঃ কিং পুনর্জনকাত্মজাম্ ॥ ৭।৪৫।১৫

অকীর্তিজনিত শোকসাগরে নিমগ্ন রাম বাল্মীকি মুনির আশ্রমের নিকট সীতাকে পরিত্যাগ করিতে লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন। এই আদেশ অন্যথা করিলে লক্ষ্মণ রামের অহিতাচারী বলিয়া গণ্য হইবেন বলিয়া জানাইলেন। দুঃখিতচিত্ত লক্ষ্মণ অগ্রজের আদেশে সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন।

প্রথমেই প্রশ্ন জাগে যে, রামতুল্য এরূপ সর্বগুণান্বিত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ কিরূপে মিথ্যা লোকনিন্দাকে মূল্য দিতে পারেন? রামচন্দ্র স্বয়ং যখন স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি সর্বান্তঃকরণে সীতাকে নির্দোষা বলিয়া জানেন। আর লঙ্কাপুরীতে তিনি সর্বজনসমক্ষে সীতার বিশুদ্ধি পরীক্ষা করিয়াই তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। সতী সাধ্বী সীতা রামের প্রতি একান্তভাবে ভক্তিমতী। সীতাকে বিশুদ্ধা জানিয়াও লঙ্কাতে একবার পরীক্ষা করিয়া তাঁহার অবমাননাই করিয়াছেন। লোকাপবাদ শুনিয়া নির্বাসন দিয়া দ্বিতীয়বার সীতার ন্যায় অনন্যচিত্তা স্ত্রীকে তিনি অপমান করিলেন কোন্ যুক্তিতে? জনসাধারণ চিরকালই অজ্ঞ ও আবেগ-পরায়ণ। তাহাদের ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা খুবই কম তাহা আমরা পূর্বেও দেখিয়াছি। যে প্রজারা ভরতের অধীনে নিজেদের যূপকাষ্ঠে বদ্ধ পশুর সহিত তুলনা করিয়াছিল তাহারাই আবার ভরতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার কথা শুনিয়া তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিল। জনগণকে যেভাবে চালিত করা যায় সেভাবেই চালিত হয়। মহাপুরুষগণের নিকট নিন্দা ও প্রশংসার সমান মূল্য। সৎপথে থাকিয়া কর্তব্যপালনেই তাঁহাদের জীবনের সার্থকতা। কথিতই আছে—

> নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
> অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥

তুলসীদাস এই কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিয়াছেন—

> হাথী চলে বাজার মে কুত্তা ভোঁখে হাজার।
> সাধুয়োঁকা দুর্ভাব নহী জব নিন্দে সংসার॥

সুতরাং প্রজাগণের নিন্দাবাদে এরূপ বিচলিত হওয়া রামচন্দ্রের পক্ষে শোভা পায় না। রাম যে ন্যায়কার্য করিতেছেন না তাহা নিজেই জানেন। সেজন্য নির্বাসনের পূর্বে সীতার সহিত সাক্ষাৎ তিনি পরিহার করিয়াছেন। যে-দৃঢ়বিশ্বাস নিয়া লঙ্কাতে তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সেই আত্মবিশ্বাস বোধহয় তাঁহার ছিল না।

রামচন্দ্রকর্তৃক দোষহীনা সীতার নির্বাসন সমর্থনযোগ্য কিনা বিবেচ্য। পূর্বেই বলিয়া রাখা ভাল রামচন্দ্রের সহিত পৃথিবীর অপর কোন ভূপতির তুলনা হয় না। কারণ রামের তুলনা রাম। রামের কার্যাবলী অন্য কাহারও মানদণ্ডে বিচার করা চলে না।

ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, গুণজ্ঞ ও প্রজাগণের আনন্দবিধায়ক রাম রাজ্যাভিষেকের পূর্ব মুহূর্তে পিতৃসত্য পালনের জন্য বনগমন করিয়াছিলেন। এখন রাম অযোধ্যার অধিপতি। বর্তমান মুহূর্তে প্রজাগণের মঙ্গল ও তুষ্টিবিধানই তাঁহার নিকট মহত্তম কর্ম। প্রজাগণের আনন্দবিধানের জন্য তিনি ধন-জন-জীবন সকল কিছু ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। তাঁহার নিকট আত্মসুখ বা স্বার্থের কোন স্থান নাই। তিনি দেখিয়াছেন সীতানির্বাসনে সমষ্টির সুখ উৎপাদন হইবে। সেজন্য সীতা সদোষা কি নির্দোষা তাহা তাঁহার নিকট মূল্যহীন। আর সীতা যে নির্দোষা তাহা রামচন্দ্র জানিলেও প্রজাগণের নিকট তাহা প্রমাণিত করা রামচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। লঙ্কায় যাহা ঘটিয়াছিল তাহা অলৌকিক ব্যাপার। প্রজারা এই অলৌকিক ব্যাপারে সাক্ষী ছিল না। সুতরাং তাহাদের নিকট এই কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করা যাইত না। প্রজাদের নিকট সীতা সদোষা বলিয়াই পরিগণিতা। প্রজারঞ্জক রাম প্রজাদের চক্ষে সদোষা সীতাকে বিসর্জন দিয়া নিজে প্রচণ্ড দুঃখ বরণ করিয়াছেন। সীতাপরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচন ও শোকসংবিগ্নহৃদয় রাম কুঞ্জরের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অবস্থান করিয়াছেন। যদিও রাম উত্তমরূপেই জ্ঞাত ছিলেন যে, গর্ভবতী স্ত্রীকে তপোবনে পরিত্যাগ করা স্বামীর পক্ষে সঙ্গত কর্ম নয়। কিন্তু রাম নিজের দুঃখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তথা বংশধরের প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়াই রাজারূপে কর্তব্যপালন করিয়াছেন।

রামের পক্ষে সীতার অপবাদ একটি পারিবারিক কলঙ্ক। সীতাকে যদি রাম পরিত্যাগ না করিতেন তবে বংশে কলঙ্কলেপনের জন্য রাম ভাবী বংশধরের নিকট দোষী সাব্যস্ত হইতেন। এই অপবাদ রামের মত মর্যাদাসম্পন্ন পুরুষের নিকট অসহনীয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রামচরিত্রের তথাকথিত দোষাবলী তাঁহার চরিত্রকে গ্লানিযুক্ত করে নাই, বরঞ্চ এই সকল দোষ তাঁহার চরিত্রকে-মানবীয় সুষমা দান করিয়া মহিমান্বিত করিয়াছে।

সীতাচরিত্রের তথাকথিত দোষাবলী

রামায়ণের চরিত্রগুলির মধ্যে সীতাচরিত্র অনন্যসাধারণ দ্যুতিতে ভাস্বর।

এতাদৃশা তেজস্বিনী, বুদ্ধিমতী, পতিগতপ্রাণা, উদারচিত্তবৃত্তিসম্পন্না নারী রামায়ণে আর দ্বিতীয়টি নাই। ভারতীয় মহাকাব্যগুলির নারীদের মধ্যে সীতা ভারতবাসীকে যতটা প্রণোদিত করিয়াছেন, অন্য কোন নারী সেরূপ নহে। আবহমান কাল হইতে সীতার স্বার্থত্যাগ, পতিপরায়ণতা প্রভৃতি গুণ প্রতিটি ভারতবাসীর নিকট পরম বিস্ময়ের বস্তু। কিন্তু এই মহীয়সী নারীর চরিত্রও কিন্তু সর্বপ্রকার দোষমুক্ত নহে। তাঁহার চরিত্রেও দুই একটি সমালোচনাযোগ্য বিষয়ও রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া স্বর্ণমৃগের প্রতি তাঁহার অসীম আগ্রহ ও দেবর লক্ষ্মণের প্রতি রামের অনুপস্থিতিতে কঠোর বাক্য প্রয়োগ। এই দুইটি ঘটনাই তাঁহার জীবনের সুখশান্তি আনন্দকে রাহুর মত গ্রাস করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত জননী বসুন্ধরা তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় দিলে দুঃসহ অবমাননাপূর্ণ জীবন হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

বনবাসের ত্রয়োদশ বর্ষ পর্যন্ত সীতা স্বামী ও দেবরের সঙ্গে আনন্দেই কালাতিপাত করিয়াছেন। বনবাসের অন্তিম বৎসরে রাবণকর্তৃক প্রেরিত বিচিত্রদর্শন মৃগরূপধারী মারীচ সীতাকে প্রলোভিত করিবার জন্য আশ্রমের চতুষ্পার্শ্বে বিচরণ করিতে লাগিল। পুষ্পচয়নরতা সীতা সেই মুক্তামণি-চিত্রিত, বিচিত্র দর্শন, রজতবর্ণ, মনোহর দন্ত ও ওষ্ঠবিশিষ্ট মৃগকে দেখিতে পাইলেন। সীত সবিস্ময়ে উৎফুল্লনয়নে সেই হরিণকে দেখিতে লাগিলেন। আর সেই মায়ামৃগও সমস্ত কাননকে তাহার দেহপ্রভায় উদ্‌ভাসিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। প্রহৃষ্টা সীতা স্বামী ও দেবরকে আহ্বান করিয়া মৃগটিকে দেখাইলেন। দেখিবামাত্র ধীশালী লক্ষ্মণ সেই মৃগকে মারীচরাক্ষস বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তিনি রামকে বলিলেন—হে রাঘব। এরূপ রত্নচিহ্নিত মৃগ পৃথিবীতে আর নাই। ইহা নিশ্চয়ই মায়ার কার্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শুচিস্মিতা সীতা রামকে তাঁহার ক্রীড়ার জন্য সেই মৃগ আনয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। কারণ আশ্রমে সৃমর, স্মর ও পৃষত প্রভৃতি মৃগ বিচরণ করিয়া সীতার আনন্দবর্ধন করে। এই বিচিত্রদেহ মৃগ সমস্ত অরণ্যকে আলোকিত করিয়া রত্নের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। মুগ্ধা সীতা বলিলেন—

> অহো রূপমহো লক্ষ্মীঃ স্বরসম্পচ্চ শোভনা।
> মৃগোঽদ্ভুতো বিচিত্রাঙ্গো হৃদয়ং হরতীব মে॥ ৩।৪৩।১৫

এই মৃগ যদি জীবিত ধরা যায় তবে অযোধ্যার অন্তঃপুরের শোভাবর্ধক

হইবে। ইহার দিব্যরূপ আর্যপুত্র ভরত ও শ্বশ্রূদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিবে। আর জীবিত না ধরিতে পারিলেও ইহাদ্বারা সুন্দর অজিন হইবে। তবে সীতা এরূপ ইচ্ছা যে অনুচিত তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি রামকে বলিয়াছেন—

কামবৃত্তমিদং রৌদ্রং স্ত্রীণামসদৃশং মতম্।
বপুষা ত্বস্য সত্ত্বস্য বিস্ময়ো জনিতো মম ॥ ৩।৪৩।২১

স্ত্রীগণের এরূপ ভয়ানক স্বেচ্ছাচারিত্ব অনুচিত হইলেও ইহার দেহ-সৌন্দর্য আমার বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

রঘুনন্দন রামও কিন্তু সেই মৃগকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিলেন, মৃগটি পাইবার জন্য বৈদেহীর কি অদম্য স্পৃহা, এই মৃগটিকে অদ্য প্রাণ লইয়া ফিরিতে হইবে না। আর এই মৃগটি যদি মারীচের মায়াও হয়, তবুও ইহা আমার বধ্য। কারণ এই নৃশংস মারীচকর্তৃক শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ হিংসিত হইয়াছেন। মৃগয়াকালে বহু নৃপতি ইহার দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন। লক্ষ্মণ যেন অস্ত্রাদিদ্বারা সজ্জিত হইয়া সাবধানে সীতাকে রক্ষা করেন। রাম ইতিমধ্যে মৃগটিকে জীবিত ধরিবেন অথবা বধ করিয়া লইয়া আসিবেন।

রাম মৃগটিকে অনুসরণ করিতে থাকিলে মায়ামৃগ কখনও দৃষ্ট, কখন বা অদৃষ্ট হইয়া রামকে বহুদূরে লইয়া আসিলে অবশেষে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া মৃগটিকে দীপ্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। আহত মারীচ নিজরূপ ধারণ করিয়া 'হা সীতে। হা লক্ষ্মণ।' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। রাম মারীচের সেই অনিষ্টকারী শব্দ শুনিয়া বিষাদগ্রস্ত হইলেন।

এদিকে মারীচের সেই স্বরকে রামের আর্তস্বর মনে করিয়া সীতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থে গমন করিতে অনুরোধ করিলে লক্ষ্মণ রামের আদেশ স্মরণ করিয়া আশ্রম ত্যাগ করিতে অসম্মত হইলেন। ইহাতে ক্ষুভিতা জনকনন্দিনী দেবরকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—হে সৌমিত্রে। তুমি মিত্ররূপে ভ্রাতার শত্রু। কারণ এরূপ অবস্থায়ও ভ্রাতার নিকট যাইতেছ না। তুমি আমার জন্য রামের বিনাশ কামনা করিতেছ। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে পাইবার জন্যই রাঘবকে অনুসরণ করিতেছ না। তাঁহার প্রতি তোমার স্নেহ নাই। ভ্রাতার বিপদ্‌ই তোমার প্রিয়। সেজন্যই তুমি মহাদ্যুতিমান্ ভ্রাতার নিকট না যাইয়া

এখানে নিশ্চিতমনে অবস্থান করিতেছ। তিনি সংশয়াপন্ন হইলে আমার বাঁচিয়া কি হইবে ?[১]

তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, দেবদানব বা অসুর একত্র মিলিত হইয়াও রামকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহে। সীতাকে লক্ষ্মণ কখনও একাকী পরিত্যাগ করিতে পারেন না। রামের জন্য সীতার সন্তাপ করা উচিত নহে। কারণ ইহা সেই রাক্ষসের মায়ার কার্য। রাম লক্ষ্মণের নিকট সীতাকে গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সীতাকে একাকী রাখিয়া লক্ষ্মণ যাইতে পারেন না। এদিকে খরের সহিত শত্রুতা করায় রামলক্ষ্মণ রাক্ষসদের শত্রু হইয়াছেন। তাহারা বনমধ্যে নানারূপ শব্দ করিয়া থাকে। সেহেতু সীতার ভীত হইবার কিছু নাই। সকল শুনিয়া আরক্তনয়না সীতা লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন—লক্ষ্মণ! তুই অতি দুষ্ট। তুই ভরতকর্তৃক নিযুক্ত হইয়া অথবা স্বয়ং আমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত বনে রামকে অনুসরণ করিয়াছিস। তোর অথবা ভরতের কাহারও অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। আমি ইন্দিবরতুল্য শ্যামবর্ণ পদ্মনয়ন রামকে ত্যাগ করিয়া কিভাবে অন্যজনকে ভজনা করিব ? আমি তোর সমক্ষেই প্রাণ ত্যাগ করিব।[২]

তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, বৈদেহীর নারাচতুল্য বাক্য তাঁহার নিকট অসহ্য। তিনি ন্যায়বাক্য বলিয়াও বৈদেহীকর্তৃক তিরস্কৃত হইলেন তাহা যেন বনবাসীরা সাক্ষী থাকিয়া শ্রবণ করে। তিনি রামের আদেশ পালনে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। অথচ দুষ্টস্বভাব অনুসারে সীতা তাঁহাকে সন্দেহ করিতেছেন। বনদেবতাগণকে সীতারক্ষার ভার দিয়া লক্ষ্মণ রামের উদ্দেশ্যে যাইতে প্রবৃত্ত হইলে সীতা ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন—

১। যস্ত্বমস্যামবস্থায়াং ভ্রাতরং নাভিপদ্যসে।
ইচ্ছসি ত্বং বিনশ্যন্তং রামং লক্ষ্মণ মৎকৃতে॥
লোভাত্তু মৎকৃতে নূনং নানুগচ্ছসি রাঘবম্।
ব্যসনং তে প্রিয়ং মন্যে স্নেহো ভ্রাতরি নাস্তি তে॥ ৩।৪৫।৬-৭

২। সুদুষ্টস্ত্বং বনে রামমেকমেকোঽনুগচ্ছসি।
মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা॥
তন্ন সিধ্যতি সৌমিত্রে তবাপি ভরতস্য বা।
কথমিন্দীবরশ্যামং রামং পদ্মনিভেক্ষণম্॥
উপসংশ্রিত্য ভর্তারং কাময়েয়ং পৃথক্‌জনম্।
সমক্ষং তব সৌমিত্রে প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যসংশয়ম্॥ ৩।৪৫।২৪-২৬

গোদাবরীং প্রবেক্ষ্যামি হীনা রামেণ লক্ষ্মণ।
আবন্ধিষ্যেঽথবা ত্যক্ষ্যে বিষমে দেহমাত্মনঃ ॥
পিবামি বা বিষং তীক্ষ্ণং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্।
ন ত্বহং রাঘবাদন্যং কদাপি পুরুষং স্পৃশে ॥ ৩।৪৫।৩৬-৩৭

আমি রামবিহীনা হইয়া গোদাবরীতে প্রবেশ করিব। উদ্বন্ধনে অথবা পর্বত হইতে পতিত হইয়া দেহ বিসর্জন দিব। আমি তীব্র হলাহল পান করিব, অগ্নিতে প্রবেশ করিব। তথাপি রাম ব্যতীত অন্য পুরুষ ভজনা করিব না।

এই কথা বলিয়া শোকাকুলা ও দুঃখিতা সীতা উদরে আঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে আর্তভাবে রোদন করিতে দেখিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন। কিন্তু সীতা দেবরকে কিছুই বলিলেন না। অনন্তর লক্ষ্মণ মৈথিলীকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে রামের নিকট গমন করিলেন।

প্রথমেই আলোচ্য মায়ামৃগ দেখিয়া সীতার কৌতূহল ও তাহা লাভ করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহের কথা। রজতবিন্দু শোভিত স্বর্ণ-মৃগটি যে অপূর্ব সুন্দর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রামচন্দ্র নিজেও সেই মৃগকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। একমাত্র লক্ষ্মণ ব্যতিক্রম। লক্ষ্মণ কিন্তু রত্নখচিত বিচিত্রদেহ মৃগ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন ইহা রাক্ষস মারীচ ব্যতীত কেহ নহে। কারণ ইহার পূর্বে মারীচ মৃগদেহ ধারণ করিয়া বহু রাজাকে হত্যা করিয়াছে। মুনিগণও ইহার নিকট হইতে অব্যাহতি পান নাই। সমালোচকদের বক্তব্য সীতা কেন জানিয়া শুনিয়াও রামকে এই বিপদের মধ্যে প্রেরণ করিয়া নিজেকে বিপদাপন্না করিলেন। তিনি যদি মৃগটিকে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়া দিবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ না করিতেন তাহা হইলে রাম নিশ্চয়ই মারীচকে অনুসরণ করিতেন না। আর সীতাও রাবণকর্তৃক অপহৃতা হইতেন না।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মায়ামৃগ হউক বা সাধারণ মৃগ হউক মৃগটি দেখিতে অপূর্ব ছিল। পার্থিব জগতে রজতবিন্দুশোভিত রত্নখচিত বিচিত্রদেহ মৃগ নিশ্চয়ই আর দেখা যাইবে না। রাম সীতার জন্য সুমর, সৃমর, পৃষত নানাবিধ মৃগ আনিয়া আশ্রম পূর্ণ করিয়াছেন। সীতার পক্ষে অতি স্বাভাবিক যে আশ্রমের অতি সন্নিকটে সুদৃশ্য মৃগকে দেখিয়া তাহা আনিয়া দিতে রামকে বলিবেন। বনবাসের চতুর্দশ বৎসর

শেষ হইতে চলিয়াছে। সীতা এখন স্বামী ও দেবরের সহিত অযোধ্যার রাজপুরীতে ফিরিয়া যাইবেন। স্বভাবতই অভূতপূর্ব সংগ্রহটি আত্মীয়-পরিজনকে দেখাইতে তিনি সমুৎসুক ছিলেন। সাধারণতঃ মানুষ যখন প্রবাস হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তখন প্রিয়জনের জন্য প্রবাসের সর্বাপেক্ষা উত্তম বস্তুসকল লইয়া আসে। ইহাতে প্রিয়জনেরা অত্যন্ত আনন্দিত হন। সীতাও বলিয়াছেন, বিচিত্রদেহবিশিষ্ট মৃগ যদি অযোধ্যার অন্তঃপুরে বিচরণ করে তবে ভরত ও শ্বশ্রূমাতাদিগের খুব বিস্ময় জন্মাইবে। আত্মীয়পরিজনের জন্য বনবাস হইতে এরূপ উপহার লইতে চাওয়া নিশ্চয়ই দোষাবহ নহে। আর রাম যদি মৃগটি জীবিতও ধরিতে না পারেন তাহা হইলেও ক্ষতি নাই। কারণ মৃতমৃগের অজিনও কাজে লাগিবে। বিচিত্রবর্ণ অজিনে রামের সহিত সীতাও উপবেশন করিতে পারিবেন।

রাম যদি বীর্যে পরাক্রমে হীন হইতেন তাহা হইলে মায়ামৃগকে ধরিবার জন্য রামকে প্রেরণ করা সীতার পক্ষে অন্যায় হইত। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে সীতা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে, পরাক্রমশালী খরদূষণকে রাম চৌদ্দসহস্র অনুচরসহ একাকী বধ করিয়াছেন। আর মায়ামৃগটি যদি মারীচ রাক্ষসও হয়, তবু একাকী একটি মাত্র রাক্ষসকে বধ করা রামের পক্ষে কি এমন কঠিন কর্ম? অতি বাল্যকালেই রাম মারীচকে হত্যা করিবার সুযোগও পাইয়াছিলেন। কিন্তু অনুকম্পাবশতঃ তাঁহাকে জীবিত রাখিয়াছেন।

তাহা ছাড়া রাম নিজেও এই দ্যুতিমান্ দেহবিশিষ্ট মৃগটি দেখিয়া অতি মুগ্ধ। তিনিও মৃগটির দেহসৌন্দর্যের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। লক্ষ্মণ যখন রামকে ইহা মারীচের মায়া বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তখন রাম বলিয়াছেন, মারীচ রাক্ষস। সুতরাং রামের বধযোগ্য। সত্যই রাম ঋষিদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তিনি রাক্ষসবধ করিবেন। এই মারীচ বহু শ্রেষ্ঠমুনিকে হিংসা করিয়াছে, বহু পরাক্রমশালী রাজাকে বিনাশ করিয়াছে। সুতরাং ঋষিদের অহিতকারী মারীচবধ রামের কর্তব্যকর্মের মধ্যেই পড়ে। কিছুদিন পূর্বে রাম খরদূষণ প্রভৃতি রাক্ষসদের বধ করিয়াছেন। এখন মায়াবী মারীচকে দেখিয়া ভয় করা তাঁহার উচিত নহে।

বনবাসে রাম সর্বদা সীতাকে আনন্দিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সীতার প্রার্থিত সকল কিছুই প্রদান করিয়াছেন। সীতা যদি সামান্য মৃগ চাহিয়া বিফল মনোরথ হন তবে তাহা রামচন্দ্রের পক্ষে দুঃখজনক হইত।

অপূর্ব আর অভিনব বস্তুর প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। দিব্যরূপ-সম্পন্ন মৃগ দেখিয়া সীতা যদি তাহা লাভ করিতে চান তাহা সীতার পক্ষে কিছুমাত্র নিন্দিত কর্ম নহে। আর সীতার প্রার্থনা এমন কিছু অসম্ভব বস্তুর জন্যও নহে।

লক্ষ্মণের প্রতি সীতার বহুনিন্দিত ব্যবহারের ঘটনাটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। নির্জন ভয়ঙ্কর বন। নিকটবর্তী কোথাও জনবসতির চিহ্নমাত্র নাই। গোদাবরীর তীরে আশ্রম প্রস্তুত করিয়া পত্নী ও ভ্রাতাসহ রাম বাস করিতেছেন। অদূরে কোথায় কোন্ বৃক্ষের অন্তরালে সুপ্ত রহিয়াছেন দশরথের বন্ধু অতি বৃদ্ধ জটায়ুপক্ষী। নিকটবর্তী কোথায়ও রাক্ষসেরা থাকিতেও পারে। তাহারা তখন রামের প্রবল শত্রু। কারণ কিছুদিন পূর্বেই রাম রাক্ষসদের রাজা খরকে চৌদ্দসহস্র রাক্ষসসেনার সহিত বধ করিয়াছেন। সুতরাং সুযোগ পাওয়ামাত্র রাক্ষসেরা রামের দ্রোহাচরণের চেষ্টা করিবেই। এমন সময় আবির্ভাব হইল অতিবিচিত্র-দেহসম্পন্ন দ্যুতিমান্ মায়ামৃগের। সেই অপূর্ব মৃগকে দেখিয়া রাম সীতা উভয়েই মুগ্ধ। সীতা সেই রজতবিন্দুশোভিত স্বর্ণমৃগটিকে লাভ করিবার জন্য সমুৎসুক। রামও সীতার আগ্রহ দেখিয়া তাহা ধরিতে ইচ্ছুক। অনিচ্ছুক কেবলমাত্র লক্ষ্মণ। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন ইহা আসল মৃগ নহে। মারীচ রাক্ষসের মায়ামাত্র। এই পরিস্থিতিতে রাম লক্ষ্মণকে সীতা-রক্ষার ভার দিয়া মায়ামৃগকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। মায়ামৃগ রামকে আকৃষ্ট করিয়া বহুদূরে লইয়া গেল। রামের তীক্ষ্ণবাণে অবশেষে মৃগ হত হইল বটে, মরিবার পূর্বে সে রাবণের পরামর্শমত একটি সর্বনাশ করিয়া গেল। সে রামের স্বর অনুকরণ করিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। সীতা রামের সেই চীৎকার শুনিবামাত্র দেবরকে রামের সহায়তার জন্য প্রেরণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ গেলেন না। কারণ রাম তাঁহাকে সীতারক্ষার ভার দিয়া গিয়াছেন। ইহাতে সীতা ক্রুদ্ধা হইলেন ও সন্দেহ করিলেন যে লক্ষ্মণ যখন রামের এই চরম বিপদেও তাঁহাকে সাহায্য করিতে যাইতেছেন না, তবে নিশ্চয়ই লক্ষ্মণ সীতাকে লাভ করিবার জন্য বনে আসিয়াছেন। অথবা ইহা ভরতের পরামর্শও হইতে পারে। সীতার এই মর্মভেদী অভিযোগ লক্ষ্মণকে খুবই আঘাত দিয়াছে। তিনি সীতার দুর্বুদ্ধির নিন্দা করিতে করিতে রামকে অনুসরণ করিতে যাইতেছেন তাহাতে সীতার বিশ্বাস জন্মিল না। তিনি লক্ষ্মণকে পূর্বেই বলিয়া দিলেন যে, রামহীন সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন, অথবা

তীক্ষ্ণ বিষ পান করিবেন, অথবা অন্যভাবে প্রাণ বিসর্জন দিবেন, তথাপি অন্য পুরুষকে ভজনা করিবেন না। ক্রন্দনমুখী সীতাকে লক্ষ্মণ আশ্বাস দিতে ব্যর্থ হইয়া রামের নিকট যাত্রা করিলেন।

সীতা ও রামের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্মণের প্রতি সীতার এতাদৃশ কর্কশবাক্য প্রয়োগ অসঙ্গত বলিয়া সমালোচকদের বক্তব্য। অবশ্য লক্ষ্মণের দিক্ দিয়া চিন্তা করিলে লক্ষ্মণসদৃশ দেবোপম চরিত্রের দেবরের প্রতি সীতার এই জাতীয় বাক্য প্রয়োগ অনুচিতই হইয়াছে। তবে সীতার তদানীন্তন মানসিক অবস্থা যদি আমরা সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করি তাহা হইলে বোধহয় সীতাকে আমরা দোষারোপ করিতে পারি না।

সীতা রামের বলবীর্য পূর্বে বহুবার দেখিয়াছেন। কখনও রামকে অসহায় অবস্থায় সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে শোনেন নাই। এখন গভীর কাননে স্বামী সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতেছেন। অথচ ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ তাঁহার সাহায্যের জন্য যাইতেছেন না। ইহাতে সীতার নিকট লক্ষ্মণ তাঁহার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাইয়াছেন। সাধারণতঃ জগতে দেখা যায় যে, প্রিয়জন বিপন্ন হইয়া সাহায্য চাহিলে আত্মীয়গণ তৎক্ষণাৎ সাহায্যের জন্য দ্রুতগমন করে। এক্ষেত্রে সীতা দেখিতেছেন যে, ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভ্রাতার আর্তচীৎকার শুনিয়া স্বয়ং ত গেলেনই না, উপরন্তু সীতার অনুরোধক্রমেও যাইতে রাজী হইলেন না। লক্ষ্মণ অবশ্য জানকীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা মায়াবী রাক্ষসের মায়াচীৎকারমাত্র। কিন্তু সীতার নারীহৃদয় তাহা মানিবে কেন? পতিগতপ্রাণা সীতা স্বামীর বিপদে নিজেকে স্থির রাখিতে পারেন নাই। ধীরভাবে চিন্তা করিবার মত মানসিক অবস্থা তখন তাঁহার থাকার কথা নহে। সত্যই যদি রামের কোন অনিষ্টসাধন হইত তবে সীতার কি অবস্থা হইত? নিকটবর্তী কোন লোকালয় বা কোন সাহায্যকারী থাকিলে সীতার লক্ষ্মণের প্রতি সন্দেহের উদ্রেক হইত না। ঐ নির্জন বনে স্বামিহীনা সীতা একা কি করিতেন তাহা ভাবিলে আমরা শিহরিয়া উঠি। লক্ষ্মণ যদি দুষ্ট চরিত্রের হইতেন তাহা হইলে সীতার পক্ষে তাহা মারাত্মক হইতে পারিত। বিপদে পতিত হইলেই মানুষকে জানা যায়। এখন রামহীন সীতা মহাবিপদে পড়িয়াছেন। অথচ লক্ষ্মণের তাঁহার জন্য কোন উদ্বেগ নাই। ইহা দেখিয়াই লক্ষ্মণের প্রতি সীতার সন্দেহ জাগিয়াছিল। লক্ষ্মণ যদি নিজে রামের জন্য উদ্বেগপূর্ণ কথাও বলিতেন তাহা হইলে সীতা লক্ষ্মণকে বিশ্বাস করিতেন। আমরা লক্ষ্মণের নিকট হইতে সেই জাতীয়

কোন উক্তিই শুনি না। জ্যেষ্ঠভ্রাতার বলবিক্রম সম্বন্ধে কনিষ্ঠভ্রাতার অসীম শ্রদ্ধাবোধ ছিল। কিন্তু পতিপ্রাণা সীতা স্বামীর জন্য উদ্বিগ্ন হইবেন ও বনবাসের একমাত্র সঙ্গী দেবরকে ভ্রাতার বিপদে নির্বিকার দেখিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? লক্ষ্মণের প্রতি সীতার এই ব্যবহার সাধারণ নারীসুলভ হইয়াছে। তাহাতে সীতা-চরিত্রের গৌরব কিছুমাত্র কমিবে না। সীতার আত্মত্যাগ, পতিপরায়ণতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণাবলী শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখিতে আমরা অভ্যস্ত। এই একটি দুইটি ব্যাপারে সীতা যে সাধারণ নারীতুল্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে সীতাচরিত্র অতিমানবী না হইয়া সাধারণ নারীর পক্ষে অনুসরণ-যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।